মাসুদ রানা

অপারেশন ইজরাইল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

ISBN 984-16-7328-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-328
OPERATION ISRAEL
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সাঁইত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজ্জনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কমপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বস্ত্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট জেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

গিরিখাদটা অস্বাভাবিক চওড়া; তাসত্ত্বেও উনুন ও মশালে আগুন ধরাবার মুহূর্তটিতে সধবা রমণীদের সুরেলা উলুধ্বনি পাহাড়-প্রাচীরে বাড়ি খেয়ে অদ্ভুত এক অনুরণন তুলল, যাতে একাধারে মিশে আছে তীব্র রোমাঞ্চকর আবেদন, কি জানি কি এক গূঢ় রহস্যের হাতছানি, আর রোমান্টিকতায় ভরপুর গাঢ় মাদকতা। গিরিখাদের ভেতর স্ফটিকস্বচ্ছ ক্ষীণধারা এই নালার পাশে আজকের মত তাঁবু ফেলছে ওরা, নিরন্তর ভ্রমণে ক্লান্ত এক আরব বেদুইন গোষ্ঠি।

ওমানের মাস্কাট থেকে রওনা হয়ে কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে—পার হয়েছে সুবিশাল সৌদি মরু, ঘুরে এসেছে বাগদাদ ও ইস্পাহান, দিক বদলে জর্দান হয়ে ঢুকেছে ইজরাইল, লেবানন আর সিরিয়ায়। যেখান থেকে রওনা হয় সেটাই ওদের গন্তব্য, ফিরতে কখনও হয়তো বা বছর পার হয়ে যায়; অথচ এই ফেরা না কোনও গৃহকোণে, না কোনও নির্দিষ্ট এলাকায়। কোথা থেকে শুরু, কোথায়ই বা শেষ, ওদের নিজেদেরই তা জানা নেই। যেখানে ফেরা হয় সেখানে মন টেকে না, কারণ কোথাও ওদের কোন শিকড় নেই। সেজন্যেই ওরা যাযাবর, আরব বেদুইন। ঠিকানা নেই, তবে ঋতু বা মরশুম ধরে একটা হিসাব আছে কোন্ সময়-সীমার ভেতর কোথায় ওরা থাকবে। এই সময়সূচী মেনে চলার ওপর নির্ভর করে ওদের ব্যবসার সুনাম। সঙ্গে আছে মাদুলি-কবচ,পশু ও মানুষের মাথার খুলি, গণ্ডারের শিং, ঝাঁপির

ভেতর কুলোপানা চক্কর নিয়ে কেউটে আর গোক্ষুর, জাদুর কাঠি ও বাঁশী, হাঙরের দাঁত, শিয়ালের পাঁজর, মোষের শিং দিয়ে বানানো শিঙে, সর্বরোগহর গুঁড়ো ভেষজ, দুষ্প্রাপ্য গাছের শিকড় ও পাতা, চন্দন কাঠ, আতর ও নানা রকম সুগন্ধী সহ আরও কত কি। এ-সব পণ্য, উপকরণ, ঝাড়-ফুঁক ও তুকতাক করবার বিদ্যা বেচেই জীবিকা নির্বাহ করে ওরা। গোটা আরব বিশ্বের ছোট-বড় অসংখ্য শহর-বন্দর ছুঁয়ে যায় ওদের কাফেলা। পথ চলাই ওদের জীবন; পথেই ওদের সংসার, আয়-রোজগার, বিয়ে-শাদি, বংশবৃদ্ধি, সন্তান প্রতিপালন আর আনন্দ উৎসব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুই তিন বছরে একবার হলেও ওদের দেখা মেলে। উপকার পেয়েছে এমন খদ্দেররা পথ চেয়ে অপেক্ষায় থাকে কবে নাগাদ আবার আসবে ওরা। ফিরতি পথে সীমান্তরেখা পার হয়ে লেবানন থেকে ইজরাইলে ঢুকেছে, তারপর চারমাইল হেঁটে নেমে এসেছে গিরিখাদের ভেতর, আরও বারো ঘণ্টা পর সন্ধ্যালগ্নে তাঁবু ফেলছে ইজরাইলি সেনা চৌকি থেকে মাত্র সিকিমাইল দূরে। সীমান্ত রেখায় ওরা ইজরাইলি বা লেবাননী, কোন রক্ষীবাহিনীকেই দেখতে পায়নি। পেলেও সীমান্ত পেরুতে ওদের কোন সমস্যা হত না। আন্তর্জাতিক সমস্ত সীমান্ত ওদের জন্যে খোলা, পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই যখন খুশি আসা-যাওয়া করতে পারে। তবে বিশেষ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে ওদের মাল-সামান মাঝেমধ্যে তল্লাশী করা হয়, কিংবা হয়তো দু'একদিন দেরি করিয়ে দেয়া হয়। জটিলতা আরও বাড়লে রাতের অন্ধকারে বর্ডার পার হয় ওরা, সীমান্তরক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। মোটকথা, ওদেরকে আটকে রাখার সাধ্য কারও নেই।

যে-কোন দেশের সীমান্তরক্ষীরা আরব বেদুইনদের আদর্শ খদ্দের। বহুদূর কোন শহরে বা গ্রামে বউ-বাচ্চাকে ফেলে সীমান্ত পাহারা দিতে এসেছে, মন জুড়ে শুধু শঙ্কা আর সন্দেহ। সৈনিকের জীবন এই আছে এই নেই। তাদের মধ্যে অদ্ভুত এক বৈপরীত্য

হলো, একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর কঠোর, তেমনি আরেক দিকে মাদুলি কবচ আর ঝাড়-ফুঁকের প্রতি দুর্বলতা, অন্ধবিশ্বাস। উনুন আর মশালে আগুন ধরাবার সময় বিবাহিতা মেয়েরা সেজন্যেই উলুধ্বনি দিয়ে সেনা চৌকির ইজরাইলি জওয়ানদের আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিল নিজেদের উপস্থিতির কথাটা। জওয়ানরাও ফাঁকা গুলি করে ওদের আগমনকে স্বাগত জানাবে।

শিশু, কিশোরী আর তরুণীরা এল মরুর জাহাজে চড়ে। তাগড়া জোয়ান মরদরা জাহাজ অর্থাৎ উটের পিঠ থেকে দু'হাতে ধরে নামাল তাদের। সব মিলিয়ে পাঁচটা পরিবার, লোকসংখ্যা বাহাত্তর। দলে উট আছে একুশটা, ছাগল ও দুম্বা বাইশটা। পোষা কুকুর, মুরগী আর শিকারী বাজপাখিও আছে। পাঁচ পরিবার প্রধানদের সিদ্ধান্তে তাঁবু ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জবাই করে ছাড়ানো হয়ে গেল মাঝারি আকারের একটা দুম্বা আর পাঁচটা মুরগী। সবাই জানে আজ বিশেষ একটা অনুষ্ঠান আছে, আল শাহরিয়ার-এর সঙ্গে উম্মে তাওহিদার বিয়ের প্রস্তাব তোলা হবে মজলিশে। খানাপিনার আগে ও পরে গভীর রাত পর্যন্ত চলবে নাচ-গান, আনন্দ-ফুর্তি আর কথা কাটাকাটি। হ্যাঁ, কথা কাটাকাটি তো হবেই; সেটা ঝগড়া-বিবাদেও পরিণত হতে পারে, এমন কি গোষ্ঠির সর্দার যদি সিদ্ধান্ত নেন যে এ বিয়ে হবে না, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে যাই ঘটুক না কেন, সেটার উদ্দেশ্য হবে সেই পশ্চিম তীর পর্যন্ত ইজরাইলি সেনা সদস্যদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থেকে বিশেষ একটা রহস্য গোপন করে রাখা। নাটকটা সেভাবেই সাজানো হয়েছে।

সেদ্ধ মাংস আর মশলার গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। সূর্য ডোবার পরও সিঁদুরে মেঘ বেশ কিছুক্ষণ থাকল আকাশে, এই সময়টা শিশু-কিশোররা ছুটোছুটি করে কাটাল। কিশোরী আর তরুণীরা তাওহিদাকে মাঝখানে বসিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে, দ্রুত পাক খাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে তাদের ঘাঘরা, রিনিঝিনি শব্দে

তাদের পায়ের নূপুর আর ঠুংঠুং আওয়াজে কোমরে জড়ানো খুদে ঘন্টি বাজছে। একটু দূরে বসে দুই যুবক বাজাচ্ছে রবাব আর করতাল। সেনা চৌকি থেকে ইজরাইলি সৈন্যরা রাইফেলের দু'একটা ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিল বেদুইনদের উপস্থিতি সম্পর্কে তারা সচেতন। ডাকতে হবে না, ওরা নিজেরাই আসবে। দাঁতের পোকা বের করতে চাইবে কেউ, কেউ চুপিচুপি এমন মাদুলি দিতে বলবে যাতে তেল আবিবে ফেলে আসা ছটফটে তরুণী স্ত্রীটি অন্য কোন পুরুষের দিকে নজর না দেয়। প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দরকার।

রাত একটু বাড়তে পাঁচ পরিবার পাঁচটা আগুন জ্বালল। সুগন্ধি চাল, হরেকরকম মশলা আর দুম্বার মাংস দিয়ে রান্না বিরিয়ানির গন্ধে সেনা চৌকি থেকে জিভে পানি নিয়ে হাজির হলো পাঁচজন ইজরাইলি সৈনিক–একজন ক্যাপটেন, তিনজন লেফটেন্যান্ট, একজন আধবুড়ো সিপাই।

শুধু মাত্র বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে, বড়রা খেতে বসবে আল শাহরিয়ার আর উম্মে তাওহিদার বিয়ের কথাটা পাকা হওয়ার পর।

আলোচনার শুরুতেই হৈ-চৈ বেধে গেল। মেয়ের মার গলাই বড়, সে জানতে চাইছে, আল শাহরিয়ারের আছেটা কি যে তার হাতে মেয়েকে তুলে দেবে তারা? সে কি মেয়ের মা-বাপকে পাঁচটা উট আর পাঁচটা ছাগল পণ দিতে পারবে। তার কি তাঁবু আর বিছানা-পত্র কেনার পয়সা আছে? মাথায় পাগড়ি আর গলায় সাপ জড়িয়ে মেয়ের আশপাশে ঘুর-ঘুর করলে তো হবে না, বউকে খাওয়াতে-পরাতে হলে সাপ ধরে তার দাঁত থেকে বিষ বের করে বাজারে বিক্রির কৌশলও জানা চাই। মেয়ের মাকে সমর্থন করল তার তিন সতীন। তারা থামতে না থামতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল আল শাহরিয়ারের মায়েরা, তারাও সংখ্যায় কম নয়–চারজন। আর ঠিক এই সময় একজন ক্যাপটেন সহ সৈন্যরা

এসে পড়ায় শুরু হতে না হতে থেমে গেল আলোচনাটা। গোষ্ঠিপতির নির্দেশে পাঁচ পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। হাতে বোনা, বহুরঙা নকশা করা শতরঞ্জিতে বসতে দেয়া হলো; এনামেল করা বড় থালায় পরিবেশন করা হলো বিরিয়ানি, মুরগীর রোস্ট, আলু বোখারার চাটনি, আদা-রসুনের আচার আর পুরানো দ্রাক্ষারসে ভর্তি পাঁচটা বোতল। শুধু ইজরাইলি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা রাখতেই হয়, এই যেমন আঙুরের রস বা পেশাদার নর্তকী। বেদুইনরা চায় না তাদের সুন্দরী স্ত্রী ও মেয়েদের ওপর চোখ পড়ুক সৈন্যদের।

খাওয়াদাওয়া চলছে, ইজরাইলি ক্যাপটেন জানতে চাইল কি নিয়ে অমন হৈ-চৈ হচ্ছিল? গোষ্ঠিপতি অর্থাৎ সর্দার সাবাহ্ আবরি গম্ভীর, তাঁর মনের ভেতর তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ যেটা আশঙ্কা করেছিলেন তিনি, সেটাই ঘটে গেছে। ইজরাইলি সেনা চৌকি থেকে এমন এক লোক এসে হাজির হয়েছে, যে ওদের সবাইকে খুব ভাল করে চেনে। এখন যে গল্পটা তিনি ওদেরকে শোনাবার কথা ভাবছেন সেটা অনেক জটিল ও দীর্ঘ কাহিনীর অংশবিশেষ মাত্র, বাকিটা তাঁর নিজেরই জানা নেই। তিক্ততায় ভরে উঠল মন। ঠিক যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই নামতে হবে রাতকে? ওদের মধ্যে ওই আধবুড়ো সিপাইটা না থাকলে কার কি এমন ক্ষতি হত? এই এক বছরে আল্লাহ্ ওকে তুলে নেয়নি কেন? শকুনের মত চেহারা, শালার বেটা শালা প্রতি বছর দেখা হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর জেনে নেবে। যা কিছু শুনেছে সব যদি মনে রেখে থাকে, তাহলে ভীষণ বিপদ। অবশ্য এরকম বিপদের কথা ভেবেই গল্পটা বানানো হয়েছে। দেখা যাক সেটা কাজে লাগে কিনা। ক্যাপটেন প্রশ্ন করেছে, কাজেই জবাব তো দিতেই হবে। সর্দার সাবাহ্ সাবরি জবাব দিতে শুরু করলেন, তবে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না গল্পটা স্বেচ্ছায় বলবেন,

নাকি সিপাহি মোয়াক্কাস প্রশ্ন না তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

গোটা ব্যাপারটাকে সকৌতুক ও রসাত্মক করে তোলার জন্যে সর্দার সাবরি বললেন, 'আমি আমার পাঁচ স্ত্রীর কাছ থেকে জেনেছি, আল খায়রুল-এর ছেলে আল শাহরিয়ার আর বদিউস সালামের মেয়ে উম্মে তাওহিদা পরস্পরকে দেখামাত্র প্রেমে পড়ে গেছে। গোষ্ঠির সর্দার হিসেবে আমি এই মিষ্টি অথচ নাজুক সম্পর্ক বেশিদিন চলতে দিতে পারি না; দুই হাত এক করে দিয়ে ওদের মিলিত হবার রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে চাই।'

'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব!' উৎসাহ দেখিয়ে বলল ইজরাইলি ক্যাপটেন। 'দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলো, সর্দার, আমরাও তোমাদের সঙ্গে নেচে-গেয়ে দু'চারদিন ফুর্তি করি।'

সর্দার সাবরি চোরা চোখে লক্ষ করছেন আধবুড়ো সিপাই মোয়াক্কাসকে। সন্দেহপ্রবণ, ধূর্ত লোকটা প্রতিটি পরিবারের সব সদস্যকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। তার দৃষ্টি বারবার ফিরে যাচ্ছে আল খায়রুলের দিকে, সেই সঙ্গে কি যেন একটা হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছে বলে মনে হলো। সর্দার বুঝতে পারলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে মোয়াক্কাসের মনে পড়ে যাবে যে আল খায়রুল বিয়ে করেছে চারটে, কিন্তু তারপরও তার কোন সন্তান নেই। নেই মানে, হয় তার স্ত্রীরা মৃত সন্তান প্রসব করে, নয়তো জন্মাবার কিছু দিন পরই তারা মারা যায়। স্বভাবতই তার মনে প্রশ্ন জাগবে, যার সন্তানই নেই, তার ছেলের আবার বিয়ে হয় কিভাবে?

মোয়াক্কাস বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, তা সত্ত্বেও সর্দার সিদ্ধান্ত নিলেন বানানো গল্পটা বাধ্য না হলে তিনি বলবেন না। তবে কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করছেন, পরে প্রয়োজনের সময় যাতে প্রমাণ করতে পারেন ব্যাপারটা গোপন করার কোন ইচ্ছেই তাঁর ছিল না। 'ক্যাপটেন বাবাজী,' বললেন তিনি, 'আল খায়রুল বুড়ো হয়েছে। গোষ্ঠির মধ্যে তার অবস্থাই সবচেয়ে ভাল ছিল, কিন্তু স্ত্রীদের চিকিৎসা করাতে যেয়ে আজ

তার অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু আল্লাহ্ না দিলে যত চেষ্টাই করা হোক, লাঠি বা অবলম্বন পাওয়া যায় না; আবার আল্লাহ্ চাইলে হারানো লাঠিও বহুবছর পর ফিরে আসতে পারে–যে বালুঝড় কেড়ে নিয়েছিল সেই বালুঝড়ই ফিরিয়ে দিয়ে গেল...'

'সর্দার, প্যাঁচাল একটু কম পাড়লে হয় না?' একজন লেফটেন্যান্ট বিরক্ত। 'এটা সেটা কত কি দরকার আমাদের, অনেক অনুরোধ করায় মেজর সাহেব সময় দিয়েছেন...'

ক্যাপটেন তাকে ধমক দিল। 'তুমি চুপ করো! মেজর সাহেবকে আমি সামলাব। তো সর্দার, দর্শন বা ধর্ম বাদ দিয়ে, সংক্ষেপে ব্যাপারটা কি?'

সর্দার হাসলেন। 'বাবাজী, আর তো কিছু বলবার নেই আমার। যা জানাবার সবই তো সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। ছেলের বাপের সামর্থ্য নেই মেয়ের বাপকে পণ দেয়। তাই এ বিয়েতে মেয়ের মায়েরা রাজি হতে পারছে না।'

'অ। এই কথা। তো ছেলে আর মেয়েকে ডাকো তো দেখি, নিজের কানে শুনি তারা কি বলতে চায়।'

ক্যাপটেনের কথা যেন শুনতে পাননি, সর্দার সাবরি মেয়েদের উদ্দেশে তাগাদার সুরে বললেন, 'খাওয়ার পাট তো চুকল, এবার তোমাদের কার ঝুলিতে কি আছে বের করো, জেনে নাও সৈনিক বাবাজীদের কি কি দরকার।' অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে ভয়ংকর হয়ে উঠল তাঁর চেহারা, ক্যাপটেনের চোখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলছেন, 'কিন্তু খবরদার! তারা কেউ তোমাদের কারও সঙ্গে যদি কোন খারাপ ব্যবহার করে, তা যত বড় অন্যায়ই হোক, ভুলেও কাউকে বাণ মারবে না। হুঁশিয়ার! মনে রাখবে, বাণ মারা বা অভিশাপ দেয়া, তোমাদের জন্যে নিষেধ।' হঠাৎই আবার শান্ত ও সরল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা, ক্যাপটেনের দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় বললেন, 'মায়ের জাত তো, মেয়েদের অসম্মান সহ্য করতে পারে না। দু'মাস আগের ঘটনা, ওদিকের সীমান্তে এক সওদাগর

আমাদের এক কিশোরী মেয়ের দিকে খারাপ চোখে তাকিয়েছিল। ঘটনাটা মনে করলে এখনও আমার শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়।'

ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে, ক্যাপটেনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। লেফটেন্যান্ট তিনজন যে-যার সমস্যা নিয়ে বয়স্কা বেদেনীদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। একা শুধু সিপাই মোয়াক্কাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এখনও কি যেন একটা হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছে সে।

'কেন, কি ঘটল? মেয়ের মা সওদাগরকে বাণ মারল বুঝি?' আর থাকতে না পেরে অবশেষে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন।

'বাণ মারল মানে? এক মুঠো বালি নিয়ে মন্ত্র পড়ল, সেই বালি ছুঁড়ে দিল সওদাগরের দিকে। ব্যস, খেল খতম!' সর্দার সাবরি শিউরে উঠলেন।

'খেল খতম মানে?'

'সঙ্গে সঙ্গে রক্তবমি। তারই ওপর সাঁতার। তিন মিনিটের মধ্যে ওপারে গিয়ে হাজির।'

'সীমান্তের ওপারে? ডাক্তারের খোঁজে?'

মাথা নাড়লেন গম্ভীর সর্দার। 'জগতের বাইরে, বাবাজী, জগতের বাইরে। আমরা যাকে বলি দুনিয়ার বার।'

একটা ঢোক গিলে ক্যাপটেন জানতে চাইল, 'সেই বেদেনী এখনও তোমাদের সঙ্গে আছে?'

'আছে, তবে এই অপরাধের জন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে,' বলল সর্দার। 'এক বছর সে কোনও ব্যবসা করতে পারবে না।'

'সে কে, আমাকে একবার দেখাবে?'

ক্যাপটেনের কথার জবাব না দিয়ে সর্দার সাবরি বললেন 'ওই আমাদের আলী শাহরিয়ার, বুড়ি বেদেনী কাওসারি বেগমের ধূমকেতু।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্যাপটেন। তাকাল মোয়াক্কাসও। তাঁবু

থেকে বেরিয়ে এসে আগুনের সামনে দাঁড়াল যেন তরুণ যীশু। পরনে সাদা ও ঢোলা জোব্বা, মাথায় পাগড়ির মত করে একটা কাপড় জড়ানো, দুইপ্রান্ত বুকের দুপাশে ঝুলে আছে; জোব্বার নিচে বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে কালো সালোয়ার। হাতে সরু একটা সবুজ লাঠি, গলায় পরে আছে পশু ও মাছের খুদে হাড় দিয়ে তৈরি অনেকগুলো মালা। ভরাট মুখ আধ ইঞ্চি লম্বা কালো দাড়িতে ঢাকা। উন্নত ললাট। সুরমা লাগানোয় চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় সম্মোহিত করে ফেলবে। হঠাৎ প্রায় শিউরে উঠল ক্যাপটেন, কারণ তরুণের হাতের সবুজ লাঠিটা কিভাবে যেন একটা সাপ হয়ে গেল। তবে তার জন্যে আরও একটা চমক অপেক্ষা করছিল। গলায় পরা মালাগুলোর ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে আরও একটা সাপ বের করে জোব্বার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল শাহরিয়ার। তার ঠোঁটে আশ্চর্য এক মধুমাখা হাসি, তাকিয়ে আছে আগুনের ধারে বান্ধবী আর ছোটবোনের মাঝখানে বসা উম্মে তাওহিদার দিকে।

তাওহিদার মুখ লজ্জায় অবনত, কিন্তু নির্লজ্জ দৃষ্টি বারবার ছুটে যাচ্ছে শাহরিয়ারের দিকে।

মিনিট তিনেক ওদেরকে লক্ষ করার পর ক্যাপটেন বলল, 'এ বিয়ে হতেই হবে। ছেলের বাপ পণ যোগাড় করতে না পারুক, ছেলে নিজে রোজগার করে শ্বশুরের পাওনা মেটাবে।'

সর্দার চোখ বুজে মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 'আল্লাহ, তুমি সত্যিই মেহেরবান!' ক্যাপটেনের মুখ থেকে ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলেন তিনি। চোখ খুলে বললেন, 'বাবাজী, শাহরিয়ার কাজকে ভয় পায় না। কাজ পেলে এক বছরের মধ্যেই সব দেনা শোধ করে ফেলবে। কিন্তু ইজরাইলে তাকে তো কেউ কাজ দেবে না।'

'কে বলল কাজ দেবে না। আলবত দেবে।'

সর্দার সুর আরও নরম করে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভুলে

গেছেন, বাবাজী। বেদুইন কোন তরুণকে ইজরাইলে কাজ করতে দেয়া হয় না। ওঅর্ক পারমিট দেয়া হয় শুধু পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন তরুণদের, তা-ও বেছে বেছে অল্প কয়েকজনকে।'

'সর্দার, শাহরিয়ারের বিয়ের ব্যবস্থা করো তুমি,' বলল ক্যাপটেন। 'আমি ওকে ওঅর্ক পারমিটের ব্যবস্থা করে দেব, ইজরাইলের যে-কোন খামার বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারবে ও।'

সর্দার আবার মাথা নাড়লেন। 'বাবাজী, ওঅর্ক পারমিট দিতে পারেন শুধু একজন মেজর বা আরও ওপরের কোন অফিসার।'

'বললাম তো, বিয়ের ব্যবস্থা করো তুমি!' ক্যাপটেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। 'ওর ওঅর্ক পারমিট আমি মেজরের কাছ থেকেই এনে দেব।'

'ক্যাপটেন,' এতক্ষণে মুখ খুলল সিপাই মোয়াক্কাস, 'সর্দার মিছেকথা বলছে!'

'মানে?' ক্যাপটেন বিস্মিত হয়ে মোয়াক্কাসের দিকে তাকাল।

'যার কোন সন্তানই নেই, তার ছেলের বিয়ে হয় কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মোয়াক্কাস। 'আমি খুব ভাল করেই জানি, আল খায়রুলের চার বউ, কিন্তু তাদের কারও কোন সন্তান নেই। হয়, কিন্তু বাঁচে না। ক্যাপটেন, এর মধ্যে বিরাট কোন গোলমাল আছে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল সর্দার সাবরি। 'গোলমাল যে আছে, সে তো আমি নিজেই আপনাদের জানালাম,' যতটা পারা যায় হাসির আওয়াজ কমিয়ে এনে বলল সর্দার। পরক্ষণে তাঁর চেহারা আবার প্রচণ্ড ক্রোধে ভীষণ হয়ে উঠল। 'কিন্তু খবরদার! ভুলেও কেউ আমাকে মিথ্যেবাদী বলবেন না! আমি হয়তো চাইব না, কিন্তু আত্মা অভিশাপ দিয়ে বসলে আমার তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

'তুমি স্বীকার করেছ ব্যাপারটার মধ্যে গোলমাল আছে?'

সিপাই মোয়াক্কাসের গলায় তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাস। 'কই, কখন?'

'কেন, আমি বলিনি, শাহরিয়ার আর তাওহিদা পরস্পরকে দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন সর্দার।

'হ্যাঁ, বলেছ, তাতে কি হলো?'

'এ থেকে বোঝা গেল শাহরিয়ার আমাদের সঙ্গে ছিল না, সে একজন আগন্তুক। না কি বোঝা যায় না?'

'তা বোঝা গেল ঠিক,' বলল মোয়াক্কাস। 'এবার তাহলে জবাব দাও, একজন আগন্তুক আল খায়রুলের ছেলে হয় কি করে?'

'কেন, আমি বলিনি, আল্লাহ না চাইলে যত চেষ্টাই করা হোক, লাঠি বা অবলম্বন পাওয়া যায় না; আবার আল্লাহ চাইলে হারানো লাঠিও বহু বছর পর ফিরে আসতে পারে···

সর্দারের ব্যাখ্যায় ক্যাপটেন প্রায় মুগ্ধ। 'লাঠি বা অবলম্বন বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' তার শরীর বাঁকা হয়ে প্রায় একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠতে চাইছে।

'সন্তান।'

'আর শাহরিয়ার আল খায়রুলের সেই হারানো লাঠি?'

অমায়িক হেসে সর্দার সাবরি বললেন, 'বাবাজী, আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।' ঘাড় ফিরিয়ে একটা তাঁবুর দিকে তাকালেন তিনি। 'কোথায় গেল শাহরিয়ারের ভাগ্যবতী মা, ছেলের শোকে বিশ বছর কেমন বুক চাপড়েছ সেই গল্পটা এদের শোনাও একবার। ধূমকেতুর মত ফিরে এল তোমার ছেলে···'

'তারমানে শাহরিয়ারকে তার মা বিশ বছর পর ফিরে পেয়েছে?' ক্যাপটেনের বিস্ময় বাধ মানছে না।

'আমার শাহরিয়ারের তখন মাত্র ছয় বছর বয়স,' বলল কাওসারি বেগম, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আগুনের ধারে একটা মোড়ায় বসল, গায়ের চাদরটা ঠিকঠাক করছে। 'ওকে আমরা সিরিয়ার মরুভূমিতে এক বালুঝড়ের সময় হারিয়ে ফেলি।

আল্লাহর কি আশ্চর্য মহিমা আর মেহেরবানি, এত বছর পর প্রায় সেই একই জায়গায় আরেকটা বালুঝড়ের সময় ওকে আমরা খুঁজে পেলাম। পথ হারিয়ে মারাই যাচ্ছিল, বাছাকে আমরা অজ্ঞান অবস্থায় পাই...'

এই গল্প চলতেই থাকল। এমন কি সিপাই মোয়াক্কাস পর্যন্ত নিঃশব্দে গিলছে। কাওসারি বেগমের এই কথাটা খাঁটি 'সত্য, শাহরিয়ারকে মরুভূমিতে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকাটা ছিল তার অভিনয়। গোষ্ঠির প্রায় সবাইকে, বিশেষ করে যাদের বয়স খুব কম, বিশ্বাস করানো হয়েছে শাহরিয়ার সত্যি সত্যি কাওসারি বেগমের হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ক্যাপটেন বা সিপাই জিজ্ঞেস করার আগেই কাওসারি বেগম জানাল, গায়ে তিল আর জরুল দেখে নিজের ছেলেকে চিনতে পেরেছে সে। অত্যন্ত কৌশলে সে আর তার সতীনরা প্রসঙ্গ পাল্টাল। সৈনিকদের হাত দেখে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে লাগল যে হাঁ হয়ে গেল তারা, কারও চোখে পলক পড়ছে না। শাহরিয়ারের এক সৎ মা এখানে অনুপস্থিত মেজর সম্পর্কেও একটা মন্তব্য করল—মেজর কাল আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দেবেন।

পরদিন ভোর থেকে শুরু হলো উদ্বেগ আর উত্তেজনা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কাও বাড়ছে। কাল রাতে বিদায় নেয়ার সময় ক্যাপটেন কথা দিয়ে গেছে, সকাল আটটার মধ্যে ওঅর্ক পারমিট পেয়ে যাবে শাহরিয়ার। আটটার কিছু আগেই তাকে নিয়ে রওনা হয়েছে তার মা কাওসারি বেগম। বেলা গড়িয়ে এখন প্রায় দশটা বাজে, অথচ তাদের ফেরার নাম নেই। সিকি মাইল দূরে সেনা চৌকিটা দেখা যাচ্ছে, তবে সৈনিকদের কাউকে বেদুইনদের সম্পর্কে সচেতন বা আগ্রহী বলে মনে হলো না। সবাই তারা যে-যার কাজে ব্যস্ত।

বেলা সাড়ে দশটার সময় দেখা গেল কাওসারি বেগম একা

ফিরে আসছে। দূর থেকে ক্লান্ত ও বিষণ্ন দেখাল বৃদ্ধাকে। কাছে এসে এমন একটা খবর দিল সে, সর্দার বুঝতেই পারলেন না তাঁর খুশি হওয়া, না ভয় পাওয়া উচিত। কাওসারি বেগম জানাল, বেদেনীদের মুখ থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের ভাল-মন্দ খবর শোনার পর ক্যাপটেন সহ তিন লেফটেন্যান্ট ও সিপাই চৌকি-প্রধান মেজরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রেখেছিল কাল রাতেই, আজ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে তেল আবিবের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে তারা। তাদের বদলে নতুন লোক চেয়ে হেডকোয়ার্টারে ফোন করেছে মেজর, তারা না পৌঁছানো পর্যন্ত কাউকে কোন ওঅর্ক পারমিট দিতে রাজি নয় সে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া গেছে—কাল রাতে শাহরিয়ারকে ওঅর্ক পারমিট দেয়ার জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে, বিশেষ করে মোয়াব্বাসের তরফ থেকে, সেই খবর কাওসারি বেগমকে জানিয়েছে অন্য এক সিপাই। সেই সিপাই সেনা-চৌকির ভেতর, একটা বারান্দায় বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রেখেছে শাহরিয়ারকে। কাওসারি বেগম ফিরতে চায়নি, তাকে একরকম ধমক দিয়েই বিদায় করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরকম তাগড়া জোয়ান ছেলেকে কোন মা পাহারা দিয়ে রাখে?

বেলা বারোটায় সর্দার একা নন, বেদুইন গোষ্ঠির প্রত্যেকে আতংকে পাথর হয়ে গেল। সেনা চৌকি থেকে আসছে ওরা। সব মিলিয়ে প্রায় বিশজন সশস্ত্র সৈনিক। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে ইজরাইলি আর্মির ইউনিফর্ম পরা একজন মেজর। সৈনিকদের ভিড়ে শাহরিয়ারকে একবার মাত্র পলকের জন্যে দেখা গেল।

কাছে এসে দাঁড়াল মেজর, তার পিছনে দাঁড়াল বাকি সবাই। মেজর কিছুটা গম্ভীর, কিছুটা নির্লিপ্ত। জানতে চাইল, 'আমি এসেছি, কারণ আমার কাছ থেকে মিষ্টি খেতে চাওয়া হয়েছে। তবে মিষ্টি কেনার টাকা দেয়ার আগে আমি জানতে চাই, মিষ্টিটা আমি কি উপলক্ষে খাওয়াব।'

ভিড় ঠেলে শাহরিয়ারের সেই সাজানো সৎ মা সামনে চলে এসে মেজরের তিন হাত দূরে দাঁড়াল। আল খায়রুলের ছোট বউ সে, বয়স বেশি নয়। কোমরে হাত রেখে, নিতম্বে ঢেউ তুলে মেজরকে ঘিরে একটা চক্কর দিল সে, তারপর অভিনেত্রীর ঢং নকল করে গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'চুল-দাড়ি পাকেনি, টাকও গজায়নি, দু'তিন বছর পর একবারে ছুটি পেয়ে বাড়ি যান—আপনার বউ পোয়াতি হবে না তো কার বউ পোয়াতি হবে?'

সম্ভবত আন্দাজে ছোঁড়া ঢিল, তবে তার কথা শেষ হওয়া মাত্র সৈনিকরা উল্লাসে একেবারে ফেটে পড়ল। শোরগোল একটু থামতে মেজরের পক্ষ থেকে একজন লেফটেন্যান্ট জানাল, বেদেনীরা মিষ্টি খাবার টাকা চেয়েছে শুনে কাল রাতেই মেজর আর্মি হেডকোয়ার্টারের মাধ্যমে বাড়ির খবর জানতে চান। আজ, এই খানিক আগে, খবর এসেছে মেজরের স্ত্রী ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন।

আনন্দে আত্মহারা মেজর কয়েকটা মুদ্রা তুলে দিল সর্দার সাবরির হাতে, মার্কিন হিসেবে ধরলে দশ ডলার। জানা গেল শাহরিয়ারকেও পুরো এক বছরের ওঅর্ক পারমিট দেয়া হয়েছে, দক্ষতা দেখাতে পারলে ইজরাইলের ভেতর যে-কোন পেশায় কাজ করতে পারবে সে।

এ-কথা শুনে আল্লাহর প্রতি আরেকবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সর্দার সাবরি। শাহরিয়ারকে ইজরাইলের ভেতর একটা নিদিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ওঅর্ক পারমিট পাওয়ায় এখন সেটা প্রায় নির্বিঘ্নে সম্ভব হবে। এই কাজটার বিনিময়ে প্রচুর টাকা পেয়েছেন ও পাবেন তাঁরা, প্রতিটি পরিবার দু'বছর বসে খেলেও তা ফুরাবে না; তবে শুধুই টাকার লোভে নয়, ঝুঁকিটা নেয়ার পিছনে সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতি দরদেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আবার রওনা হলো ওদের কাফেলা। সর্দার চিন্তা করে দেখলেন, এখন পর্যন্ত ভাগ্য তাঁদেরকে সবদিক থেকেই সাহায্য করছে। তার আরও একটা প্রমাণ হলো; ক্যাপটেন যদি ছুটি নিয়ে চলে না যেত, শাহরিয়ারের সঙ্গে তাওহিদার বিয়েটা না দিয়ে উপায় থাকত না। অথচ এই বিয়ে নিয়ে শুধু গল্প করা যায়,বাস্তবে এটাকে সম্ভব করার প্রশ্নই ওঠে না। যাক, বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি এড়ানো গেছে।

তবে জটিলতা আরও আছে। এই বিয়ে হবার নয়, এ-কথা শুধু পরিবার প্রধানরা জানে। এমন কি তাদের স্ত্রী-কন্যারাও ব্যাপারটা জানে না।

পাহাড়ী অনুর্বর এলাকা পিছনে ফেলে এল ওরা। লোক বসতিতে ঢোকার পর কাফেলার গতি মন্থর হয়ে পড়ল। বেদুইনদের দেখে পথরোধ করছে ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলিম মহিলারা—দাওয়াই চাই তাদের, চাই মাদুলি, আবার কারও দরকার সাপের বিষ। সর্দারের নির্দেশে কোথাও তারা এক ঘণ্টার বেশি থামল না। তারপরও জেরুজালেমে পৌঁছাতে চারদিন লেগে গেল কাফেলার। এই চারদিনে ইজরাইলি টহল সৈন্যরা বেশ কয়েকবারই থামিয়েছে ওদের। শাহরিয়ারের কাছে ওঅর্ক পারমিট থাকায় খুব কম হয়রানিই পোহাতে হলো ওদেরকে।

পশ্চিম তীর। গাজা। নাবলুস। এক এক করে এরকম অনেকগুলো শহর এলাকা পার হয়ে এল সে। তারপর রামাল্লার বাইরে শাহরিয়ারের জন্যে এই শেষবার তাঁবু পড়ল। শহরের ভেতর বলে অনেক রাত পর্যন্ত ব্যবসা করল বেদেনীরা। সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে, এই সময় তাওহিদাকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন সর্দার সাবরি। বিস্মিত তাওহিদা সর্দারের তাঁবুতে ঢুকে দেখল, উনি একা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, ওঁনার স্ত্রীদের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

খুব নরম সুরে অত্যন্ত সংক্ষেপে, সর্দার শুধু বাস্তব পরিস্থিতিটা

ব্যাখ্যা করলেন–গোষ্ঠির স্বার্থে গোটা ব্যাপারটা ছিল সাজানো, শাহরিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে হবে না।

'তুমি এখন যেতে পারো,' সর্দার একথা বলার পরও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল তাওহিদা। কোন প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করেনি সে। একবার শিউরে মত উঠেছিল। সব শোনার পর সেই যে চোখ নামিয়েছে, তা আর তোলেওনি। শুধু গাল বেয়ে নেমে আসা পানি ঝরছে টপ-টপ করে।

প্রায় তিন মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল তাওহিদা। তাকে সময় দিয়ে সর্দারও আর কিছু বলছেন না। অবশেষে মুখ তুলে তাওহিদা জানতে চাইল, 'আমি কি তাকে বিদায় জানাতে পারব? একা তার তাঁবুতে গিয়ে?'

'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, বেটি,' সর্দার জবাব দিলেন। 'হ্যাঁ, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তবে তার কোন চেহারাই মনে রেখো না, কারণ ওগুলো তার আসল চেহারা নয়। তুমি জেগে থেকো, সময় হলে আমি জানাব।'

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এখন আর কয়েক মাস নয়, মাত্র কয়েক হপ্তার ব্যাপার। এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে, ইয়াসির আরাফাত আর ফিলিস্তিনিদের অবস্থা খুনই শোচনীয়। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা এখন আর কারও মুখে তেমন শোনা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই ইজরাইলিরা নতুন নতুন জায়গা দখল করে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমা হামলার সংখ্যাও কমে এসেছে, কারণ এরকম একটা বোমায় যে ক'জন ইহুদি মারা পড়ে, ইজরাইলি সৈন্যরা ট্যাংক থেকে গোলা ছুঁড়ে তারচেয়ে অনেক বেশি ফিলিস্তিনিকে খুন করছে–তাদের মধ্যে প্রতিবারই দু'একজন করে নেতাও থাকেন। ইয়াসির আরাফাতের এখন আর কোন ক্ষমতা নেই, রামাল্লা শহরে এক রকম গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তাঁকে। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে হোয়াইট হাউস থেকে

'রোডম্যাপ টু পীস' ঘোষণা করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের পক্ষপাতিত্বে সিলেক্টেড, ইলেকটেড নন, জর্জ ডব্লিউ বুশ এই শান্তির পথ রচনা করবেন দুটো শর্ত পূরণ করা হলে। প্রথমে ফিলিস্তিনিরা একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করুক। এই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি নিজে বসবেন। ইয়াসির আরাফাতকে দ্বিতীয় যে কাজটা করতে হবে, হিযবুল্লাহ্ ও হামাস গ্রুপের তালিকাভুক্ত জঙ্গি নেতাদের গ্রেফতার করে ফিলিস্তিনি কারাগারে ভরবেন তিনি।

কোণঠাসা অবস্থায় পরে ইয়াসির আরাফাত বাধ্য হয়ে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত পূরণের জন্যেও ফিলিস্তিনি স্পেশাল সিক্রেট পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। স্পেশাল সিক্রেট পুলিসের কয়েকটা দল পশ্চিম তীর, গাজা, নাবলুস ও রামাল্লার বাইরে হামাস ও হিযবুল্লাহ্ গ্রুপের লীডারদের গ্রেফতার করার জন্যে অভিযান চালাচ্ছে। এই রকম একটা দল শহরের উপকণ্ঠে ফেলা বেদুইনদের তাঁবুতে হানা দিল।

রাত তখন গভীর। আল শাহরিয়ারের তাঁবুতে পেন্সিল টর্চের আলো বারকয়েক জ্বলল ও নিভল। তারপরই তাঁবুর বাইরে হাঁটাচলার খসখসে আওয়াজ হলো। কে যেন ফিসফিস করল, 'আবু মুসা?'

আবু মুসা, মার্কিন-ইজরাইলিদের দৃষ্টিতে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্যে অন্যতম একটা হুমকি। তার নির্দেশে ফিলিস্তিনিরা আত্মঘাতী বোমা ফাটিয়ে বহু ইজরাইলিকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই হামাস নেতা ফিলিস্তিনিদের কাছে একজন অসমসাহসী বীর।

তাঁবুর ভেতর থেকে আল শাহরিয়ার আরবীতে জবাব দিল, 'আদি ও অকৃত্রিম।'

তাঁবুর পর্দা ফাঁক করা হলো না, ওটার পিছন দিকের বালি খুঁড়ে একটা ভারী সুটকেস আর একটা ব্রিফকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকল একদল ফিলিস্তিনি স্পেশাল সিক্রেট পুলিস—সরাসরি

ইয়াসির আরাফাতের নির্দেশ পালন করছে তারা। ওদের দ্বিতীয় দলটা তাঁবুর বাইরে সতর্ক পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকল গাঢ় অন্ধকারে আরও গাঢ় ছায়া হয়ে।

গোটা তাঁবু একটা ক্যানভাসে ঢেকে দেয়া হয়েছে, ফলে বাইরে থেকে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে না।

স্পেশাল সিক্রেট পুলিসের দলটা তিন ঘণ্টা থাকল আল শাহরিয়ারের তাঁবুর ভেতর। তারা যখন বেরুচ্ছে, ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ভোর হতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। বেরুবার সময় তাদের সঙ্গে শুধু ব্রিফকেসটা দেখা গেল, সুটকেসটা তাঁবুতে রেখে এসেছে। চওড়া ক্যানভাসটা তাঁবু থেকে তুলে নিল তারা। ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে এসেছে বেদুইন শাহরিয়ারের সমস্ত কাপড়চোপড়।

তাঁবু খালি হয়ে গেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, ফ্ল্যাপ তুলে ভেতরে ঢুকল তাওহিদা। সর্দারই তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। শুধু পৌঁছেই দিয়ে গেলেন, ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে ওখানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন না।

তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকার। ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। আল শাহরিয়ারকে আগেই জানানো হয়েছে যে তাওহিদা তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সে অন্ধকারেই তার অপেক্ষায় বসে আছে।

পায়ের শব্দ অকস্মাৎ থেমে যেতে শাহরিয়ার খুক করে কেশে বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ডান পাশে একটা চামড়ার বড় সুটকেস আছে, ওটার ওপর বসতে পারো।'

'শাহরিয়ার, আপনি আলো জ্বালবেন না?' ফিসফিস করে কথা বলল তাওহিদা। 'আমি আপনার এই নতুন চেহারাটাও দেখতে চাই।'

শাহরিয়ার বলল, 'ও, তুমি তাহলে সব জানো।'

'সব?' অন্ধকারে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'নাহ্!'

বোঝা গেল, গলায় উঠে আসা কান্নাটাকে আটকে রাখার জন্যে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

'আমার সম্পর্কে সবটুকু জানা বিপজ্জনক, তাই কাউকে জানানো হয়নি,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল শাহরিয়ার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই চেহারাটাও আমার নয়, তারপরও দেখতে চাইছ কেন?'

'দুটো নকল চেহারার ভেতর যদি আসল চেহারার খানিকটা আভাস পাই, এই আশায়,' তাওহিদার কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর।

'সত্যি কথা বলো। সরাসরি বলো। তুমি কি আমাকে এতটা ভালবেসে ফেলেছ যে মনে হচ্ছে ভুলতে পারবে না?'

'তা যদি বেসেও থাকি, তাতে আপনার কোন দায় বা কৃতিত্ব, কোনটাই নেই,' তাওহিদা সরাসরি জবাব দিচ্ছে না, তবে সত্যি কথা বলছে। 'আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারি, আপনি সাড়া দিচ্ছেন না। ফল হয়েছে উল্টো, আমি আরও বেশি–' নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে গেল সে।

চুড়ির ঘন ঘন শব্দ শুনে শাহরিয়ার বলল, 'তুমি চোখের পানি মুছছ।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না মেয়েটা। কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিল। 'হ্যাঁ, কিন্তু বলতে পারছি না এই পানি আপনি আমার চোখ থেকে মুছিয়ে দিন। সে অধিকার আপনি দেননি।'

শাহরিয়ার চুপ করে থাকল। বুকে একটা মোচড় অনুভব করল সে। তারপর বলল, 'আমার যাবার সময় হয়েছে। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা চাই।'

'এটা কোন প্রসঙ্গ নয়। আমরা কেউ কোন অপরাধ করিনি।' নিজেকে ইতোমধ্যে অনেকটাই সামলে নিতে পেরেছে তাওহিদা। 'আপনার কথা জানি না, তবে আমার একটা দুঃখ সারা জীবন থাকবে–কোনওদিন জানা হবে না কে আপনি, কোত্থেকে এসেছিলেন, কোথায়ই বা চলে গেলেন। কিংবা কে জানে, সময়

তো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক, একদিন হয়তো সন্দেহ জাগবে মনে, সত্যি কি কোনদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল?'

শাহরিয়ার বিদায় নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। 'আমি তাহলে যাই?'

'আপনাকে আমি দেখতে এসেছিলাম,' আবার বলল তাওহিদা। 'এও আশা করেছিলাম, আপনি হয়তো এমন কিছু দিতে চাইবেন আমাকে যার কথা চিরকাল মনে থাকবে আমার—ইচ্ছে করলেও অনুভূতিটা মুছে ফেলতে পারব না।'

শাহরিয়ারের ইচ্ছে হলো বলে যে চামড়ার সুটকেসটায় মধ্যবিত্ত ঘরের একটা মেয়ের বিয়েতে যা কিছু লাগতে পারে তার সবই আছে। তারপর ভাবল, বলবার দরকার কি, সে তো এক সময় সব দেখতেই পাবে। তারপর, হঠাৎ করে, তাওহিদার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ আঁচ করতে পারল সে। মেয়েটা কি চাইছে সে তাকে একটা চুমো দিক? মুছে ফেলা যায় না, এরকম অনুভূতি আর কি হতে পারে?

'দুঃখিত। তোমার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না।'

'পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন!' হেসে উঠল তাওহিদা। 'আমি বেদুইনকন্যা, সাহস করলে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি, পছন্দ হলে কাউকে অনেক কিছু দিতেও পারি। কিন্তু আপনি না পারেন কিছু দিতে, না পারেন কিছু নিতে—কারণ আপনি একজন ভদ্রলোক।' একটু থামল সে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বিদায়। ভাল থাকুন, এই দোয়া করি। তবে, চেহারাটা একবার দেখব, হোক নকল।' বলে হাতের টর্চটা জ্বালল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে নিজের মুখ চেপে ধরল তাওহিদা, আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

শাহরিয়ারের গোটা শরীর কালো চাদর দিয়ে মোড়া। এমন কি তার মাথাতেও পরানো হয়েছে কালো কাপড়ের মুখোশ—শুধু নাক আর ঠোঁটের কাছে তিনটে খুদে ফুটো দেখা যাচ্ছে।

টর্চ নিভে গেল। থরথর করে কাঁপছে তাওহিদা।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল আল শাহরিয়ার। ফিলিস্তিন সিক্রেট পুলিসের বিশজনের সদস্য ঘিরে ফেলল ওকে, একটা সাদা মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। আশপাশের মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসছে।

দুই

সকাল সাড়ে ছ'টায় ইজরাইলি ব্যারিকেড-এর সামনে প্রথমবার থামল মাইক্রোবাসটা। রোডব্লকের ভেতরে এবং বাইরে পাঁচ-ছ'টা ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে বালির বস্তার পিছনে, ইস্পাতের তেপায়ার ওপর বসানো হয়েছে আট-দশটা মেশিনগান। চৌমাথার চারদিকে ইজরাইলি আর্মারড ভেহিকেল আর সশস্ত্র সৈন্যদের বিরতিহীন আসা-যাওয়া চলছে। চেক পোস্টগুলোয় প্রতিটি গাড়ি ও পথিককে থামানো হচ্ছে, ভাল করে তল্লাশী না করে কাউকেই রামাল্লার জিরো পয়েন্টের দিকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। রামাল্লার জিরো পয়েন্ট বলতে এখন ফিলিস্তিনি নেতাদের জেলখানাকে বোঝায়। এখানে ইয়াসির আরাফাতের অফিশিয়াল হেডকোয়ার্টার ও অন্যতম বাসস্থান। তাঁর মত পার্লামেন্ট সদস্যদেরকেও এই এলাকায় আটকে রেখেছে ইজরাইলি সৈন্যরা। ফিলিস্তিনি পার্লামেন্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, ইয়াসির আরাফাতের সদর দপ্তর, এমনকি তাঁর বাড়ির ওপরও মাঝে মধ্যে ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের মহান নেতা এখনও বেঁচে আছেন বলতে গেলে একরকম

ভাগ্যগুণেই।

এই সাদা মাইক্রোবাসটাকে ইজরাইলি চেক পোস্টের সৈন্যরা খুব ভাল করেই চেনে। তারা এ-খবরও রাখে যে ফিলিস্তিনিদের নেতা ইয়াসির আরাফাত কোণঠাসা অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে হিযবুল্লাহ্ আর হামাস জঙ্গিদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্পেশাল সিক্রেট পুলিস গত সাতদিনে চারজন হিযবুল্লাহ্ আর একজন হামাস জঙ্গি লীডারকে গ্রেফতারও করেছে। তাদের এই তৎপরতায় ইহুদি সৈন্যরা খুশি, কারণ তাদের ধারণা এই গ্রেফতার অভিযান চলতে থাকলে ইজরাইলি এলাকায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আরও কমে যাবে।

ফিলিস্তিনি স্পেশাল সিক্রেট পুলিসের তৎপরতায় ইজরাইলি সৈন্যরা খুশি হলেও, রামাল্লার জিরো পয়েন্টের দিকে যেতে দেয়ার আগে প্রতিবারই তাদের মাইক্রোবাস খুঁটিয়ে সার্চ করে তারা কোন বন্দি থাকলে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেয় কাকে গ্রেফতার করা হলো।

প্রতিবারের মত আজও মাইক্রোবাস থেকে নামতে বলা হলো পুলিসদের। অন্যান্য দিন বিনা তর্কে নেমে আসে তারা। কিন্তু আজ নামল না। জবাবে বলল, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন বন্দি রয়েছে, বিশেষ কারণে তাকে বেশি নড়তেচড়তে দেয়া উচিত হবে না।

সৈন্যরা উঁকি দিয়ে দেখল, মাইক্রোবাসের ভেতর কালো মুখোশ পরা একজন লোক বসে আছে। তার শরীরও কালো পোশাক বা চাদরে ঢাকা। 'কে ও? ওকে এভাবে নিয়ে যাবার মানে কি?'

'পথ ছেড়ে দাও,' সাবধান করার সুরে বলল মাইক্রোবাসের ড্রাইভার। 'ভাল চাও তো ওকে ঘাঁটিয়ো না।'

ফিলিস্তিনি পুলিসদের চোখেমুখে এমন একটা কিছু আছে,

ইজরাইলি সৈন্যদের মনে ভয় ঢুকে গেল। কয়েক মাস আগেও তো প্রায় প্রতিদিন আত্মঘাতী বোমা হামলা হচ্ছিল, কাজেই তাদের ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। তবে ভয় পেয়ে পালাবার বা দায়িত্ব অবহেলা করার স্বভাব কিংবা ট্রেনিং তারা পায়নি। ইশারা করতে যা দেরি, চারদিক থেকে আরও কিছু সৈন্য ছুটে এল। শুধু তাই নয়, সতর্ক হয়ে গেল চৌরাস্তায় মোতায়েন করা ট্যাংকগুলোও, ব্যারেল ঘুরিয়ে মাইক্রোবাসটার দিকে কামান তাক করল গানাররা।

এবার ফিলিস্তিনি স্পেশাল সিক্রেট পুলিসের দিকে কারবাইন তাক করল ইজরাইলি সৈন্যরা। ওদের নেতৃত্বে রয়েছে একজন মেজর। ফিলিস্তিনি পুলিসের ইন্সপেক্টরের বুকে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল ঠেকাল সে। 'আমরা কোন নাটক চাই না। ওকে নামতে বলো। তারপর মুখোশটা খোলো। আমরা দেখব ইয়াসির আরাফাতের কাছে কাকে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা।'

'ওকে আমরা জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছি, নেতার কাছে নয়,' জবাব দিল ইন্সপেক্টর।

'জেলখানায় নিয়ে যাও বা জাহান্নামে,' আরও কঠিন হলো মেজরের কণ্ঠস্বর, 'ওর পরিচয় দাও, চেহারা দেখাও।'

ইন্সপেক্টর দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল। 'আবু মুসা।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল মাইক্রোবাসের চারধারে সব ক'জন সৈন্য। তারপর সবাই যেন একযোগে একটা ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল। চাপা গুঞ্জন উঠল—আবু মুসা! আবু মুসা! কুখ্যাত হামাস লীডার আবু মুসা!

'নামাও ওকে। আমরা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'তাতে কিন্তু বিপদ হতে পারে,' সাবধান করে দিয়ে বলল ফিলিস্তিনি ইন্সপেক্টর। 'আমি শুধু নিজেদের না, তোমাদের নিরাপত্তার কথাও ভাবছি।'

ইজরাইলি মেজর হাসল। 'আমাদের ওঅর স্ট্র্যাটিজির

বৈশিষ্ট্যই। তো এটা—আমাদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে তোমাদেরকে মাথা ঘামাতে বাধ্য করা। তোমরা খুব ভাল করে জানো, রামাল্লার আশপাশে কোন আত্মঘাতী বোমা ফাটলে ইয়াসির আরাফাতকে আমরা এবার সত্যি সত্যি উড়িয়ে দেব।'

'কিন্তু তোমরাও কি জানো না যে হামাস লীডার আবু মুসা ইয়াসির আরাফাতকে নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও, তাঁর নীতির ঘোর বিরোধী সে?'

'ভয় আর যুক্তি যতই দেখাও,' বলল মেজর, 'কোন কাজ হবে না। যা বলছি, শোনো।' ইন্সপেক্টরের বুকে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল আরেকটা চেপে ধরল সে। 'নামাও ওকে।'

অগত্যা অসহায় একটা ভাব করে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করল ফিলিস্তিনি পুলিস ইন্সপেক্টর। মুখোশ ও কালো চাদরে আবৃত 'আবু মুসা'-কে মাইক্রোবাস থেকে নামতে সাহায্য করল তারা—ভাব দেখে মনে হলো পাঁচ মণী বোঝা নামাচ্ছে।

ইতোমধ্যে একজন ইজরাইলি ক্যাপটেন হামাস নেতাদের ফটো সহ একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়েছে মেজরের হাতে। মেজর কঠিন গলায় নির্দেশ দিল, 'মুখোশ খোলো!'

কালো মুখোশ আবু মুসার মুখ ও গলা ঢেকে রেখেছে। ফিতের গিটটা ঘাড়ের পিছনে, সেটা খুলে মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া হলো মুখোশ।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একটা পাহাড়, আবু মুসার চেহারাও ভয়ানক। ঘন কালো চওড়া গোঁফ দাড়ির সঙ্গে মিশে আছে। দাড়িটা চকচকে ফ্রেঞ্চ; মাঝখানে উন্নত ললাট, তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক তাচ্ছিল্যের হাসি। চোখ দুটো টকটকে লাল, ঠিক যেন দু'টুকরো আগুন।

হাতের ফটোর সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো লোকটার চেহারা বারবার মেলাল, ইজরাইলি মেজর। 'হ্যাঁ, আবু মুসাই,' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'যাক, এত দিনে তোমরা একটা কাজের

কাজ করলে তাহলে।'

'আমাদের মহান নেতা রোডম্যাপ টু পীস-এর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন, এই আশায় যে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।'

মেজর ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসল, তাচ্ছিল্য চেপে রাখার কোনও চেষ্টাই করছে না। 'তুমি ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে মিলিটারি অ্যাকশনকে আলাদা করতে পারছ না। তোমার আর আমার কাজ ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের ধরে হত্যা করা বা জেলে ভরা। তুমি কাজটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও করছ, আমি করছি সানন্দে। ঠিক আছে, এবার ওর গা থেকে চাদরটা সরাও, দেখি আরাফাতের কাছে গোপন কি জিনিস নিয়ে যাচ্ছ তোমরা।'

ফিলিস্তিনি এসএসপি-র ইন্সপেক্টর বলল, 'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, তার আগে গোটা এলাকা থেকে তোমাদের সমস্ত সৈন্য নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নাও।'

মেজর রেগে গেল। 'মানে? তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'শুধু সৈন্য নয়, আমি পরামর্শ দেব ট্যাংকগুলো সরিয়ে নেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ইজরাইলি সৈন্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ইন্সপেক্টরের হাবভাব আর কথাবার্তা এখন আর তারা হালকাভাবে নিতে পারছে না। তবে মেজর তার স্বভাবসুলভ বিদ্বেষ গোপন করার কোন গরজ দেখাল না, বলল, 'এই শেষবার অর্ডার করছি! চাদর খোলো!'

এসএসপি-র ইন্সপেক্টর তার একজন হাবিলদারকে ইঙ্গিত করল। হাবিলদার নিঃশব্দে হেঁটে এসে আবু মুসার পিছনে দাঁড়াল। চাদরের মত গায়ে জড়ানো কালো কাপড়টা আসলে একটা ঢোলা আলখেল্লা, ঘাড়ের পিছন থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চেইন দিয়ে আটকানো। চেইনটা ধরে টান দিল হাবিলদার। আবু মুসার শরীর থেকে আলখেল্লাটা খসে পড়ল।

এখানে উপস্থিত এমন কেউ নেই যে আঁতকে উঠল না। আবু মুসা একটা খাকি ইউনিফর্ম পরে আছে, তাতে কম করেও বিশ-বাইশটা চওড়া পকেট্। প্রতিটি পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে বিস্ফোরক–কোনটা সি-ফোর, কোনটা জেলিগনাইট। পকেট ভর্তি সবগুলো বিস্ফোরক পরস্পরের সঙ্গে তার দিয়ে জোড়া লাগনো। এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, প্রতিটি পকেটের বিস্ফোরকের সঙ্গে, মাথার দিকে, সবুজ রঙের চকচকে ও মসৃণ একটা পাত রয়েছে। ইজরাইলি মেজর জিনিসটা দেখল ঠিকই, কিন্তু চিনতে পারল না। তবে এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার! শরীরে অন্তত একমণ বিস্ফোরক বহন করছে আবু মুসা! সে যদি বিস্ফোরিত হয়, চৌরাস্তায় উপস্থিত কেউ বাঁচবে না। 'তো-তোমরা ওর হাত বাঁধোনি কেন?'

এক পাশে সরে গিয়ে ইজরাইলি মেজরকে পথ করে দিল ফিলিস্তিনি ইন্সপেক্টর। 'যাও, তুমি বাঁধো।'

মেজরের পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে, এক চুল নড়তে পারল না সে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'তুমি যে কারণে ওর হাত বাঁধতে পারছ না, আমরাও সেই একই কারণে বাঁধতে পারিনি। তবু তো আবু মুসা তোমাকে কিছু বলছে না। কিন্তু আমাদেরকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওর গায়ে হাত দিলেই বোতাম টিপে দেবে।'

'কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'আমরা নিয়ে যাচ্ছি বললে আবু মুসাকে অপমান করা হবে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'ধরা পড়ার পর ও নিজেই আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে।'

'মানে?'

'মানে, আমাদের কথায় নিরস্ত্র হতে বা চরমপন্থী হামাসের নেতৃত্ব ত্যাগ করতে রাজি নয় ও। মহান নেতা আরাফাত কি বলেন, নিজের কানে শুনতে চায়।'

'কিন্তু তখন না বললে আরাফাতের কাছে নয়, ওকে তোমরা জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছ?' কথার মধ্যে অসঙ্গতি পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল ইহুদি মেজর।

'ঠিকই বলেছি। ওই জেলখানাতেই তাঁর প্রিয় শিষ্য আবু মুসার সঙ্গে দেখা করবেন আমাদের মহান নেতা,' জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'আশাকরি তোমাদের কৌতূহল মিটেছে, এবার আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দাও।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মেজর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যদি দূর থেকে ট্যাংকের গোলা ছুঁড়ে তোমাদের মাইক্রোবাসটা উড়িয়ে দিই?'

'আত্মহত্যা করতে চাইলে দেবে।'

'আমি বলেছি, দূর থেকে।'

'আর আমি বলছি তুমি একটা বেকুব!' জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'তা না হলে এতক্ষণে দেখতে পেতে জিনিসটা।'

রাগ চেপে মেজর তাকিয়ে থাকল। 'কি জিনিস?'

'পাইরোটর্চ ৬১০,' বলল ইন্সপেক্টর। 'তাকিয়ে দেখো, প্রতিটি বিস্ফোরকের মাথা ওটা দিয়ে মোড়া। পাইরোটর্চ কি, কোন ধারণা আছে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না সে। 'হাইলি ইনসেন-ডিয়ারি। একবার জ্বললে নেভানো প্রায় অসম্ভব। ছোট একটা টুকরো বিশাল এক দালানের ভেতর জ্বালাও, গোটা কাঠামো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। এর মানে বোঝো? আবু মুসা বিস্ফোরিত হলে রামাল্লা তো বটেই, তোমাদের সমস্ত পুরানো ও নতুন বসতি নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর বিস্ফোরণের ফলে সঙ্গে সঙ্গে চৌরাস্তার সবাই তোমরা মারা পড়বে।'

মেজরের উদ্দেশে ইহুদি সৈন্যরা একযোগে আবেদনের সুরে কিছু বলছে। সবার বক্তব্য শোনার পর ইঙ্গিতে ব্যারিকেড তুলে নেয়ার নির্দেশ দিল সে।

কালো আলখেল্লাটা আবার পরানো হলো আবু মুসাকে।

মুখোশটাও।

'এক সেকেন্ড!' হঠাৎ প্রশ্ন করল মেজর। 'ওকে তোমরা মুখোশ পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'এই জন্যে যে কোন ট্রিগার-হ্যাপি ইজরাইলি সোলজার যাতে ওকে চিনতে পেরে গুলি না করে।'

'তা করবে না,' বলল মেজর। 'সামনের প্রতিটি রোডব্লকে ফোন করে দিচ্ছি আমি; তোমাদের মাইক্রোবাসকে তারা থামাবে না।'

'ধন্যবাদ, মেজর,' বলল ইন্সপেক্টর। 'বিশ্বাস করো, আমরাও শান্তির জন্যেই জীবন বাজি রেখে কাজ করছি।'

মাইক্রোবাস রওনা হয়ে গেল। বিশজন পুলিস ও আবু মুসা আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। ইজরাইলি মেজর মুখে যাই বলুক, তার মনে কি আছে কে জানে! রাস্তাটা প্রায় একশো গজ সরলরেখার মত এগিয়েছে, মাইক্রোবাস শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে দেখে সে যদি একটা ট্যাংকের গামারকে গোলা ছোঁড়ার নির্দেশ দেয়?

সামনের বাঁকটা যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে উত্তেজনা। অবশেষে ড্রাইভার মোড় ঘুরে রাস্তাটাকে পিছনে ফেলে এল। সবারই মনে পড়ল, এতক্ষণ তারা দম আটকে রেখেছিল।

পরবর্তী রোডব্লকে ওদেরকে থামানো হলো না।

ফিলিস্তিনিদের একটা দুর্গম দুর্গ, অর্থাৎ জেলখানায় নিয়ে এসে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে ভরা হলো আবু মুসাকে। পকেট থেকে বিস্ফোরক বের করে নিয়ে চলে গেল সঙ্গীরা। সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল বন্দি। নখের ডগা ব্যবহার করে মোজাইক করা দেয়ালে অতিসূক্ষ্ম ও অদৃশ্য রেখা খুঁজছে। দশ মিনিটের মধ্যে আন্দাজ করল পেয়েছে জিনিসটা। মাপা চার হাত হেঁটে এসে মেঝে পেরুল, তারপর উল্টো দিকের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিতে শুরু করল। বলে দেয়া হয়েছে, চাপ ক্রমশ বাড়াতে

হবে। তাই করছে সে। প্রায় মিনিট আড়াই পর দেয়াল নয়, মোজাইক করা মেঝের একটা চৌকো অংশ ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল। সামান্য ঘর্ঘর আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তাকে বলা হয়েছে, আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে সে ছাড়া অন্য কোন বন্দি, এমনকি কোন প্রহরীও থাকবে না।

মেঝের অংশটুকু প্রায় সাতফুট নেমে থামল। কিনারা থেকে নিচে পা ঝুলিয়ে দিয়ে মুসাও নামল সেটার ওপর। সদ্য তৈরি চৌকো গর্তটার গায়ে একটা টানেলের মুখ দেখা যাচ্ছে। ওটার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হলো তাকে। সামনে আলোর আভাস। দেয়াল হাতড়াতে একটা হাতল পাওয়া গেল, লোহার বা ইস্পাতের। সেটা ধরে নিচের দিকে টানতে হবে তাকে। টানতেই ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সেলের নেমে আসা মেঝে আবার জায়গা মত উঠে গেল।

সামনে পড়ল এক প্রস্থ সিঁড়ি। নিচে করিডর। তারপর এলিভেটর। আগে কখনও আসেনি, তবে শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। এলিভেটর উঠে এল ফিলিস্তিনিদের অবিসংবাদিত মহান নেতা ইয়াসির আরাফাতের ব্যক্তিগত স্টাডিতে। খবর তিনি আগেই পেয়েছেন কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে, তাই এলিভেটরের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। আবু মুসা মৃদু হেসে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, এক পা এগিয়ে এসে ইয়াসির আরাফাত তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, বললেন, 'আল্লাহকে হাজার হাজার শোকর, রানা, জেনারেল তোমাকেই পাঠিয়েছেন!'

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে প্রথমেই মাসুদ রানা জানতে চাইল, 'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?'

'বলছি, কারণ কাজটা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তোমার সমস্ত রেকর্ড মনে রেখে এ-ও বলছি, নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর এই

কাজ একা কারও পক্ষে আদৌ করা সম্ভব কিনা, তাও আমি জানি না।'

'ডেকেছেন যখন,' বলল রানা, 'যত কঠিনই হোক সাধ্যমত চেষ্টা করব, মিস্টার আরাফাত। তবে কাজের কথা পরে হবে, তার আগে আমি এই চেহারাটা বদলাতে চাই, তারপর আমার কিছু কৌতূহল আছে...'

'হেলপ ইওর সেলফ্, মাই সান,' বলে একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ইয়াসির আরাফাত। 'ভাল কথা, এখানে আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'ধন্যবাদ।' দরজা খুলে পাশের কামরায় চলে এল রানা। এটা ড্রেসিংরুম, সংলগ্ন বাথরুম সহ। ওয়ার্ড্রোবের ওপরে ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেদুইন তরুণ আল শাহরিয়ারের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ, ছদ্মবেশের সমস্ত উপকরণ সহ। পাশেই একটা প্লাস্টিক ফোল্ডারের ভেতর ইজরাইলি সেনা চৌকির প্রধান সেই মেজরের ইস্যু করা ওঅর্ক পারমিট। সম্ভবত এটা দেখিয়েই আল শাহরিয়ার ওরফে মাসুদ রানাকে ইজরাইল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

ছদ্মবেশ বদলে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল রানা, তারপর স্টাডিতে ফিরে এসে ডেস্কে বসল ফিলিস্তিনি নেতার মুখোমুখি একটা চেয়ারে। 'আমার প্রথম কৌতূহল, আবু মুসাকে এখন যদি কোথাও দেখা যায় বা তাকে যদি ইজরাইলি সোলজাররা গ্রেফতার করে, আপনার সিক্রেট পুলিস তার কি ব্যাখা দেবে?'

আরব নেতার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'গতমাসে ইজরাইলিদের গুলিতে রামাল্লায় ছয়জন হামাস সদস্য মারা যায়, রানা। ওরা জানে না তাদের মধ্যে আবু মুসা ছিল। রামাল্লায় সে আছে, এটাই তাদের ধারণার মধ্যে ছিল না। হামাস সদস্যদের মনোবল ভেঙে যাবে, তাই আমরাও খবরটা গোপন করে রাখি।'

'কিন্তু এখন যখন তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, আমি

চলে যাবার পর ইজরাইলি আর্মিকে কি ব্যাখা দেবেন?'

তার লাশ আমরা কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করছি,' শান্তির কাজ করে নোবেল বিজয়ী আরাফাত বললেন। 'তুমি চলে যাবার পর আমরা ঘোষণা করব একটা দুর্ঘটনায় গুলি খেয়ে মারা গেছে সে।'

রানার ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল। 'আমার আরেকটা কৌতূহল। ঢাকায় আপনি লোক মারফত খবর পাঠালেন বিসিআই-এর জরুরী সাহায্য দরকার আপনার। কি সাহায্য দরকার তা বলেননি, অথচ বিসিআই-এর এজেন্ট কিভাবে ইজরাইলে ঢুকে রামাল্লা পর্যন্ত আসবে তার প্ল্যানটা বিস্তারিত জানিয়ে দেন। আপনি জানলেন কিভাবে বিসিআই সাহায্য করবেই?'

সেই অতি পরিচিত সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ, তিনি বিস্ময় ও আন্তরিক দাবি মেশানো কণ্ঠে একটা মাত্র বাক্যে জবাব দিলেন, 'বাহ্, বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু না!'

মেজবান হিসেবে পট থেকে নিজের হাতে কফি পরিবেশন করছেন আরাফাত, রানা বলল, প্ল্যানটা পরীক্ষা করার পর আমরা কিছু পরিবর্তন আনি, সেজন্যে আপনার মেসেঞ্জারের হাতে কিছু টাকাও পাঠাই...'

'হ্যাঁ, টাকাটা আমরা পেয়েছি এবং যথারীতি বিব্রতও হয়েছি।' তবে এই মুহূর্তে বিব্রত নন, আরাফাত হাসছেন। সুটকেসটায় একটা বিয়ের কনের যা যা লাগার কথা সবই দেয়া হয়েছে, দেখেছ নিশ্চয়ই?'

হেসে ফেলল রানাও। 'নাহ্, আমি কেন দেখতে যাব! যাক, এবার আমার সর্বশেষ কৌতূহলটা বলি। মেসেঞ্জারকে দিয়ে বিসিআই-এর সাহায্য চাইলেন, ভেতরে ঢোকার ডিটেলস্ প্ল্যান পাঠালেন, কিন্তু কি সাহায্য দরকার তার কোন আভাসই দেননি।'

'শুধু ওই মেসেঞ্জার নয়, বিপদের খবরটা আমি যাদেরকে

আমার ডান হাত বা বাম হাত বলে গণ্য করি তাদেরকেও জানাইনি। এই বিপদ সম্পর্কে শুধু আমি জানি, আর জানে ইজরাইলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ-এ লুকিয়ে থাকা আমার একজন এজেন্ট।'

'এবার তাহলে সেই বিপদের কথাটাই শোনা যাক,' বলল রানা।

কফির কাপে চুমুক দিলেন আরাফাত, গলায় ও মাথায় জড়ানো চাদরটা ঠিক-ঠাক করে নিলেন, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, শুরু করি।'

ইজরাইলের এ এক নিষ্ঠুর ও নৃশংস ষড়যন্ত্র। এই পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারনের নির্দেশে মোসাদ হেডকোয়ার্টারে বসে করা হয়েছে। একটাই লক্ষ্য, ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন-সার্বভৌম যে রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছে সেটাকে চিরকালের জন্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া। মোক্ষম এমন একটা আঘাত হানা হবে, ওই এক আঘাতেই স্বাধীনতার নাম ভুলে যাবে তারা।

কি সেই আঘাত?

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা আসন্ন। বুশ-রেয়াররা বলছেন, দুই কি তিনদিনের মধ্যে সাদ্দাম উৎখাত হবেন, পতন ঘটবে ইরাকের। স্বভাবতই সারা দুনিয়ার সব মানুষের মনোযোগ তখন ও দিকেই থাকবে। আর ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটানো হবে! পশ্চিম তীরের রামাল্লায় হানা হবে সেই মোক্ষম আঘাত।

পশ্চিম তীরের রামাল্লায় কেন? এর উত্তর পানির মত সহজ। ফিলিস্তিনিদের পার্লামেন্ট ভবন, ইয়াসির আরাফাতের সদর দফতর, পার্লামেন্ট সদস্যদের কোয়ার্টার, প্রথম সারির ফিলিস্তিনি রাজনীতিকদের বাড়ি, পুলিস হেডকোয়ার্টার ইত্যাদি সবই তো ওখানে। কাজেই এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে যে আঘাতটা করা হবে ওই রামাল্লাতেই।

কি আঘাত? ট্যাংক থেকে গোলা আর হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে শেল ছুঁড়ে সব ধ্বংস করে দেবে? না। কাজটা করানো হবে মোসাদকে দিয়ে, সেনাবাহিনী থাকবে ব্যাকআপ হিসেবে–যাতে কেউ কর্ডন ভেঙে পালাতে না পারে। পাঁচশো মোসাদ এজেন্ট ঢুকবে রামাল্লায়, তাদের বেশভূষা দেখে সবাই জানবে ওরা হিযবুল্লাহ্ আর হামাস-এর সদস্য।

যে নাটকটা সাজানো হবে তাতে পাশবিকতার প্রাধান্য তো থাকবেই, তার সঙ্গে শঠতা-নীচতাও কম থাকবে না। আগেই প্রচার করা হবে, হিযবুল্লাহ্ আর হামাসের বিরাট একটা বাহিনী ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন চলার সময় পার্লামেন্ট ভবনেই ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র জমা দেবে, শপথ করে বলবে মার্কিনিদের রোডম্যাপ টু পীস'কে একটা সুযোগ দেয়ার জন্যে আজ থেকে চরমপন্থা ত্যাগ করল তারা। ওই পার্লামেন্ট ভবন ও রামাল্লা ছাড়া ফিলিস্তিনি জনগণের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতাদের একসঙ্গে আর কোথাও পাওয়া যাবে? যাবে না। একই সঙ্গে সবাইকে মেরে ফেললে ফিলিস্তিনিদের হয়ে আগামী বিশ বছর কথা বলবার মত আর কেউ থাকবে দেশে? না। ওই হত্যাকাণ্ডে ইজরাইলকে কেউ দায়ী করতে পারবে? না। হত্যাকাণ্ডের পরপরই রটিয়ে দেয়া হবে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে আরাফাত বিরোধী উগ্রপন্থীরা আরাফাতসহ ফিলিস্তিনিদের সমস্ত নেতাকে পাইকারি ভাবে খুন করে পালিয়ে গেছে। ইজরাইল সরকার এই মর্মান্তিক ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে, শোক প্রকাশ করে বলবে, হত্যাকারী হিযবুল্লাহ ও হামাস সদস্যদের ধরার জন্যে গাজা ও পশ্চিম তীরে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে তারা, আশা করছে সময় লাগলেও এক এক করে সবাইকেই ধরা পড়তে হবে। পড়বেও ধরা–নির্দোষ হামাস ও হিযবুল্লাহ্ সদস্যরা, যারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানত না।

যত বড় বা ভয়াবহই হোক, ষড়যন্ত্রের কথাটা আগেই যখন জানা গেছে, সেটাকে বানচাল করা ফিলিস্তিনি পুলিস ও ইন্টেরিজেন্সের জন্যে খুব একটা কঠিন কাজ অবশ্যই নয়, তাই না? রানার এই প্রশ্নের উত্তরে আরও মারাত্মক একটা দুঃসংবাদ দিলেন ইয়াসির আরাফাত।

হ্যাঁ, শ্যারনের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের আছে। ডাক দিলে বারো ঘণ্টার মধ্যে পাঁচশো কেন, কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি হিউম্যান-বম্ চলে আসবে। কিন্তু সমস্যা অন্য খানে। ছদ্মবেশ নিয়ে যে মোসাদ সদস্যরা নেতাদের খুন করতে আসবে তাদেরকে ঠেকাবার মত অস্ত্র ফিলিস্তিনিদের হাতে নেই। অস্ত্রের ভাণ্ডার এক কথায় শূন্য।

'সেকি!' রানার প্রায় আঁতকে ওঠার অবস্থা। 'এ আপনি কি বলছেন? হিযবুল্লাহ, হামাস, ফিলিস্তিনি সিক্রেট পুলিস, আপনার বডিগার্ড রেজিমেন্ট– এরা সবাই নিরস্ত্র?'

আরাফাত বললেন, 'এটাই আসল সমস্যা বা বিপদ। তোমার হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু তাতে গুলি নেই, সেক্ষেত্রে বাড়িতে ডাকাত ঢুকলে ওই বন্দুক তোমার কি কাজে লাগবে?'

'তারমানে আপনাদের গোলা-বারুদে টান পড়েছে?'

'পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল,' ইয়াসির আরাফাত ধীরে ধীরে ব্যাখা করলেন। সারা দুনিয়ার মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র ও মুসলিম ব্যবসায়ীরা সরাসরি তাঁর বিদেশী অ্যাকাউন্টে চাঁদা, সাহায্য, দান ইত্যাদি হিসেবে যে টাকা দেন তার সবই অস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনতে ব্যবহার করা হয়। গত চার মাস আগের ঘটনা, তাঁর বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা ছিল প্রায় দেড়শো কোটি ডলার। এ থেকে গত তিন মাসে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনা হয়েছে একশো বিশ কোটি ডলারের। কিন্তু ভয়ংকর দুঃসংবাদটা হলো, এক টাকার অস্ত্র বা গোলা-বারুদও পশ্চিম তীর, রামাল্লা বা প্যালেস্টাইনের কোথাও পৌঁছায়নি।

কেন?

গত দু'বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের অস্ত্র আসছে জর্দান সীমান্ত পার হয়ে। এতদিন মরুভূমি আর পাথুরে গিরিখাদের ভেতর দিয়ে প্রতিটি চালান ঠিকমতই পৌঁছেছে, বিভিন্ন রুট ব্যবহার করায় ইজরাইলি সীমান্ত রক্ষীদের চোখে একবারও ধরা পড়েনি। কিন্তু গত তিন মাসে ছ'টা চালানই ধরা পড়ে গেছে। প্রথম চালানটা ধরা পড়ার পর ফিলিস্তিনি হাই কমান্ড, ইন্টেলিজেন্স, সিক্রেট পুলিস, সবাই খুব সাবধান হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট লোকজনদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা জানার জন্যে। বদল করা হয় আর্মস্ ডিলার। একেবারে শেষ মুহূর্তে রুট বদলানো হয়েছে। মোটকথা সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন লাভ হয়নি, একে একে প্রতিটি চালান সীমান্তেই ইজরাইলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এখন প্রায় নিশ্চিত, বিশ্বাসঘাতক একজন না থেকে পারে না। সে নিজেদের কেউ একজনও হতে পারে, বিপুল টাকার লোভে মাতৃভূমির সঙ্গে বেঈমানী করছে। আবার মোসাদের কোন এজেন্টও হতে পারে—হয়তো স্লীপার, বহুদিন ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকায় নিজেদের একজন বলে ভাবা হয় তাকে। তবে আরাফাত মহোদয়ের বিশ্বাস, এখানে একটা গ্রুপ কাজ করছে, একা কারও পক্ষে বারবার এই সর্বনাশ করা সম্ভব নয়। চালান যারা আনতে যায়, অন্তত তিনবার তাদের সবাইকে বদলানো হয়েছে—ফল সেই এক, প্রতিবারই ধরা পড়ে গেছে চালান।

রানা জানতে চাইল—চালান ধরা পড়ে, কিন্তু চালানের সঙ্গে লোকগুলো? আরাফাত জানালেন, তাদের কিছু মারা যায়, কিছু আহত হয়, কিছু ধরা পড়ে, কিছু জান বাঁচিয়ে পালিয়েও আসতে পারে। পালিয়ে আসাদের ওপরই সন্দেহটা জাগে, তাই পরবর্তী চালান আনতে তাদেরকে আর পাঠানো হয় না। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি।

রানা প্রশ্ন করল, 'আপনাদের অস্ত্র কাকে দিয়ে কেনা হয়?'

ওর প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পেরে মাথা নাড়লেন আরাফাত। 'তাকে আমি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে গণ্য করি। বলা যায় আমার সামনে জন্মেছে। বাবা যুদ্ধে মারা যায় সেই ছোটবেলায়, সেই থেকে আমাকে যে শুধু বাবা বলে, তাই নয়, আমার পরিবারের একজন হয়েই বড় হয়েছে। তার নাম শারিয়া—শাতিল শারিয়া।'

প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে মডার্ন আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছে শারিয়া, কিন্তু পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে সাংবাদিকতা; আর তার হবি-র তালিকায় আছে বেছে বেছে দুর্গম পাহাড়ে চড়া, শূটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, ঘোড়া ছোটানো, আন-আর্মড কমব্যাট শেখানোর স্কুলে বিনা বেতনে সময় দেয়া ইত্যাদি। জর্দানের একটা সামরিক ক্যাম্পে সামরিক ট্রেনিংও নেয়া আছে তার, গোপনে ইয়াসির আরাফাতের একজন উপদেষ্টাও বটে। চাকরিটা রোমের একটা পত্রিকায়, ওখানেই তাকে থাকতে হয়। রোম হলো চোরাই অস্ত্রের আন্তর্জাতিক ডিলারদের স্বর্গ, জার্নালিস্ট শারিয়ার পক্ষে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও দরদাম ঠিক করা কোন সমস্যা নয়। লুঁয়ে জাদিব নামে একজন ফরাসি মুসলমানকে ভালবাসে সে। আগামী বছর বিয়ে করবে ওরা, দিন-তারিখ ঠিক হয়ে আছে। জাদিবও রোমে কাজ করে, সে একজন ফ্রী-লান্স ফটো-জার্নালিস্ট।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'জাদিব নামে এক তরুণ ফ্রান্সের বিভিন্ন পত্রিকায় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে লেখালেখি করে বেশ নাম করেছে, সে কি এই ছেলেটাই?'

'হ্যাঁ, জাদিব লেখেও খুব ভাল।' আরাফাত হাসছেন। 'প্যালেস্টাইনের ওপর যে-কোন লেখা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রথমে আমার কাছে পাঠায় ও, আমি অনুমতি দিলে তারপর কোথাও ছাপতে দেয়। ওর মত ভাল ছেলে সত্যি হয় না, বেঁচে

থাকলে আমাদের শারিয়ার সংসার খুবই সুখের হবে।'

'বেঁচে থাকলে? আপনার এ-কথার অর্থ?'

মেজবান ভদ্রলোক আবার কফি পরিবেশন করলেন। 'এবার ব্যাখ্যা করতে হয় কেন বিসিআই-এর সাহায্য চেয়েছি। তার আগে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে নিই।'

ছয়-ছয়টা চালান ধরা পড়ে গেছে, ফলে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ তো নেই-ই, টাকাও কমে মাত্র ত্রিশ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। এই অবস্থায় রোম থেকে শারিয়াকে রামাল্লায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আরাফাত একা তার সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করেন। বিশ কোটি ডলার খরচ করে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের আরও একটা চালান সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে তাকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, জর্দানের যবর-এ-জালিম গিরিখাদে আবাবিল ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির আঠারোটা ট্রাক অপেক্ষা করবে। প্রতিটি আনমার্কড্ ট্রাক খালি।

আনমার্কড্ শব্দটা মনে গেঁথে রাখল রানা।

এই কনভয় কোন্ পথ ধরে কোথায় যাবে তা কাউকে জানানো হবে না, একা শুধু শারিয়া জানবে।

রামাল্লায় বসে ই-মেইলের সাহায্যে রোমের একজন আর্মস ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে শারিয়া, বলাই বাহুল্য যে, সাংকেতিক ভাষায়। এই ডিলার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। অবশ্য বিশ্বস্ত না হলেও কিছু আসে যায় না, কারণ যবর-এ-জালিম গিরিপথ থেকে আরও অন্তত বিশটা গিরিপথে যাওয়া যায়, ওগুলোর প্রায় প্রতিটি ধরে ইজরাইলে ঢোকা সম্ভব। ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমা হামলার ভয়ে ইহুদি সৈন্যরা শহরে টহল জোরদার করেছে, ফলে সীমান্ত চৌকিগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল এখন কম। দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ওপর দিয়ে রোজ একশো-দুশো ট্রাক আসা-যাওয়া করলেও তারা টের পাবে না, যদি না কেউ তাদেরকে আগে থেকে কিছু জানিয়ে রাখে। সংশ্লিষ্ট আর্মস ডিলার

বিশ্বস্ত হলেও তাকে শারিয়া জানাবে না কোন্ গিরিপথের ভেতর দিয়ে ইজরাইলে ঢুকবে ট্রাকের বহর। তার কাজ শারিয়া ও জাদিরের বলে দেয়া পরিবহন কোম্পানির ট্রাক নিয়ে যবর-এ-জালিম গিরিপথে পৌঁছানো ও কার্গো হস্তান্তর। ট্রাকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ তোলা হয়ে গেলে রোমে ফিরে যাবে সে। রানার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে আরাফাত জানালেন—হ্যাঁ, প্রতিবার একই কোম্পানির ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এর আগেও আলোচ্য আর্মস ডিলার সহ অন্যান্যরাও এই পদ্ধতিতে কার্গো ডেলিভারি দিয়েছে।

যাই হোক, আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে এই নতুন আর্মস ডিলার—একজন গ্রীক, নাম নিকোলাস পাপান্ড্রুলা—তার ট্রাক বহর নিয়ে যবর-এ-জালিম গিরিপথে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে রামাল্লা থেকে শারিয়াও রওনা হয়ে গেছে। কার্গো বুঝে নিয়ে ওখানেই তাকে বিশ কোটি ডলারের চেকটা দেয়া হবে।

'কিন্তু আপনি তার বেঁচে থাকা না থাকার কথা বলছিলেন,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'হ্যাঁ, সে প্রসঙ্গেই তো আসছি।' শুধু উদ্বিগ্ন নয়, হঠাৎ রীতিমত কাতর দেখাল আরব জাহানের আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও ফিলিস্তিন জাতির অভিভাবককে। 'শারিয়ার রওনা হবার আট ঘণ্টা পর, আজ সকালে আরেকটা গোপন মেসেজ পাই আমি সেই লোকের কাছ থেকে...'

'আপনার এজেন্ট, যে মোসাদে আছে?'

'হ্যাঁ। সে মেসেজ পাঠিয়েছে, মোসাদ জানে শারিয়া কি উদ্দেশে কোথায় যাচ্ছে এবং পথে কোথাও তাকে খুন করা হবে।'

'ওহ্, নো!' রানা বিচলিত হয়ে পড়ল। 'শারিয়াকে সাবধান করে দিয়েছেন?'

ম্লান মুখে মাথা নাড়লেন আরাফাত। 'সে এখন কোথায় তাই

তো আমি জানি না। নিরাপত্তার কথা ভেবেই কাউকে জানতে দেয়নি কোন পথ ধরে জর্দানে পৌঁছাবে সে। তার সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগই নেই। এদিকে ইজরাইলি রেডিও ঘোষণা করেছে, হিযবুল্লাহ্ তরুণরা পাঁচজন বসতি স্থাপনকারী ইহুদি আর তাদের এক মহিলা সৈন্যকে কিডন্যাপ করায় শ্যারন প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিয়েছে।'

'শারিয়ার সঙ্গে আর কে আছে?' জানতে চাইল রানা। 'তার প্রেমিক, লুঁয়ে জাদিব?'

'শারিয়া একাই রওনা হয়েছে, তবে পথের কোথাও থেকে একটা দল তার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। জাদিব? সে রোমে নিজের কাজে ব্যস্ত। তবে সময় করতে পারলে আমরা তাকে যবর-এ-জালিমে আসতে বলে দিয়েছি। দোভাষী হিসেবে তাকে প্রয়োজন হবে শারিয়ার। পাপান্ডুলা গ্রীক ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ,' জানি, তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

'গুড। তাহলে তো ভালই হলো...'

'কিন্তু শারিয়াকে খুন করা হতে পারে, এটা তো আপনি আজ জেনেছেন,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'বিসিআই-এর সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সেটার কোন সম্পর্ক নেই, তাই না?'

'তুমি এবার জানতে চাইছ তোমার কাছ থেকে কি সাহায্য চাইব আমরা।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'আমাদের অস্ত্র ও গোলা-বারুদ নেই,' বললেন আরাফাত। 'এই চালানটা ধরা পড়ে গেলে কেনাকাটা করার সময় বা টাকা, কোনটাই আর থাকবে না। বুশ ও ব্লেয়ার আর সম্ভবত এক হপ্তার মধ্যে ইরাক আক্রমণ করবে। তারমানে আমাদের আয়ু খুব বেশি হলে আর দশদিন।'

'আপনি আমাকে চালানটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলছেন? এবং ওই অস্ত্র আর গোলা-বারুদ পেলে আপনাদের পক্ষে ইজরাইলি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব?'

'হ্যাঁ।'

স্টাডিরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। দু'মিনিট কারও মুখে কথা নেই।

'আগেই বলেছি, কাজটা এত কঠিন যে অসম্ভবই বলা যায়, নিস্তব্ধতা ভাঙলেন আরাফাত। 'একা কাউকে কোন জাদু দেখাতে বলাটা নেহাতই হাস্যকর, অন্যায়ও। কিন্তু এরকম একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একজন অসহায় মানুষ মিরাকল ছাড়া আর কি-ই বা আশা করতে পারে, বলো?'

'কতটুকু কি পারব ভবিষ্যৎই বলতে পারে,' বলল রানা। 'তবে কোন কাজকেই আমরা অসম্ভব বলে মনে করি না।' মুখে কিছু না বললেও, রানা লক্ষ করল ইয়াসির আরাফাতের পেশীতে ঢিল পড়ল। 'মিস্টার আরাফাত, এবার আমার প্ল্যানটা বলি আপনাকে।'

'ইয়েস, অফকোর্স!'

'তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন। চালানটা কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?'

'যরর-এ-জালিম, জর্দানে, জর্দান-ইজরাইলি সীমান্ত থেকে বিশ মাইল ভেতরে,' বললেন আরাফাত। 'যে-কোন পথ দিয়েই কনভয় আসুক না কেন, সীমান্ত পার হয়ে আরও বিশ মাইল ভেতরে ঢোকার পর শুরু হবে ফিলিস্তিনিদের ছোট ছোট গ্রাম। এরকম কয়েকটা গ্রামে ট্রাক থেকে মাল খালাস করা হয়। কার্গোগুলো ভাগ করে এমন ভাবে প্যাক্ করা হয়, বেদুইনদের মাল-সামানের ভেতর লুকিয়ে রাখা যায়, লুকিয়ে রাখা যায় বরযাত্রীদের বাক্সপেটরার ভেতর। এটাই আমাদের সাপ্লাই লাইন—অল্প অল্প করে পশ্চিম তীরে চলে আসে। মোটকথা

ট্রাকগুলোকে যে-কোন ফিলিস্তিনি গ্রামে পৌঁছে দিলেই হবে, গ্রামবাসীরা জানে কিভাবে ওগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়।'

'এই কনভয়টার সঙ্গে কতজন লোক আছে আপনাদের?'

'তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেয়া একটু কঠিন। সীমান্তের দু'দিকেই কয়েকডজন ট্রাইব-এর বসবাস। তাদের সাহায্য ছাড়া চোরাচালান সম্ভব নয়। তবে ওরা সবাই যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করে, কখনও কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। জর্দানে আমাদেরকে সাহায্য করে চার-পাঁচটা ট্রাইবের হেডম্যান, তাদের অধীনে থাকে এই ধরো ত্রিশজন সশস্ত্র লোক।'

'আমি জানতে চাইছি কনভয়ের সঙ্গে সীমান্ত পেরোয় কতজন।'

'সঙ্গ না চাইলেও কিছু জর্দানি থাকে, এই সুযোগে নিজেদের কিছু মালপত্র ইজরাইলে চোরাচালান করে তারা। তবে বেশি না, দশজন হবে। আর সীমান্তের এপারের ট্রাইবাল হেডম্যান কনভয়ের সঙ্গে থাকে তিন থেকে পাঁচজন—সব মিলিয়ে তাদের লোক সংখ্যা একশোর মত। এদের সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই আমরা অস্ত্র আনতে পারব না।'

'হামাস বা হিযবুল্লাহ্‌র কেউ থাকে না?'

'থাকে না মানে! হামাস সদস্যরাই তো কনভয়টা চালিয়ে আনে। হিযবুল্লাহ্‌রা কোথাও লুকিয়ে থাকে, প্রয়োজনে সাহায্য করতে বেরোয়।'

'কত বড় কনভয়?' জানতে চাইল রানা। 'মোট ক'টা ট্রাক?'

'এর আগে প্রতিবার ত্রিশটা করে ট্রাক ধরা পড়েছে,' বললেন আরাফাত, তাঁর চেহারায় অসহায়ত্ব ও বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। 'এবারে কনভয়টা স্বভাবতই ছোট হবে। যবর-এ-জালিমে আঠারোটা ট্রাক অপেক্ষা করছে।'

চোখ বুজে দুই মিনিট চুপচাপ বসে থাকল রানা। অপেক্ষা করছেন আরাফাত।

'গোটা আয়োজনে আমি কিছু পরিবর্তন আনতে চাই,' চোখ খুলল রানা, যতটা সম্ভব রেখে-ঢেকে নিজের প্ল্যান ব্যাখ্যা করছে। 'যেভাবেই হোক, পাপাডুলাকে খবর পাঠান তাকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের যে অর্ডারটা দেয়া হয়েছে, সেটা বাতিল করা হলো। আমার নাম না জানিয়ে তাকে বলবেন, নতুন অর্ডার দেয়ার জন্যে রোমে লোক পাঠাচ্ছেন আপনি। সম্ভব?'

আরাফাত নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন।

'ট্রাক ড্রাইভার হামাস সদস্যদের খবর পাঠান, তারা শুধু আমার নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবে,' বলল রানা। 'আর আমি যদি বলি কনভয় নিয়ে উল্টোদিকে ছোটো, কিংবা বলি ইজরাইলি ক্যান্টনমেন্ট বা গ্যারিসনের দিকে এগোও, বিনা তর্কে আমার সেই নির্দেশও মেনে নিতে হবে ওদেরকে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে এবারও মাথা ঝাঁকালেন আরাফাত।

'এই অপারেশনে আমার এজেন্সির ত্রিশ থেকে চল্লিশজন অপারেটর অংশ নেবে, কেউ কোনও আপত্তি তুলতে পারবে না। আরেকটা কথা, আমি শুধু পাপাডুলার কাছ থেকে না, অন্যান্য ডিলারদের কাছ থেকেও অস্ত্র কিনব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলেন আরাফাত।

'আর্মস-অ্যামিউনিশন কেনার বাজেট আরেকটু বাড়াতে হবে আপনাকে, মিস্টার আরাফাত,' বলল রানা। 'অন্তত আরও তিন কোটি ডলার যদি বাড়াতে পারেন, আপনাকে আমি এমন একটা খবর উপহার দেয়ার চেষ্টা করব, যার ফলে ছয়-ছয়টা চালান হারাবার কষ্ট অর্ধেকের বেশি হালকা হয়ে যাবে আপনার।'

'এতবড় খোশখবর?' কৌতুক ও কৌতূহলে ইয়াসির আরাফাতের চোখ দুটো চিকচিক করছে। 'জানতে পারি, কি সেই সুখবর?'

রানা হেসে উঠে বলল, 'চেষ্টা করব বলেছি।'

দু'হাত ওপরে তুললেন আরাফাত। 'ওকে। আর কিছু?'

'এবার শারিয়া প্রসঙ্গ,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ নেই। কিন্তু লুঁয়ে জাদিবকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার সঙ্গে শারিয়ার যোগাযোগ আছে কিনা?'

'আমি নিজে ইন্টারনেটে জাদিব বাবাজীর সঙ্গে আলাপ করেছি,' বললেন আরাফাত। 'বিশেষ সাঙ্কেতিক ভাষায়। শারিয়ার বিপদ শুনে যবর-এ-জালিমের উদ্দেশে রোম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। আমাকে বলল শারিয়ার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগযোগ ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কল করে শারিয়াকে সে পাচ্ছে না।'

'এমন হতে পারে,' বলল রানা, 'শারিয়া হয়তো সাবধানের মার নেই ভেবে নিজের মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে।' একথা আর বলল না যে ইতোমধ্যে সে মারাও গিয়ে থাকতে পারে। 'ভাল কথা, ওর মোবাইল নম্বরটা কি আপনার জানা আছে? কিংবা জাদিবের?'

ডেস্ক থেকে কলম তুলে একটা কাগজে শাতিল শারিয়া আর লুঁয়ে জাদিবের মোবাইল নম্বর লিখে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন আরাফাত। 'শারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে একটা কোড উচ্চারণ কোরো—লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। ও তাহলে বুঝতে পারবে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করছ।'

'পাপাডুলাকে দেয়ার জন্যে শারিয়া যে চেক নিয়ে গেছে সেটা নিশ্চয়ই ক্রস করা, শুধু পাপাডুলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেয়া যাবে?' ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন আরাফাত।

'আপনি আপনার ব্যাংককে ই-মেইলে জানিয়ে দেবেন ওই চেকটা বাতিল করা হলো,' বলল রানা। 'এখন আমাকে একটা চেক দিন—তেইশ কোটি ডলারের।'

কোন প্রশ্ন না, রানার দিকে চোখ তুলে তাকানো পর্যন্ত নয়, দেরাজ খুলে চেক বই বের করে দ্রুত হাতে খসখস করে চেকটা

লিখে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন আরাফাত।

ঢোলা জোব্বার গোপন একটা পকেটে ভাঁজ করা চেকটা ঢুকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'এবার আমাকে জানান, আপনার সদর দফতর থেকে আমি বেরুব কিভাবে।'

আরাফাতও তাঁর আসন ত্যাগ করলেন। 'আমার সঙ্গে এসো, পথটা দেখিয়ে দিই।' এগিয়ে এসে রানাকে আবার তিনি নিজের বুকে টেনে নিলেন।

তিন

রোম থেকে আম্মান হয়ে যবর-এ-জালিম। পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, তবে শুনেছে যে সীমান্তের বিশ মাইল ভেতর দিকে এই জায়গা দুর্গম একটা গিরিপথ, যথেষ্ট চওড়া, এক থেকে দেড়শো ট্রাক অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যাবে, হেলিকপ্টার বা ড্রোন প্লেন নিয়ে খুঁজলেও কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু পৌঁছাবার পর রানা রীতিমত বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

গিরিপথের ভেতর জমজমাট বাজার বসেছে, লম্বায় সেটা এক মাইলের কম নয়, চওড়ায় আধ-মাইলের কিছু বেশি। একটা ম্যাপ কেনার পর ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো, যবর-এ-জালিম আসলে কয়েকটা গিরিপথের সমষ্টি—খুব বড় একটার ভেতর অনেকগুলো ছোট। চলে গোপন ও চোরাই কারবারের জমজমাট ব্যবসা; তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না, যেহেতু চারটে দেশের সীমান্ত থেকে জায়গাটা একদম কাছে, এই অবৈধ ব্যবসার প্রতি মৌন সমর্থন আছে সংশ্লিষ্ট

প্রতিটি দেশের।

বাজার বসিয়েছে জর্দানি, সৌদি, মিশরীয়, আরব ও ফিলিস্তিনিরা। এই একই পরিচয় খদ্দেরদেরও। তবে সবাই তারা হয় মুসলমান নয়তো খ্রিস্টান, এখানে কোন ইহুদিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইহুদিরা আসে না ভয়ে। গায়ের জোরে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্যালেস্টাইন দখল করার পর সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া নিজেদের সুরক্ষিত এলাকার বাইরে ভুলেও তারা বেরোয় না। তবে এরকম একটা গুজব প্রচলিত আছে যে নিজেরা আসতে না পারলেও ইজরাইল ছাড়া বাকি তিন দেশের ইহুদি ব্যবসায়ীরা যবর-এ-জালিমের চোরা-কারবারে মোটা অঙ্কের পুঁজি খাটায়। এ গুজব সত্যি হবারই সম্ভাবনা বেশি, কারণ শত সহস্র বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইহুদিরা কৌশলী ব্যবসায়ী হিসেবে দুনিয়ার সেরা, লাভ করার ব্যাপারে তাদের নির্লজ্জতা যে-কোন বেশ্যাকেও হার মানায়।

যবর-এ-জালিমে উটের পিঠে বোঝাই হয়ে আসে সিরামিক, সিল্ক, সোনা থেকে শুরু করে আফিম, গাঁজা, হেরোইন, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ইত্যাদি আরও কয়েকশো ধরনের পণ্য। এ-সব এখানে প্রকাশ্যেই বেচা-কেনা চলে, গোপনে চলে শুধু অস্ত্রের ব্যবসা। অস্ত্র আনা হয় অন্যান্য মালামালের নিচে লুকিয়ে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্মল আর্মস, হ্যান্ডগ্রেনেড, রাইফেল ও বিভিন্ন আকৃতির ছোরার চাহিদাই বেশি। খেজুরের বস্তার ভেতরে করে বাক্সভর্তি গ্রেনেড পাচার হচ্ছে, রাইফেল বিক্রি হচ্ছে ভাঁজ করা সিল্ক বা কার্পেটের সঙ্গে। এ-সব বিপজ্জনক পণ্য কিনতে হলে অবশ্যই একজন দালাল ধরতে হবে, তা না হলে দিনের পর দিন ঘুরে মরলেও জানা যাবে না কোথায় বা কারা এ-সব বিক্রি করছে। ক্রেতার জন্যে দালাল যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি কেউ যদি প্রথমবার যবর-এ-জালিমে আসতে চায় তার জন্যে দরকার একজন গাইড। রানার এখানে প্রথম আসা কাজেই ওরও

একজন গাইড দরকার। বিসিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদ, রানার ঘনিষ্ঠতম ও প্রাণপ্রিয় বন্ধু, খবর-এ-জালিমে দু'দিন আগেই পৌঁছেছে, কিন্তু দেখা হলেও পরস্পরকে চিনতে না পারার সিদ্ধান্ত হওয়ায় রানা তাকে খুঁজছে না। তবে স্যাটেলাইট ফোনটা অন করে রেখেছে ও।

অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার হলেও, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে নিকোলাস পাপাডুলা তার ব্যবসায়িক আচরণের সুনাম বজায় রাখার জন্যে যথাসাধ্য সৎ থাকার চেষ্টা করে। রোমে দেখা হতে তাকে ওর একটা প্রয়োজনের কথা জানায় ও। পাপাডুলার মত সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোকও কথাটা শুনে দু'সেকেন্ডের জন্যে হাঁ করে তাকিয়েছিল। 'কথাটা আরেকবার বলবেন, মিস্টার রানা, প্লীজ?'

'আমার এমন একজন গাইড দরকার যে পেটে কথা রাখতে পারে না,' বলল রানা। 'এরকম কোন লোককে তুমি চেনো?'

মাথা চুলকে চিন্তা করল পাপাডুলা, তারপর রানার বক্তব্য ঠিকঠাক বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে বলল, 'আমি বহু ভদ্রলোককে চিনি, যারা সব সময় সৎ একজন গাইড খোঁজেন—এমন একজন লোক যে টাকা খেয়ে ক্লায়েন্টের গোপন তথ্য অন্য কোন পক্ষকে জানিয়ে দেবে না। আপনি তাদের মত কোন গাইড খুঁজছেন না।'

'না।'

'না,' পুনরাবৃত্তি করল পাপাডুলা, নোটবুক খুলে পাতা ওল্টাচ্ছে। 'তাহলে ওবায়েদ খালিদ। আপনি এই লোককেই খুঁজছেন। এর এত সাহস নেই যে আপনার পিঠে ছুরি মারবে, আবার কোন তথ্য পেলে যার-তার কাছে দু'একশো টাকায় বেচে দিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। লোকটা একটু তরল প্রকৃতির। কিন্তু আমার ভুল হচ্ছে না তো, মিস্টার রানা? আমার বা আপনার? এরকম একজন লোক সত্যি আপনার দরকার?'

'দরকার,' বলল রানা, পাপাড়ুলার বাড়ানো হাত থেকে ওবায়েদ খালিদের ঠিকানা লেখা কাগজটা টেনে নিল। 'গাইড হিসেবে কেমন সে? আর তরল প্রকৃতির মানে কি?'

'গাইড হিসেবে খালিদ মন্দ নয়। তবে,' মাথা চুলকে পাপাড়ুলা বলল, 'একটু পাগলাটে আর কি, কোন ব্যক্তিত্ব নেই।'

'যবর-এ-জালিমে দেখা হবে,' বলে দশ মিনিট পর বিদায় নিল রানা।

রোম থেকে আম্মান হয়ে যবর-এ-জালিমে পৌঁছাল ও, ঠিকানা ধরে এক সরাইখানায় ঢুকে খোঁজ করতেই পাওয়া গেল ওবায়েদ খালিদকে। পাপাড়ুলা ফোনে তার সঙ্গে আগেই কথা বলেছে, বিনয় ও সমীহের সঙ্গে রানাকে রীতিমত স্যালুট করে অভ্যর্থনা জানাল সে।

রানাকে বলা হলো, যবর-এ-জালিমে বাজার আসলে দুটো। এক মাইল লম্বা প্রথমটা খুচরো বাজার। দ্বিতীয়টা পাইকারি। প্রথম বাজারটার কথা ওকে আসলে আগে কেউ বলেইনি। পাইকারি বাজারের পরিধি বিশাল। পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে কর্কশ পাথুরে পাহাড়ের জঙ্গলই বলা চলে জায়গাটাকে। পাহাড়ের কারনিস, সেটাই মূল পথ, কখনও ওপরে উঠেছে, ডিঙিয়ে গেছে পাহাড়ের কোন চূড়া বা কাঁধকে; আবার কখনও নিচে নেমে খরস্রোতা কোন নালার পাশ দিয়ে এগিয়েছে, কিংবা ঢুকে পড়েছে প্রকৃতিরই তৈরি কোন টানেলের ভেতর, বেরিয়েছে হয়তো নতুন কোন গিরিপথে। এরকম পথ একটা নয়, বহু। এগুলো ধরে শম্বুকগতিতে এগোয় বিভিন্ন পণ্য ভর্তি ট্রাক বহর আর অস্ত্র চোরাচালানীদের কনভয়। জর্দান, সৌদি আরব, মিশর ও ইজরাইল, পথগুলো এই চার দেশের সীমান্ত পার হয়েছে, তবে গিরিপথ থেকে বেরিয়ে ফাঁকা মরুভূমি পেরুবার পর।

খালিদকে রানা বলল, দ্বিতীয় অর্থাৎ পাইকারি বাজারে যাবে ও, বেডফোর্ড কোম্পানির ঝকড় মার্কা আঠারোটা ট্রাকের একটা

বহরের কাছে।

'শুধু সংখ্যা বললে ট্রাকগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন,' বলল খালিদ। 'আপনাকে বলতে হবে ওগুলো যাবে কোথায়।'

'কেন?' রানার চোখে সন্দেহ।

'প্রতিটি দেশের জন্যে আলাদা আলাদা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে,' বলল খালিদ। 'আপনি কোন দেশে মাল পাঠাচ্ছেন তা না জানালে হবে কি করে?'

'স্টার্টিং পয়েন্ট ক'টা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রতিটি দেশের জন্যে কয়েকটা করে। একটার সঙ্গে আরেকটা স্টার্টিং পয়েন্টের দূরত্ব পাঁচ থেকে সাত মাইল।'

অগত্যা যেন বাধ্য হয়ে ট্রাক বহরের গন্তব্য জানাতে হলো খালিদকে। 'ইজরাইল,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'ইজরাইলে যাবার স্টার্টিং পয়েন্ট সাতটা।'

'সাতটা?' চোখ বড় বড় করল রানা, যেন জানে না। 'আর ফিনিশিং পয়েন্ট?'

'পনেরোটা কঠিন পথ, দুটো মারাত্মক কঠিন—সব মিলিয়ে সতেরোটা পথ,' বলল খালিদ। 'পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব পাঁচ থেকে সাত মাইলের মধ্যে। আপনার ট্রাক বহরের খোঁজে সবগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে যেতে হতে পারে। তাতে অন্তত দিন পনেরো সময় লাগবে।'

রানা বিরক্ত। 'ওগুলোকে খুঁজে বের করার সহজ কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।'

'আছে বৈকি। যে পরিবহন কোম্পানি থেকে ওগুলো ভাড়া করা হয়েছে সেটার নাম বলুন।'

'বললাম। তারপর?'

'প্রতিটি ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির লোক আছে নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে,' বলল খালিদ। 'ক্লায়েন্টদের সবরকমের সাহায্য করাই তাদের কাজ।'

'পরিবহন কোম্পানির নাম আবাবিল,' বলল রানা। ইয়াসির আরাফাতের উচ্চারণ করা 'আলমার্কড্' শব্দটা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

'আবাবিল ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানি নিশ্চয়ই আপনাকে একটা কোড দিয়েছে?'

'দিয়েছে।' কোডটা লুঁয়ে জাদিবকে ফোন করে জেনে নিয়েছে রানা।

'তাহলে আর কোন সমস্যা নেই।' সরু মুখের টান-টান চামড়ায় সূক্ষ্ম কয়েকশো ভাঁজ ফেলে হাসল খালিদ। 'চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

ভাড়া করা দুটো গাধায় চড়ল ওরা। আরেকটার পিঠে রানার লাগেজ চাপানো হলো, টেনে নিয়ে যাচ্ছে গাধাগুলোর মালিক। সরু পাথুরে কারনিস ধরে ঘণ্টাদেড়েক এগোবার পর মোটাসোটা নিরব লোকটাকে যথেষ্ট পিছনে থাকার নির্দেশ দিল খালিদ, ওদের কথা সে যাতে শুনতে না পায়। তারপর রানাকে বলল, 'এই জর্দানিরা খুব গরিব হয় তো, সব সময় এর কথা তাকে বলে দু'পয়সা কামাবার তালে থাকে।'

'বলো কি!' রানাকে শঙ্কিত দেখাল।

'তবে নিশ্চিত থাকেন, আমি যতক্ষণ আপনার সঙ্গে আছি, ওকে বা আর কাউকে আপনার ছায়াও মাড়াতে দেব না,' দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বস্ত করল খালিদ।

'তবে সাবধান,' হেসে উঠে বলল রানা, 'পাপাড়ুলাকে আবার বাধা দিতে যেয়ো না। তার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ আছে।'

ছুঁচোর মত সরু মুখটা অভিমানে ঝুলে পড়ল। 'আমাকে আপনি দয়া করে পাগল-ছাগল ভাববেন না, জনাব,' বলল খালিদ। 'পাপাড়ুলার মত বড় মাপের একজন সওদাগর আমার হয়ে সুপারিশ করেছেন বলেই না আপনি আমাকে গাইড হিসেবে নিলেন। তাঁকে আমি কিভাবে অপমান করতে পারি! তা তিনিও

তাহলে যবর-এ-জালিমে আসছেন?' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল গাধার মালিক যথেষ্ট দূরে কিনা। খরস্রোতা একটা নালার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে গাধাগুলো।

'আমার তো আস্মানে যথেষ্ট দেরি হয়েছে,' বলল রানা। 'কাজেই আশা করছি পাপাভুলা আমার আগেই ট্রাক বহরের কাছে পৌঁছে গেছে।'

ভুরু কোঁচকাল খালিদ। 'উনি যবর-এ-জালিমে এসেছেন, অথচ আমি জানলাম না! তাহলে হয়তো কপ্টার নিয়ে এসেছেন। খুচরো বাজারটাকে এড়িয়ে সরাসরি জায়গা মত পৌঁছে গেছেন।'

'বোধহয়,' বলল রানা।

খালিদকে উৎসুক দেখাচ্ছে। 'কিন্তু উনি তো রোমে বসেই ব্যবসা করেন। এখানে কোথাও তাঁর গোডাউন আছে, সেখান থেকে খদ্দেরকে মাল সাপ্লাই দেয়া হয়। এবার নিজে আসছেন কেন?'

'নিজে আসছে, কারণ আমি তাকে শর্ত দিয়েছি চালানগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।'

'চালানগুলো?' প্রশ্নটা করেই খালিদ বুঝতে পারল বেশি কৌতূহল দেখানো হয়ে যাচ্ছে। 'প্লীজ, কিছু মনে করবেন না। তবে সত্যি আমি অবাক হয়েছি।'

'কেন?'

'একটা চালান মানেই তো কোটি কোটি ডলারের ব্যাপার...'

'উপায় নেই,' তার কথার মাঝখানে বলল রানা, 'বাধ্য হয়ে দুটো চালানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে।'

তথ্যটা হজম করার জন্যেই কিনা, কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলল না গাইড। চড়াই বেয়ে উঠতে হচ্ছে গাধাগুলোকে, গতি খুব মন্থর। একটা চওড়া কারনিসের দিকে উঠছে ওরা। যে নালাটার পাশ থেকে ওদেরকে নিয়ে সরে এসেছে গাধাগুলো, সেটাও প্রশস্ত একটা কারনিস ধরে কিছুদূর এগোবার পর কিনারা থেকে লাফ

দিয়ে জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি একের পর এক শুধু পাহাড় আর পাহাড়। খাদ এখানে অগুনতি। 'বুঝেছি,' অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করল খালিদ।

'মানে?' বিস্মিত হবার ভান করল রানা।

'ইজরাইল সীমান্ত পেরুবে যখন, চালান দুটোয় অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের জন্যে আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন আছে। গত তিন মাস ধরে হামাস আর হিযবুল্লাহ্ ভায়েরা কোন অস্ত্রই নিয়ে যেতে পারেনি, সব ইজরাইলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।'

'কেন ধরা পড়ছে জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারলে তার জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার আছে।'

প্রথমে লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ দুটো, তারপর চেহারায় হতাশার ছায়া পড়ল। 'দুঃখিত, সার, আপনার মোটা পুরস্কারের প্রস্তাব এক্ষেত্রে কোন রেজাল্ট দেবে না।'

'কেন?'

'শুনুন, সার, আমি যা বলব সবই শোনা কথা, স্রেফ গুজব।' খালিদকে হঠাৎ একটু সতর্ক দেখাল। 'সত্যি কি মিথ্যে তা আমি জানি না।'

'তবু বলো।'

'এখানে অনেক বেশি টাকার খেলা চলছে, সার,' বলল খালিদ। 'আপনার মোটা টাকার পুরস্কার কতই বা হবে? এক লাখ ডলার? দু'লাখ? নাহয় পাঁচ লাখই।' মাথা নাড়ল সে। 'এখানে লাখ নয়, কোটি কোটি ডলারের লেনদেন চলছে।'

'একটু ব্যাখ্যা করো।'

'ধরুন বিশ কোটি ডলারের চালান। ইজরাইলি সেনাবাহিনী বা মোসাদ-এর সঙ্গে কারও চুক্তি হয়েছে। কি চুক্তি? আর্মস-অ্যামিউনিশন নিয়ে ট্রাকের বহর সীমান্তের কোন্ এলাকা দিয়ে ইজরাইলে ঢুকবে তা আগে থেকে জানাতে পারলে ওই চালানের যা বাজারদর তার অর্ধেক পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে তাকে।

ভেবে দেখুন, আপনার পুরস্কারের চেয়ে ওদের পুরস্কারের মূল্যমান কত বেশি।'

'তবে এটা বোধহয় স্রেফ গুজবই,' বলল রানা। 'কারণ যে পদ্ধতিতে চালান পাঠানো হয়, তাতে আগে থেকে কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় ট্রাকগুলো কোন্ পথ ধরে সীমান্ত পেরুবে।'

'আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা তাই,' বলল খালিদ। 'তবে একটা সম্ভাবনার কথা বলি, গরিব মানুষের কথা বলে উড়িয়ে দেবেন না। কেউ হয়তো অভিনব অথচ খুব সহজ একটা উপায় বের করেছে, যার ফলে সে অনায়াসে আগে থেকে জানতে পারছে চালানটা কোন্ পথ দিয়ে সীমান্ত পেরুবে।'

লোকটার বুদ্ধিতে যথেষ্ট ধার আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা—হয়তো একটু পাগলাটে বলেই। ইয়াসির আরাফাত একটা শব্দ উচ্চারণ করে ওর মনে চিন্তার নতুন যে ধারা সৃষ্টি করেছেন, খালিদের কথা শুনে সেটায় আরও একটু গতি সঞ্চার হলো।

'আপনি, সার, আবার্বিল 'কোম্পানির আঠারোটা বেডফোর্ড ট্রাকের কথা বলেছেন,' হঠাৎ আবার পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল খালিদ। আরও বলেছেন, দুটো চালান যাবে। তারমানে অন্য কোন কোম্পানির ট্রাকও ভাড়া করা হয়েছে।'

'হয়েছে।'

'সামনের চূড়ায় ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হবে,' বলল খালিদ। কোম্পানির নাম আর কোড বললে ট্রাকের দ্বিতীয় বহরটা কোথায় আছে জানা যাবে।'

আরও আঠারোটা ভাড়া করা হোক বা ছত্রিশটা, সেগুলো কোন কোম্পানির ট্রাক তা রানা প্রায় কাউকেই জানতে দেয়নি। সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর না দিয়ে হাতঘড়ি দেখল ও। ওরা গাধার পিঠে চড়ার পর তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পার হয়েছে, বেলা এখন সাড়ে বারোটা, অথচ এখন পর্যন্ত পাহাড়ী পথে একটা লোককেও দেখেনি ওরা। দু'পাশের পাহাড় সারি শুধু আকাশ

ছোঁয়নি, পরস্পরের দিকে এত বেশি কাত হয়ে আছে যে আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। ফলে ভর দুপুরবেলাও গোটা গিরিখাদ গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। খালিদের প্রশ্নের উত্তরে রানা বলল, 'দ্বিতীয় চালানের ট্রাক কোথায় আছে তা আমার জানার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ওগুলোর দায়িত্ব আমি পাপাদুলার ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'

'পাপাদুলার ওপর···ঠিক বুঝলাম না, সার। আমি তো জানি উনি শুধু মাল বেচেন। এমন তো কখনও শুনিনি যে বিক্রি করা মাল ক্লায়েন্টের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছেন উনি!'

'পাপাদুলার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পুরানো সম্পর্ক,' বলল রানা। সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে খালিদকে এমন সব তথ্য দিচ্ছে ও, যাতে বাকি আরও সব জানার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে সে। সময় মত সেগুলোও সরবরাহ করা হবে তাকে, তবে খালিদ ভাববে নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেছে। 'ফিলিস্তিনিদের প্রতিটি চালান ধরা পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে আমি অনুরোধ করলাম দ্বিতীয় ট্রাক বহরের সঙ্গে সে নিজে যেন থাকে।'

'আপনি অনুরোধ করলেন আর পাপাদুলা রাজি হয়ে গেলেন?' খালিদ বিশ্বাস করতে পারছে না। করার কথাও নয়। একজন মিলিওনেয়ার আর্মস ডিলার কখনোই এত বড় ঝুঁকি নেবে না।

'বললাম না, তার সঙ্গে আমার অন্যরকম সম্পর্ক।'

কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না খালিদ। তারপর বিড়বিড় করল, 'আপনার সাহসের বলিহারি।'

'এরমধ্যে তুমি আবার সাহসের কি দেখলে?' বলল রানা। ওদেরকে নিয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠে এল গাধাগুলো। সামনেই খেজুর গাছের পাতা ও ডাল দিয়ে তৈরি কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, সামনেরটার মাথায় আরবী ভাষায় লেখা—মুসাফিরখানা। চড়াই বেয়ে অনেক ওপরে উঠে এসেছে ওরা, মধ্যগগনের সূর্য মাথার চাঁদি ফাটিয়ে দেবে বলে মনে হলো।

'পাপাড্যুলার নিন্দা করলে আমার পাপ হবে, তারপরও কথাটা না বলে পারছি না, স্যার,' বলল খালিদ। 'তাঁর কাছ থেকে আপনি কোটি কোটি ডলারের মাল কিনলেন। সেই মাল জায়গা মত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও তাঁকেই দিলেন! কোন রুট ধরে সীমান্ত পেরুবে, এটাও নিশ্চয়ই তিনি ঠিক করবেন?'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'উনি যদি পরে আপনাকে মিথ্যেকথা বলেন? বলেন, চালানটা ধরা পড়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল খালিদ।

রানা হাসল। 'পাপাড্যুলা আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া, তখন বললাম না, ওই কনভয়ের সঙ্গে আমার নিজের লোকও থাকবে ত্রিশজন। সবাই তারা গেরিলা যোদ্ধা।'

'ত্রিশজন লোক থাকবে! ত্রিশজন লোক থাকবে! সবাই তারা গেরিলা যোদ্ধা!' মনে মনে দ্রুত মুখস্থ করছে খালিদ।

মুসাফিরখানার প্রবেশপথেই রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল গোলগাল, সুটেট বুটেড নিকোলাস পাপাড্যুলা। ডান হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল সে। হ্যান্ডশেক ও কুশল বিনিময় পর্ব দ্রুত সেরে নিল ওরা।

'আমার সঙ্গে কপ্টার আছে,' পাপাড্যুলার মুখে এ-কথা শুনে ওখানে দাঁড়িয়েই গাধাগুলোর মালিক আর গাইড খালিদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিল রানা। মুসাফিরখানার একজন কর্মচারীকে ডেকে রানার লাগেজ ওর জন্যে ভাড়া করা কুঁড়েতে পৌঁছে দিতে বলল পাপাড্যুলা।

নিজের পাওনা একশো ডলারের নোট পকেটে ভরছে খালিদ, ফিরতি পথ ধরা গাধাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় গ্রীক ভাষায় বলল, 'আমাকে আপনাদের আর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনাদেরকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

'মাঝে মধ্যে দার্শনিক হয়ে ওঠার বদভ্যাসটা এখনও দেখছি

তুমি ছাড়তে পারোনি!' একটু তিরস্কারের সুরেই তাকে বলল পাপাড়ুলা। 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'না, মানে, সীমান্ত থেকে এদিকের খুচরো বাজারে কেউ যদি আসতে চায়, তারও গাইড প্রয়োজন হবে, ঠিক কিনা? তাই ভাবছি ওদিক থেকে একবার ঘুরে আসব কিনা।'

'সে তোমার ব্যাপার, আমাদের কোন মাথাব্যথা নয়,' বলল পাপাড়ুলা।

'না, বলছিলাম কি, একা যাওয়া আর একটা কনভয়ের সঙ্গে থাকার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কোন আপত্তি না থাকলে সীমান্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

রানা প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে পাপাড়ুলা বলল, 'ঠিক আছে, থাকবে। তবে কথা এত না বাড়িয়ে কি চাও সরাসরি বললেই পারতে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'খালিদ কোন বিপদ বা ঝুঁকি নয়, আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি। যেতে চাইছে যাক।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল রানা, তবে মুখে কিছু বলল না। তারপর জানতে চাইল, 'মঁশিয়ে লুঁয়ে জাদিব পৌঁছেছেন?' উত্তরে পাপাড়ুলা মাথা ঝাঁকাতে রানাকে বিস্মিত দেখাল। 'তাঁকে দেখছি না যে? কোথায় তিনি?'

এক গাল হেসে পাপাড়ুলা বলল, 'মঁশিয়ে জাদিব আপনাকে একটা সুখবর দিতে বলেছেন।'

'কি রকম?' রানা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

'মিস শারিয়া, মঁশিয়ে জাদিবের বাগদত্তা, নিরাপদেই আছেন,' খবরটা জানাল পাপাড়ুলা। 'সাত মাইল সামনে আল শামায়রা গিরিখাদে পৌঁছাবেন তিনি, ট্রাক বহরকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

বিরাট একটা সুখবর, স্বস্তি বোধ করায় শরীরটা হালকা লাগছে রানার। 'এই খবর মঁশিয়ে জাদিব পেলেন কিভাবে? আমি

যতটুকু জানি, শারিয়ার মোবাইল ফোন কাজ করছে না।'

'করছিল না, এখনও করছে না,' বলল পাপাড়ুলা। 'তবে গতকাল তাঁর বোবা ফোন থেকে হঠাৎ একটা কল্ এসেছে। মিস শারিয়া নিজে ফোন করেছিলেন মঁশিয়ে জাদিবকে। কখন পৌঁছাবেন জানিয়ে বলেছেন, নিরাপত্তার কারণে মোবাইলটা আবার বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে।'

'এতবড় একটা সুখবর পেয়ে মঁশিয়ে জাদিব করছেনটা কি?' রানার প্রশ্নে শ্রদ্ধার সুর। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য সংগ্রামের কথা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে লিখে আর তাদের ওপর ইজরাইলি সেনাবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের ছবি তুলে গোটা আরব বিশ্ব ও মুসলিম জাহানের মন জয় করে নিয়েছে এই ফরাসী মুসলিম তরুণ ফটো-জার্নালিস্ট লুঁয়ে জাদিব। ঘোষণা করেছে, প্রয়োজনে ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে সে।

পাপাড়ুলা বলল, 'মঁশিয়ে কত বড় জার্নালিস্ট, সে তো আপনি জানেনই। প্রতি মাসে আট-দশটা ম্যাগাজিনে লিখতে হয় তাঁকে। মিস শারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় এই ক'দিন কিছুই লিখতে পারেননি। আজ সকাল থেকে বসেছেন আবার।'

'সেক্ষেত্রে তাঁকে আমাদের বিরক্ত করা উচিত হবে না,' বলল রানা।

'উচিত না হলেও, আমরা তাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হব,' বলল পাপাড়ুলা। 'কারণ আর ঘণ্টা তিনেক পর আমাদের কনভয় রওনা হয়ে যাবে।'

'দুটোই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রথমে আপনারা যেটার সঙ্গে থাকবেন,' জবাব দিল পাপাড়ুলা। 'আর দ্বিতীয় কনভয়...'

'থাক!' দ্রুত বাধা দিল রানা।

খালিদ যেন ওদের কথা শুনছেই না—এক, দুই, তিন করে পাহাড়ের মাথা গুণতে দেখা গেল তাকে।

পাপাড়ুলা দাঁত দিয়ে জিভ কেটে নিজেকে সামলে নেয়ার ভান করল। প্রসঙ্গ পাল্টে সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম কনভয়টা একবার আপনার দেখতে ইচ্ছেও করছে না?'

তার কথার ধরনে হেসে ফেলল রানা। 'তুমি না দেখালে কি করে দেখি! কার্গো লোড করা শেষ?'

'প্রায় শেষ,' বলে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল পাপাড়ুলা। 'আসুন, দেখাই।'

কুঁড়েগুলোকে পাশ কাটিয়ে মুসাফিরখানার পিছনে চলে এল ওরা, পাহাড়চূড়ার এক দিকের কিনারা নাক বরাবর সামনে। ওদের ডানদিকে পাথুরে মেঝে বা জমিন কোথাও উঁচু-নিচু বা অসমান নয়, ঠিক যেন বিশাল একটা পাকা চাতাল। সেই চাতালের মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে একজোড়া হেলিকপ্টার। একটা টু-সিটার। দ্বিতীয়টা বেশ বড়। ছোটটা ফ্রান্স আর বড়টা জার্মান কোম্পানির তৈরি।

রানার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ করে পাপাড়ুলা বলল, 'বড়টা মঁশিয়ে জাদিবের। রোমে অনেক জরুরী কাজ ফেলে এসেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে চান।'

রানা ঠিক হিসাবটা মেলাতে পারল না। শারিয়া আসছে। শুধু আসছে না, কনভয়ের সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে ফিলিস্তিনিদের গ্রাম পর্যন্ত যাবার কথা তার। অর্থাৎ মেয়েটা মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে। এ-কথা জানার পরও তার সঙ্গে জাদিব থাকতে চাইবে না?

পাহাড়চূড়ার কিনারায় এসে থামল ওরা। সামনের ঢাল প্রায় এক মাইল লম্বা, নিচে নদী। নদীটা এঁকেবেঁকে বহুদূর এগিয়েছে, তারপর ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গেছে। নদীর দু'পাশে সারি সারি পাহাড়। বহর কেন, আধখানা ট্রাকও রানা কোথাও দেখতে পেল না।

'প্লীজ!' বলে পকেট থেকে বের করে জোড়া সিগার আকৃতির বিনকিউলারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল পাপাড়ুলা।

'হে-হে, আমারটাও নিতে পারেন।' দাঁত বের করে খালিদও নিজের বিনকিউলার বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। রানা তার দিকে তাকালই না।

নদীর দুই কিনারায়, যতদূর দৃষ্টি যায়, কিছু দেখল না রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বহুদূরে চোখের কোণে ধরা পড়ল ক্ষীণ নড়াচড়া। নদীর সারফেস থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট ওপরে, খাড়া একটা পাহাড়ের গায়ে। সেদিকে বিনকিউলার ফোকাস করতেই, খেলনা গাড়ির মত ট্রাকগুলোকে এক সারিতে ঝুলে থাকতে দেখল ও। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুলে নেই, এটা এখান থেকে কারও পক্ষে প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ চোখ সাক্ষী দিচ্ছে। আসলে যে সরু কারনিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো, সেটা দেখাই যাচ্ছে না।

রানার চোখে লোকজনের নড়াচড়া ধরা পড়েছে, দূর থেকে তারা সবাই তিন-চার ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। ট্রাক বহরের চারপাশে হাঁটাচলা করছে তারা, সব মিলিয়ে এক থেকে দেড়শোজন হবে বলে আন্দাজ করল রানা।

'চলুন, মিস্টার রানা, গোসল সেরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিই আমরা,' বলল পাপাভুলা। 'যেহেতু আপনার কনভয় সন্ধ্যার পর রওনা হবে, আমরা ওখানে ছ'টার সময় পৌঁছালেও চলবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছাতে চাই।' ঘুরে মুসাফিরখানার দিকে হাঁটা ধরল ও, বিনকিউলারটা ফিরিয়ে দিল পাপাভুলাকে। 'তুমি গোসল করেই আমার কুঁড়েতে চলে এসো। আমি অর্ডার দিয়ে রাখব, খেতে খেতে জরুরী আলাপটা সেরে নেয়া যাবে।'

রানার পাশে থাকার জন্যে ভুঁড়ি বিশিষ্ট পাপাভুলাকে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে। 'ঠিক আছে। চলুন, আপনার কুঁড়েটা দেখিয়ে দিই।' ঘাড় ফিরিয়ে গাইডের দিকে তাকাল সে। 'তুমিও খাওয়াদাওয়া সেরে কাছাকাছি থেকো, তা না হলে কপ্টার মিস

করবে।'

বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে খালিদ বলল, 'আপনারা কুঁড়ে থেকে বেরুলেই আমাকে সামনে দেখতে পাবেন।'

'তবে সাবধান, আড়াল থেকে আবার আমাদের কথা শুনতে চেষ্টা কোরো না,' গম্ভীর গলায় বলল পাপাডুলা।

'ছি-ছি-ছি!' বলে রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে নি[illegible] কান ধরে উঠব'স শুরু করে দিল খালিদ।

'এর মানে?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে রানার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে পাপাডুলা, 'এ হচ্ছে এক ধরনের আত্মপীড়ন—নিজেকে সাজা দেয়া।'

'কিন্তু ও তো এখনও কোন অপরাধ করেনি!'

'আমার মাথায় এই চিন্তা ঢুকেছে তো যে, আড়াল থেকে খালিদ আমাদের কথা শুনতে পারে? এই যে চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকেছে, এর জন্যে নিজেকে দায়ী করছে সে। সৎ ও নির্দোষ একজন মানুষ হিসেবে আমার মনে নিজের ছাপ ফেলতে পারেনি, এটাকে সে ক্ষমার অযোগ্য একটা ব্যর্থতা মনে করছে। কান ধরে উঠব'স তারই শাস্তি।'

'ওকে থামতে বলো, তা না হলে এমন এক লাথ মারব যে...'

উঠব'স থামিয়ে মুসাফিরখানার দিকে ছুটল খালিদ চোখ বন্ধ করে। ফলে রানার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল। তার এই ভয় পাওয়াটা হয়তো স্রেফ ভান বা অভিনয়। প্রথমে নিজেকে পাগলাটে, তারপর ভীরু প্রমাণিত করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য—তাকে যেন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা না হয়। আর তা দেখা না হলে আড়ি পেতে শোনা তথ্য আগ্রহী মক্কেলদের কাছে বিক্রির পরও নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাবে বলে তার অন্তত ধারণা।

দুনিয়ার এক প্রান্তের এক পাথুরে ছাদে যে মুসাফিরখানা

রয়েছে তাতে গাইড, ভারবাহী শ্রমিক, ঘোড়া ও গাধার মালিক, ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির কর্মচারী বা ড্রাইভারদের জন্যে এক রকম ব্যবস্থা, ভিআইপিদের জন্যে আরেক রকম। রানার কুঁড়েটাও খেজুর গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে তৈরি, তবে ভেতরে আধুনিক বিলাসিতার অনেক উপকরণই পাওয়া গেল। জেনারেটর থাকায় ফ্যান ঘুরছে, ফ্রিজ ও টিভি চলছে। বাথরুমে আধুনিক সব ফিটিংস্, বেডরুমে ফোম লাগানো খাট, লিভিংরুমে সোফাসেট।

পাপান্ডুলাকে নিয়ে লিভিংরুমে বসে মাটন, নানরুটি আর কচি ক্ষীরার সালাদ খাচ্ছে রানা।

ইতোমধ্যে শাওয়ারে দাঁড়িয়ে গোসল করেছে ও, মাইক্রো-ফোনের খোঁজে কুঁড়ের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করতেও ভোলেনি। সার্চ শেষ হয়েছে, এই সময় দরজায় নক করল মুসাফিরখানার দু'জন বয়। দরজা খুলে দিতে খাবার-এর ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল তারা, তাদের পিছু নিয়ে পাপান্ডুলাও। বয়রা খাবার সাজিয়ে দিয়ে চলে যেতে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়েছে পাপান্ডুলা।

নিঃশব্দে খাচ্ছে, কুঁড়ে ঘরের পাতলা দেয়ালের বাইরে খসখসে একটা আওয়াজ দু'জনেই শুনতে পেল, কিন্তু কেউ কারও দিকে তাকাল না।

'জরুরী আলাপটা সেরে নেয়া যাক,' বলল রানা। 'দ্বিতীয় চালান সম্পর্কে এখন আমাকে রিপোর্ট করতে পারো। ওই কনভয়ের সঙ্গে তুমি থাকছ তো?'

'এতবড় একটা অর্ডার, প্রচুর লাভ,' ভারী গলায় বলল গ্রীক আর্মস ডিলার। এখন যা কিছু বলবে সে, সবই রানার শেখানো। 'প্রাণের ঝুঁকি আছে জেনেও আপনার শর্ত মেনে নিয়েছি আমি।'

'কোন কোম্পানির ট্রাক ভাড়া করলে? ক'টা ট্রাক?'

'খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির আঠারোটা ট্রাক।'

ওরা শুনতে পাচ্ছে না, কুঁড়ের বাইরের দিকের দেয়ালে কান

চেপে ধরে বিড়বিড় করছে গাইড খালিদ, 'আঠারোটা খাদেমুল আব্বাসিয়া! আঠারোটা খাদেমুল আব্বাসিয়া! আঠারোটা খাদেমুল...'

'ওখানে, মানে স্টার্টিং পয়েন্টে, তোমার মাল পৌঁছেছে?' জানতে চাইল রানা।

'দ্বিতীয় চালানের জন্যে আপনি এমন সব অস্ত্র আর গোলা-বারুদ চেয়েছেন, যোগাড় করতে একটু বেশি সময় লাগছে,' মাথা নেড়ে বলল পাপাড়ুলা। 'আপনারা আজ রওনা হয়ে যান, আমরা দু'চারদিন পর রওনা হব।'

রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'বলো কি! দু'চার দিন?'

'আপনাকে তো কনভয় নিয়ে আল শামায়রায় মিস শাতিল শারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।' পাপাড়ুলার মুখে আড়ষ্ট হাসি। 'দেখবেন দেরি করে রওনা হলেও, আমরাই এগিয়ে থাকব।'

'আর আমার এজেন্সির ত্রিশজন অপারেটর? ওরা তো তোমার সঙ্গে ওই কনভয়ে থাকবে। আম্মান থেকে পৌঁছেছে?'

'জ্বী, পৌঁছেছে।'

'ওরা এই ক'দিন থাকবে কোথায়? কোম্পানির নামটা কি যেন বললে...ওদের ট্রাকে?'

'কোম্পানির নাম খাদেমুল আব্বাসিয়া।' মাথা চুলকাচ্ছে পাপাড়ুলা। 'প্ল্যান একটু বদলাতে হয়েছে, মিস্টার রানা। আপনার লোকজনকে কাছাকাছি শহরের একটা হোটেলে তুলেছি। ট্রাকগুলোও স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছায়নি।'

'কেন?'

'আসলে খাদেমুল আব্বাসিয়ার ট্রাক স্ট্যান্ডটা আমার গোডাউনের একেবারে কাছে,' ব্যাখ্যা করল পাপাড়ুলা। 'তাই ঝামেলা এড়াবার জন্যে সরাসরি গোডাউন থেকে কার্গো ডেলিভারি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আপনার অপারেটররা

যে-ক'দিন হোটেলে থাকবে, সব খরচ আমার...'

'হুম।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে পাপাভুলা একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, 'এবার তাহলে আমি যাই, আপনি বিশ্রাম নিন।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। কান পেতে থাকায় খসখস আওয়াজটা শুনতে পেল আবার, তারপর জুতোর ডগার ধাক্কায় নুড়ি পাথর গড়াবার শব্দ ভেসে এল। সন্দেহ নেই, খালিদ চলে যাচ্ছে। 'তবে মাত্র আধঘণ্টা বিশ্রাম নেব আমি। তুমি এসে মঁশিয়ে জাদিবের কুঁড়েতে নিয়ে যাবে আমাকে। মহৎ একজন মানুষ, নেহাতই ভাগ্যগুণে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল পাপাভুলা। খালিদের ফিরে যাবার শব্দ সে-ও পেয়েছে, তাসত্ত্বেও গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে আনল সে, 'ট্রাক কোম্পানির নাম ওকে জানানো উচিত হলো কি?'

'আমি চাইছি সে বা তারা তৎপর হয়ে উঠুক,' বলল রানা। 'তা না হলে তাদের আমি চিনব কিভাবে?'

চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে পাপাভুলা বলল, 'আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশনের বিল আমি পেয়েছি। বাকি আছে শুধু মার্সেনারিদের টাকাটা—ত্রিশ লাখ ডলার। ওরা তো আর সত্যি সত্যি আপনার এজেন্সির লোক নয়।'

চেক রেডি করাই ছিল, ব্রিফকেস খুলে সেটা বের করল রানা।

চেকটা নিয়ে একবার চোখ বুলাল পাপাভুলা, তারপর ভেতরের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'কয়েকটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।'

'ইয়েস?'

'আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়,' আন্তরিক সুরে বলল পাপাভুলা। 'ব্ল্যাক মার্কেট থেকে অস্ত্র কিনলেও, আমি বেশ বুঝতে পারি মানুষের অমঙ্গল হয় এমন কোন কাজের সঙ্গে

আপনি কখনোই জড়িত হন না। কিন্তু এবার আপনার সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে আমার মনে দু'একটা প্রশ্ন জেগেছে।'

'কি জানতে চাও তাই তো বলছ না!' রানা একটু বিরক্ত।

'এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, অথচ রেডিও-ওয়েভ কন্ট্রোলড্ টাইম মেকানিজম সহ ডিটোনেটিং সিস্টেম মাত্র আঠারোটা...'

'ছত্রিশটা,' শুধরে দিল রানা। 'এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। নেক্সট।'

'ওরা আপনার এজেন্সির অপারেটর নয়, মার্সেনারি, আমিই যোগাড় করে দিয়েছি,' বলল পাপান্ডুলা, 'কিন্তু ভাড়াটে সৈনিকদের দিয়ে খুব ভাল কোন সার্ভিস কি আশা করা যায়?'

'অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে।' রানা গম্ভীর। 'শোনো। কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে, সব আমি ওদেরকে স্যাটেলাইট ফোনে বুঝিয়ে দিয়েছি—ভাল সার্ভিস পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তুমি আবার ওদের কাজে বাধা দিয়ে বোসো না।'

'অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে ক্ষমা চাই,' রানার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে, যেতে যেতে একটু থেমে আবার বলল পাপান্ডুলা; 'ঠিক আধঘণ্টা পর নিতে আসব আপনাকে।'

চার

লুঁয়ে জাদিবের কুঁড়ের দিকে এগোচ্ছে ওরা, দূর থেকেই দেখতে পেল দরজাটা খোলা। গাইড খালিদের খোঁজে চারদিকে চোখ বুলাল রানা, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না।

কুঁড়েটার ভেতরে এমন একটা দৃশ্য যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওদেরকে। লম্বাটে একটা ডেস্কের ওপর ছোট ল্যাপটপ কমপিউটর দেখা যাচ্ছে, পাশেই স্যাটেলাইট ফোন ও লেযার প্রিন্টার। একগাদা প্রিন্টআউটের ওপর ধবধবে ফর্সা এক তরুণ ঝুঁকে রয়েছে, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, মাথায় সোনালি-বাদামী উষ্কখুষ্ক চুল, কপালে চিন্তার রেখা, দৃষ্টিতে গভীর মনোযোগ। সব মিলিয়ে গোটা চেহারায় আত্মভোলা একজন সাধকের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এরকম নিষ্ঠার সঙ্গে কাউকে কাজ করতে দেখলে ভারী ভাল লাগে রানার। ওর ইচ্ছে হলো, ভদ্রলোককে বিরক্ত না করে আপাতত ফিরে যাবে। কিন্তু হঠাৎ কেশে উঠল পাপাড়ুলা। কুঁড়ের ভেতর ঢুকেও পড়েছে।

চমকে উঠে মুখ তুলল লুঁয়ে জাদিব। পুরু লেন্সের ভেতর তার বড় বড় চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। খানিকপর দৃষ্টি স্থির হলো পাপাড়ুলার মুখে। এতক্ষণে চিনতে পেরে হাসছে। ওই হাসি যেন রানার চোখের সামনে ভেতরের মানুষটাকে মেলে ধরল—বিনয়ী, সরল, এত বেশি নরম যে একটু হয়তো মেয়েলি, একই সঙ্গে অভিজাত ও কেতাদুরস্ত। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ওর দৃষ্টি পাপাড়ুলার পাশে দাঁড়ানো রানার ওপর স্থির হলো। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসার ভঙ্গিটায় স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা। 'নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা।'

রানা ভেবেছিল হ্যান্ডশেক করবে ওরা, কিন্তু আরবদের নিজস্ব ভঙ্গিতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জাদিব ওকে বুকে টেনে নিল। 'বড় সাধ ছিল আপনার সঙ্গে পরিচিত হব। ভাবিনি সে সুযোগ এত তাড়াতাড়ি আসবে। নেতার মুখে শুনেছি—মাসুদ রানা, জীবন্ত কিংবদন্তি।'

পরস্পরকে ছেড়ে দিল ওরা। 'এক অর্থে আপনার নেতার আমি একজন শিষ্য,' বলল রানা। 'আর শিষ্যের কথা গুরু একটু বাড়িয়েই বলেন। কিন্তু আপনার কীর্তি আর সাহসের কথা কাউকে

বাড়িয়ে বলতে হয় না, কোটি কোটি মানুষ নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছে।'

'পরস্পরের প্রশংসা করছি আর লজ্জা পাচ্ছি আমরা,' পাপাড্যুলার দিকে ফিরে বলল জাদিব, হ্যান্ডশেক করল তার সঙ্গে। 'সুখবরটা রানাকে আপনি দিয়েছেন তো?'

'দেখা হওয়ামাত্র।'

'শারিয়ার কিছু হলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম,' কথাটা বলে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল জাদিব, হঠাৎ তাকে খুব ক্লান্ত মনে হলো।

ডেস্কে পড়ে থাকা প্রিন্টআউটগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'কি পড়ছিলেন?'

'নিজের লেখা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ,' বলল জাদিব। 'ইহুদিরা কিভাবে ইজরাইলের সীমান্ত বাড়াতে বাড়াতে জর্দান আর লেবাননকে আত্মীকরণ করবে। এটা ছাপা হবে লন্ডনের দ্য মিররে। আরেকটা নিউজউইকে। ওটায় আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছি, আরবের সমস্ত তেলখনি আমেরিকা সরাসরি নিজের দখলে রাখবে। হাতে সময় নেই, তাই নেতাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারছি না, এটাই দুঃখ।'

এগিয়ে এসে প্রিন্টআউটগুলো হাতে নিল রানা। লেখাগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে, জাদিব আবেগে তাড়িত হয়ে বলছে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বের পক্ষে আরও কি কি লিখতে চায় সে।

'মুসলমানরা আপনাকে নিয়ে সত্যি গর্ব করতে পারে,' মিনিট পাঁচেক পর প্রিন্টআউটগুলো রেখে দিয়ে বলল রানা। 'আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা অসাধারণ।'

'বসুন, আপনারা বসুন,' তাড়াতাড়ি বলল জাদিব, নিজের প্রশংসা শুনে বিব্রত বোধ করছে। 'আমরা এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় রওনা হচ্ছি না?'

'ওখানে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'তাই একটু আগেই পৌঁছাতে চাইছি। কাজ থাকলে আপনি না হয় পরে আসুন।'

'কাজ সামান্যই, বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না,' বলল জাদিব। 'লেখাগুলো শুধু ই-মেইল করব।'

সোফায় বসল রানা। 'ওকে।'

ই-মেইল পাঠাতে শুরু করে জাদিব বলল, 'ঘণ্টাখানেক আগে এখানে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছে।'

'কি ঘটনা?'

'আপনার গাইডের নাম কি ওবায়েদ খালিদ?' জিজ্ঞেস করল জাদিব। 'হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলে কিনা, তার কাছে খুব দামী কিছু তথ্য আছে, বিক্রি করতে চায়।'

গ্রীক ভাষায় ঈশ্বরের নাম নিল পাপাড্রুলা। 'হে ঈশ্বর, মানুষের একি অধঃপতন!'

রানা হাসছে। 'আপনি কি বললেন?'

'বললাম, আগে শোনাও কি তথ্য, তারপর সিদ্ধান্ত নেব দরকার কিনা।'

এবার তিনজনই একসঙ্গে হেসে উঠল।

পাপাড্রুলা বলল, 'শোনেন তাহলে। ওটা একটা ইতর, নরকের কীট। আড়াল থেকে আমাদের কিছু কথা শুনে ভেবেছে...'

'লোকটা বলল, আগে টাকা, তারপর তথ্য।' হাসি থামিয়ে বলল জাদিব। 'তারপর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র পঞ্চাশ ডলার চায় সে। রাজি হয়ে গেলাম, তবে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে বললাম...'

'তথ্যগুলো কি?' জিজ্ঞেস করল পাপাড্রুলা।

'দ্বিতীয় একটা চালান তৈরি করা হচ্ছে,' বলল জাদিব, কমপিউটরে চোখ। 'খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির

আঠারোটা ট্রাকের সঙ্গে মিস্টার পাপাভুলাও নাকি বর্ডার ক্রস করবেন।'

'আপনার জন্যে এ-সব তথ্য দামী নয়,' বলল রানা, 'কারণ এ-সবই আপনি আমার কাছ থেকে জানতে পারতেন।'

কাজ থামিয়ে চোখ তুলল জাদিব, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। 'রানা, বুঝতে পারছেন তো, এই লোক কতখানি বিপজ্জনক? আমাদের প্রতিটি চালান একের পর এক ধরা পড়ে যাচ্ছে, এ-সময় এ-সব তথ্য কেউ প্রচার করে বেড়ালে তার পরিণতিতে নির্ঘাত আরও বিপর্যয় নেমে আসবে।'

রাগে কার্পেটে পা ঠুকল পাপাভুলা। 'সে কোথায়?'

'আমি রেগে গেছি বুঝতে পেরে টাকা তো নিলই না, কান ধরে বার কয়েক উঠব'স করে পালিয়ে গেল...'

'পালিয়ে গেল? কোথায়?'

'জানালা দিয়ে দেখলাম একটা ঘোড়া নিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নামছে, নিশ্চয়ই আমাদের ট্রাক বহরের কাছে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, নাগালের মধ্যে পেয়ে নিই, কানটা ছিঁড়ে নেব।' গজগজ করে আরও কি সব বলছে পাপাভুলা।

'পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে ওর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘোড়াটা তো দেখলাম খুব তাগড়াই, ছোটাতে পারলে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

রানা প্রিন্টআউটগুলো আবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। জাদিব ওকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি নাকি, দ্বিতীয় চালানের সঙ্গে রানা এজেন্সির ত্রিশজন লোক থাকবে?'

'তা থাকবে, কিন্তু—,' রানা সত্যি কথা বলছে না, তার কারণ এই নয় যে লুঁয়ে জাদিবকে বিশেষভাবে সন্দেহ করে ও; ওর সন্দেহের তালিকায় এমন কি ইয়াসির আরাফাতও আছেন—জাদিব বা তিনি, দু'জনেই অসাবধানতাবশত ভুল করে কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন ফাঁস করে দিতে পারেন, '—কিন্তু, তারা রানা

এজেন্সির লোক, এ-কথা তো খালিদের জানার কথা নয়। খালিদ না জানলে আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'আমি জানিনি, আন্দাজে ধরে নিয়েছি।' আবার হাসছে জাদিব। 'খালিদ শুধু বলল, তারা আপনার লোক, সংখ্যায় ত্রিশজন। আর এ তো আমি জানিই যে আপনি একটা ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি চালান।'

স্বস্তির হাসি হাসল রানা। 'তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন।'

কমপিউটর বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল জাদিব। 'আমার কাজ শেষ। চলুন।'

সবাই ওরা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসছে, রানা জানতে চাইল, 'আপনার জিনিসপত্র?'

'আপাতত এখানেই থাক,' বলল জাদিব। 'হাতে আমার অনেক জরুরী কাজ। শারিয়াকে যদি বোঝাতে পারি, ওর দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দিয়ে রোমে ফিরে যাব আমি।'

একটা নতুন উপলব্ধি হিসাবটা মেলাতে সাহায্য করল রানাকে। লুঁয়ে জাদিবকে আরবদের খুব দরকার। সংশ্লিষ্ট সবাই জানে অস্ত্র চোরাচালানের মত একটা কাজে সে মারা গেলে যে বিরাট ক্ষতি হবে তা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

একটা সমতল পাহাড় চূড়ায় একই সঙ্গে নামল হেলিকপ্টার দুটো। প্রকৃতির তৈরি প্রায় দুশো ধাপ বেয়ে চওড়া একটা কারনিসে নেমে এল তিনজন, মুসাফিরখানা থেকে চোখে বিনকিউলার লাগিয়েও যেটাকে দেখতে পায়নি রানা।

একটা বাঁক ঘোরার পর ট্রাকগুলোকে দেখা গেল, ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা এক সারিতে। প্রায় একটা মিছিলের মত এগিয়ে আসছে একদল লোক। রানা আন্দাজ করল, একশোর বেশি হবে তো কম নয়। প্রত্যেকের কাছে একটা

করে একে/ফরটিসেভেন দেখা যাচ্ছে, কেউ এক হাতে ধরে আছে, কেউ কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। প্যান্ট-শার্ট পরা লোকই বেশি, তবে সালোয়ার ও জোব্বা পরা লোকজনও আছে। হামাস বাহিনীর লোকদের চেনা গেল মাথা ও কাঁধে জড়ানো লাল-সাদা চাদর দেখে।

মিছিল হন-হন করে এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর দেখাদেখি পাপাভুলাও। কিন্তু লুঁয়ে জাদির হাসি মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রথম যে সত্যটা রানা উপলব্ধি করল, জাদিবের জনপ্রিয়তা কোন গল্প বা গুজব নয়। হামাস সদস্যরা তো বটেই, ফিলিস্তিনি ট্রাইবাল হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডরা আক্ষরিক অর্থেই ছেঁকে ধরল তাকে—সবাই তার সঙ্গে কোলাকুলি করবে, বঞ্চিত হতে রাজি নয় কেউ।

তবে জাদিব সম্ভবত রানার সম্মানের কথা ভেবেই ওদেরকে বেশি সময় দিল না, হেডম্যান আর পরিচিত কয়েকজন হামাস সদস্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে ভিড়ের ভেতর থেকে নিজেকে বের করে আনল, হাত তুলে রানাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি মাসুদ রানা। অনেক বড় একজন মানুষ। আগেই তোমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এবারের কনভয় ওঁর নেতৃত্বে রওনা হবে।'

প্রথমে এক কি দু'সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল বিরাট ভিড়টা। তারপর বাঘের চেহারা নিয়ে একজন হামাস সদস্য এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল রানার সঙ্গে, কনভয়ের সামনের ট্রাকটায় থাকবে সে। 'রামাল্লা থেকে নেতার মেসেজ পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, আপনি যা বলবেন তাই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে,' বলল বটে, কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হলো না রানাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে সে।

'থামো,' পিছন থেকে আরবিতে বলল রানা, শান্ত সুরে।

থামল লোকটা, তবে ঘুরবে কি ঘুরবে না ভেবে ইতস্তত

করছে।

'এদিকে এসো।' সুর শান্তই, তবে এটা রানার হুকুম।

বাঘ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। কথা বলছে না।

'তোমার নাম কি? এখানে যত হামাস রয়েছে, তুমিই কি তাঁদের লীডার?'

'আমি আসিফ মির্জা। হ্যাঁ, আমিই এখানে ওদের লীডার।' রানার চোখে চোখ রেখে জবাব দিচ্ছে লোকটা।

'আমার সঙ্গে তুমি যে আচরণ করলে, ওরাও কি তোমার সঙ্গে এই আচরণ করে?'

অটোমেটিক রাইফেলটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল আসিফ মির্জা। 'কি আচরণ?'

'তুমি কী নির্দেশ দেবে তা না শুনেই ঘুরে চলে যায়?'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে লুঁয়ে জাদিবের দিকে তাকাল মির্জা। জাদিবের চোখে একাধারে গাম্ভীর্য ও সস্নেহ তিরস্কার। আবার রানার দিকে ফিরল হামাস লীডার। 'দুঃখিত।'

প্রসঙ্গ বদলে রানা জানতে চাইল, 'এখানে এত ভিড় কেন?' লোকজনের ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে ওবায়েদ খালিদকে এক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেল ও।

এরা সবাই কনভয়ের সঙ্গে থাকবে,' জবাব দিল লীডার মির্জা। 'সেভাবেই আয়োজনটা করা হয়েছে।'

'যে-ই করে থাকুক, তা বাতিল করা হলো,' বলল রানা। 'সব মিলিয়ে কতজন কোথায় থাকবে একটু পর বলছি। তার আগে শুধু ফিলিস্তিনি ট্রাইবাল হেডম্যানদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও। ক'জন?'

'চারজন। হেডম্যান আবরুদি আলফাজ, হেডম্যান তাকদির উসমান, হেডম্যান কাসুরিয়া বায়উসি, হেডম্যান মারকান কাসুরি—এক এক করে সামনে চলে এসো।'

হেডম্যান কারও বয়সই চল্লিশের কম নয়, পঁয়ষট্টি বছরের

প্রাণচঞ্চল বৃদ্ধও আছে তাদের মধ্যে। জানা গেল বডিগার্ড ও যোদ্ধা মিলিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচিশজন করে লোক রয়েছে। হেডম্যানদের সঙ্গে পরিচিত হলো রানা, মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করল কার কেমন চেহারা আর কে কি পরেছে। তারপর তাদের সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমি শুনেছি হেডম্যানদের সাহায্য ছাড়া ইজরাইলি সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ফিলিস্তিনিদের গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেজন্যে আপনাদেরকে আমার গাইড হিসেবে দরকার, যোদ্ধা হিসেবে নয়।'

হেডম্যান আর তাদের লোকজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'চারজন ফিলিস্তিনি ট্রাইবাল হেডম্যান,' বলল রানা, 'আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনজন করে বডিগার্ড বা যোদ্ধা, সব মিলিয়ে ষোলোজন। শুধু এরাই ট্রাকে থাকবে, প্রতি ক্যাবে একজন করে। বাকি সব লোকজন আপাতত এখানে থাকবে। অন্তত দিন পনেরো সীমান্ত পেরুতে পারবে না তারা।'

বিস্ময়, অসন্তোষ ও প্রতিবাদ এক সঙ্গে উথলে উঠল।

ভাষার ব্যবধান হেতু পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সমস্যা হচ্ছে পাপাডুলার। ছ'ফুট লম্বা লুঁয়ে জাদিবের কানের কাছে ঠোঁট তুলতে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়াতে হলো তাকে। 'কি ঘটছে এখানে?' জানতে চাইল সে।

'যাই ঘটুক,' জবাব দিল জাদিব, 'আমার বিশ্বাস, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ রানার হাতেই থাকবে। উনি যা করছেন ভেবেচিন্তেই করছেন।'

সবাইকে চুপ করতে বলে আসিফ মির্জা রানার দিকে ফিরল। 'আপনার প্রস্তাব কেউ মানতে চাইছে না।'

'এটা প্রস্তাব নয়, নির্দেশ,' বলল রানা। 'মানতে না চাওয়ার কারণ?'

'ফিলিস্তিনি ট্রাইবস্‌ম্যানরা এখানে থাকবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল হামাস লীডার। 'পনেরো দিন হোটেলে থাকতে হলে অনেক

খরচ।'

'সব খরচ ইয়াসির আরাফাত দেবেন,' বলল রানা, 'আমার মাধ্যমে, এখনি।' আবার খালিদকে দেখতে পেল ও, একজন হেডম্যানের কানে কানে কি যেন বলছে।

আবার গুঞ্জন শুরু হলো, তবে এবারের সুরটা একেবারেই অন্যরকম। দু'একজনকে হাসতেও দেখা গেল। উপজাতীয় লোকজনের হাতে টাকা খুব কম পড়ে, তাই কোথাও রাত কাটাতে হলে মরুদ্যান খুঁজতে হয় তাদের, নয়তো কোন পাথুরে গুহা। হোটেলে থাকার বিলাসিতা তারা কল্পনাই করতে পারে না।

'এখনি রওনা হলে দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবে তোমরা। হোটেল জান্নাত-এ উঠবে সবাই—পনেরো দিনের জন্যে থাকা-খাওয়া ফ্রী,' গুঞ্জন স্তিমিত হয়ে আসতে বলল রানা, লক্ষ করল লোকজন হেডম্যানদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। 'এবার জর্দানি ব্যবসায়ীদের বলছি। আপনারাও দয়া করে এই কনভয়ের সঙ্গে থাকবেন না। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, আমি কোন জবাব বা ব্যাখা দিতে বাধ্য নই।'

ধীর-স্থির, নিস্তব্ধ হয়ে থাকল ওরা, সংখ্যায় কম জর্দানি চোরা-কারবারীদের কারও সাহস হলো না প্রতিবাদ করে।

'মির্জা?' রানার গলা চড়া।

'জনাব!' নিজের অজান্তেই টান টান হলো হামাস নেতা।

'হেডম্যানদের বলো, তারা বারোজনকে আলাদা করুক,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর ষোলোজনকে ষোলোটা ট্রাকে তুলে দাও।'

মির্জা হেডম্যানদের সঙ্গে কথা বলছে, এই ফাঁকে জাদিবকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি অন্তত আল শামায়রা গিরিখাদ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে তো থাকছেনই। আমি জানতে চাইছি, ট্রাকে করে যাবেন, নাকি কন্টার নিয়ে?'

হেসে ফেলল জাদিব। 'আমি চাই আপনিও আমার সঙ্গে

কন্টারে থাকুন।'

'তা কি করে হয়। এই কনভয় আমার নেতৃত্বে রওনা হবে।'

'কনভয় আসলে রওনা হবে আল শামায়রা গিরিপথ থেকে,' বলল জাদিব। 'এবং সত্যি কথা বলতে কি, আপনার নেতৃত্ব দরকার হবে সীমান্ত পার হবার সময় থেকে।'

'তবু, স্টার্টিং পয়েন্ট থেকেই এদের সঙ্গে থাকতে চাই আমি,' বলল রানা। 'কারণ এদের সঙ্গে জরুরী অনেক কাজ আছে।' মির্জার দিকে ফিরল ও। 'আমি থাকব তোমার সঙ্গে সামনের ট্রাক্টায়। শেষ ট্রাকের ক্যাবে শুধু ড্রাইভার উঠবে, তার পাশের সিট খালি থাকবে বিশেষ একজনের জন্যে– নামটা এখন না হয় না-ই বললাম।'

এবার উল্লাসধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হলো একটা নাম, 'শাতিল শারিয়া। শাতিল শারিয়া।'

রানা ওর ব্রিফকেস খুলে চেক লিখতে ব্যস্ত কাজটা শেষ হতে পাপাডুলার হাতে সেটা ধরিয়ে দিল ও। 'যবর-এ-জালিমে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, এই টাকাটা ভাঙিয়ে হোটেলের বিল অগ্রিম দিয়ে দেবে, যে-ক'জন থাকতে চায় সবার।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল পাপাডুলা। 'ইচ্ছে ছিল মিস শারিয়ার সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু তা বোধহয় আর হলো না।'

'কেন দেখা হবে না?' রানাকে বিস্মিত দেখাল। 'তুমিই তো তখন বললে দ্বিতীয় চালান রওনা হতে দু'দিন দেরি হবে। হাতের এই কাজটা সেরে আল শামায়রায় ফিরে এসো, তাহলেই দেখা হবে।' জাদিবের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি?'

'শারিয়ার তো পৌঁছাতে দেরি আছে,' বলল জাদিব। 'আমি বরং মুসাফিরখানায় ফিরে যাই, কিছু কাজ সেরে রাখি।'

'শারিয়া কি আপনাকে জানিয়েছে, ঠিক কখন পৌঁছাবে?'

'পরশু সকালের মধ্যে।'

'তারমানে কাল ভোর রাতেও পৌঁছাতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, তারপর মির্জার দিকে তাকাল। 'জাদিব সাহেবের সঙ্গে দু'জন লোক পাঠাও, ওঁর কপ্টার থেকে আমার লাগেজ নিয়ে আসবে। আর অতিরিক্ত লোকদের বলো তারা যেন ফিরে যায়।'

পাপাডুলা ও জাদিব বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর মির্জাকে রানা বলল, 'তোমার লোকজন ও অন্য সবাইকে ট্রাকের ক্যাবে উঠতে বলো। প্রতিটি ট্রাকে আমি নিজে উঠব পরিচিত হবার জন্যে।' ওর আসল উদ্দেশ্য প্রতিটি ট্রাক সংক্ষিপ্ত সার্চ করা।

গলা চড়িয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিল হামাস লীডার। নির্দেশ পেয়ে ট্রাকে উঠছে ড্রাইভার আর তাদের ট্রাইবাল সঙ্গীরা, মির্জা রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাহলে রওনা হব কখন?'

রানা কিছু বলবার আগে সামনে এসে দাঁড়াল একজন হেডম্যান, আবরুদি আলফাজ। বয়স পঞ্চাশ কি বাহান্ন হবে, গায়ে ঢেলা জোব্বা, মাথায় লাল পাগড়ি। 'একটা খারাপ কথা, জনাব।'

আঞ্চলিক হলেও, তার কথা বুঝতে রানার অসুবিধে হলো না। 'বলো।'

'আপনার এক লোক ধরা পড়েছে,' হেডম্যান আবরুদি আলফাজ বলল। 'সে একজন বেঈমান।'

'আমার লোক?'

'সে তো তাই বলছে। আপনি তাকে গাইড হিসেবে ভাড়া করেছেন।'

'আচ্ছা, ওবায়েদ খালিদের কথা বলছ তুমি। সে আমার কোন লোক নয়। তা কি করেছে সে?' রানার এখন মনে পড়ছে, ভিড়ের মধ্যে খালিদকে দ্বিতীয়বার যখন দেখে ও, সে এই হেডম্যান আলফাজের কানে কানে কিছু বলছিল।

'আমার কাছে একশো মিশরীয় পাউন্ড চাইল সে,' বলল,

টাকাটা পেলে অনেক টপ সিক্রেট ইনফরমেশন দেবে,' বলল আলফাজ।

'কি টপ সিক্রেট ইনফরমেশন?'

'এটা ছাড়াও আমাদের নাকি আরেকটা চালান সীমান্ত পেরুবে। খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির আঠারোটা ট্রাকের একটা বহর। সে আরও বলছে, তার কাছে এমন একটা তথ্য আছে, সেটা নাকি শুধু আপনি কিনতে পারবেন—দাম নাকি কোটি কোটি ডলার।'

রানার মাথাটা হঠাৎ যেন চক্কর দিয়ে উঠল। হেডম্যান আলফাজের চওড়া কাঁধ চেপে ধরল সে। 'কোথায় সে?'

ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ট্রাইবাল হেডম্যান জবাব দিল, 'আমি তাকে টাকা তো দিইইনি, ওদিকের একটা বোল্ডারের আড়ালে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছি।'

মনটা অজানা আশঙ্কায় হাহাকার করে উঠল, হেডম্যানের দৃষ্টি অনুসরণ করে ছুটল রানা।

দু'পাশে সরে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল ভিড়। রানার পিছনে হেডম্যান আলফাজ ও হামাস লীডার মির্জাও ছুটছে। বোল্ডারটা বেশি দূরে নয়, কাছেই। সেটার পিছনে সবার আগে রানা আর আলফাজ পৌঁছাল।

হাত-পা বাঁধা, সরু এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে ওবায়েদ খালিদ—একটু পাগলাটে, একটু লোভী, ব্যক্তিত্বহীন, তরল প্রকৃতির একজন মিশরীয় গাইড। এরই মধ্যে এক ঝাঁক মাছি ক্ষতটার চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। ছুরির ফলাটা কত বড় জানার উপায় নেই; তবে নিশ্চয়ই সেটা হৃৎপিণ্ড ফুটো করতে ব্যর্থ হয়নি। রুপোর কাজ করা হাতলটা ছোট, আড়াই ইঞ্চির বেশি না।

'ইয়া আল্লাহ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল হেডম্যান আবরুদি আলফাজ। পাঁচ মিনিটও হয়নি এখান থেকে গেছি আমি...আমার

রাগ দেখে লোকটা হাসছিল···বলছিল, আমি কি জানি শুনলে মিস্টার রানা আমাকে সারাজীবন সুখে থাকার ব্যবস্থা করবেন···'

পাঁচ

নির্মম হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু হলো ওদের অশুভ যাত্রা। রওনা হবার আগে সবার উদ্দেশে রানা অল্প দু'চারটে কথা বলেছে। 'আমাদের মধ্যে একজন খুনী আছে। সে চায় না এই অস্ত্র ও গোলা-বারুদ ফিলিস্তিনিদের হাতে পৌঁছাক। ওবায়েদ খালিদ নিশ্চয়ই কোন সূত্র পেয়েছিল, তা না হলে তাকে খুন করা হত না। আমার অনুরোধ, চোখ-কান খোলা রাখো সবাই। আমরা খুনীকে ধরব, সূত্রটাও পাবার চেষ্টা করব।'

দুর্গম পাহাড়ী পথ ধরে আল শামায়রা গিরিপথের দিকে ধীর গতিতে, হেলেদুলে এগোচ্ছে ট্রাক বহর। সামনের ট্রাকে রয়েছে রানা, ড্রাইভ করছে হামাস লীডার আসিফ মির্জা। প্রতিটি ট্রাক তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপলের নিচে কাঠের বাক্সের ভেতর ছোট ছোট প্যাকেটে আছে অস্ত্র ও বিস্ফোরক। তবে সামনের কয়েকটা বাক্সে শুধু সিরামিক আর সিল্ক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।

রওনা হবার আগে প্রতিটি ট্রাকের ক্যাবে একবার করে উঠেছে রানা। তল্লাশী চালানোই উদ্দেশ্য ছিল। অস্বাভাবিক বা বেমানান কিছু চোখে পড়েনি। মানুষের মাথায় চিন্তার ধারা তৈরি হবার স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া হলো, কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টোটা কি হবে এই প্রশ্ন জাগে। যেমন–মার্কড ও আনমার্কড।

ইয়াসির আরাফাতের মুখে আনমার্কড্ শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রানার মাথায় মার্কড্ শব্দটা ঢুকেছিল। ট্রাকগুলোয় কোন মার্কা বা চিহ্ন থাকছে না তো? যে মার্কা বা চিহ্ন দেখে ইজরাইলি সৈন্যরা কনভয়টাকে চিনে ফেলছে? তা না হলে সমস্ত লোকজন বদলে ফেলা সত্ত্বেও প্রতিবার কেন চালানগুলো ধরা পড়ে যাবে?

প্রথম দিকে রানার ধারণা ছিল না কি খুঁজতে হবে। পরে নিজের একটা ভুল বুঝতে পারে ও। ইজরাইলি সৈন্যরা মার্কা ও চিহ্ন কিভাবে দেখতে পাবে, যদি না তারা প্রথমে ট্রাক বহরটাকে দেখতে পায়? সীমান্ত এলাকায় ট্রাক বহর দেখতে পেলে তারা তো সেটাকে থামাবেই। কিন্তু লোকবল কম হবার কারণে সব জায়গায় তারা পাহারা দিতে পারছে না, শুধু টিপস্ বা মেসেজ পেলেই সৈন্য পাঠায়। তারমানে ট্রাক বহরে কোন চিহ্ন নয়, নয় কোন মার্কা, থাকলে আছে মেসেজ পাঠাবার কোন যন্ত্র।

একটা টু-ওয়ে রেডিও? মোবাইল মিনি ট্র্যান্সমিটার? নাকি ছোট একটা ব্লীপার?

ব্লীপারই সবচেয়ে নিরাপদ। লেটেস্ট মডেলটা এত ছোট দেখেছে রানা যে একটা লাইটারের ভেতর লুকিয়ে রাখা সম্ভব। ট্রাক বহরের সঙ্গে একটা ব্লীপারই যথেষ্ট, তবে সাবধানের মার নেই ভেবে দু'তিনটে ব্লীপার ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে সেগুলো যদি কোন মানুষের শরীরে না রেখে ট্রাকের কোথাও লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

ট্রাকের কোথাও। কোথায়? ক্যাবগুলো দেখেছে রানা, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। তবে সত্যি কিছু থাকলেও মাত্র দু'তিন মিনিট চোখ বুলিয়ে সেটা দেখতে পাবার আশা করা যায় না। ভাল করে তল্লাশী চালাতে হলে প্রতিটি ক্যাব খালি অবস্থায় পেতে হবে ওকে। চেষ্টা করলে তা হয়তো পাওয়া যাবে, তবে সেজন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আর তা নাহলে হামাস ড্রাইভারদের বিশ্বাস করে নির্দেশ দিতে হয়, কিছু পাও কিনা সার্চ

করে দেখো।

মুশকিল হলো, অভিযানের এই পর্যায়ে কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় রানা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ইজরাইলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ ফিলিস্তিনিদের কাউকে অস্বাভাবিক মোটা টাকা পুরস্কার দিচ্ছে, সেই পুরস্কারের লোভে বেঈমানী করছে কেউ। এই আইডিয়াটা পাগলাটে গাইড ওবায়েদ খালিদের মাথা থেকেও বেরিয়েছিল, সেজন্যে তার মৃত্যুতে রানা আরও বেশি দুঃখ পেয়েছে। লোকটার কথা মনে পড়তে আবারও অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করল ও। এ-কথা ওর একবারও মনে হয়নি যে লোকটার স্বভাবগত দুর্বলতা কাজে লাগাতে গেলে তার জীবনটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। তা অবশ্য ঘটেনি, না-'গোপন' তথ্য বিক্রি করতে গিয়ে খুন হয়নি খালিদ, খুন হয়েছে অস্ত্র বোঝাই কনভয় কিভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে সেটা জেনে ফেলায়।

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিনের আলো আর সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পাওয়া যাবে। কনভয়ের গতি এত মন্থর, সাত মাইল দূরের গিরিপথ আল শামায়রায় পৌঁছাতে মাঝরাত পার হয়ে যেতে পারে। ব্রিফকেস খুলে স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে রাখল রানা। যবর-এ-জালিম থেকে সোহেল ওকে ফোন করতে পারে। পাশে মির্জা থাকলেও কোন অসুবিধে নেই, সে নিশ্চয়ই বাংলা বোঝে না।

দেড় ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হামাস লীডার আব্বাস মির্জা ভান করছে, রানার কাছ থেকে এক হাজার মাইল দূরে সে। ওদের ট্রাকের হেডলাইট জ্বলছে না, পিছন থেকে কোন আলো আসছে না। তবু রানা জানতে চাইছে না অন্ধকারে পথ চলার কি কারণ।

ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ ট্রাক থামাল মির্জা, স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে গমগমে গলায় বলল, 'আবার কাল সকালে।'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল—মানে? কিন্তু এ ধরনের প্রশ্নে

নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে ভেবে চুপ করে থাকল। তারপর একটা আওয়াজ পেয়ে আন্দাজ করতে পারল কেন কি ঘটছে। বিকট শব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল জর্দান এয়ার ফোর্স-এর একজোড়া জেট ফাইটার। অর্থাৎ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রাত্রিকালীন সামরিক টহলদারি শুরু হয়েছে। এদিকে সম্ভবত এটা রোজকার রুটিন। তাই আলো জ্বালার সাহস হয় না কারও। আর আলো না জ্বেলে এই পথে কারও পক্ষে ট্রাক চালানো সম্ভব নয়।

বিশাল জায়গা জুড়ে গিরিপথটা আসলে একটা গভীর গহ্বর। ট্রাকগুলোর এঞ্জিন বন্ধ হতে, ইতিমধ্যে, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ওঠায় পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না, নিস্তব্ধতা একাধারে ভৌতিক ও অশুভ হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে পরিস্থিতিও হয়ে উঠল অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই কনভয়ের সঙ্গেই আছে মোসাদের টাকা খাওয়া আততায়ী। রানার কোন ধারণা নেই তারা ক'জন। তবে ওর পরিচয় আর উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কার। প্রথম সুযোগেই তারা রানার ওপর আঘাত হানতে পারে। আর চোরাগোপ্তা হামলা চালাবার জন্যে রাতের অন্ধকার খুবই সহায়ক। এখানে আইন বা পুলিস নেই, কেউ খুন হলে কোন তদন্তও চলবে না।

কিন্তু হামলার ভয়ে কাজ তো আর ফেলে রাখা যায় না। ট্রাকগুলো আরেকবার সার্চ করতে হবে রানাকে। হেডলাইট না জ্বলুক, টর্চের আলো জ্বলবে।

কাজ অবশ্য আরও একটা বাকি আছে। কয়েক মিনিটের জন্যে একা হওয়া দরকার ওর।

কাছাকাছি মাটি পাওয়া যায়নি, তাই ওবায়েদ খালিদকে কবর দেয়া হয়েছে নুড়ি পাথরের নিচে। জানাজার আগে লাশের বুক থেকে ছুরিটা খুলে নিয়েছে রানা। কেউ বলেনি, কাজটা নিজের গরজে করেছে ও—সেই সুযোগে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তল্লাশী চালিয়েছে ওর গাইডের কাপড়চোপড় আর শরীরে। তার

মোটা-তাজা মানিব্যাগটা তখন থেকে ওর ট্রাউজারের পকেটে পড়ে রয়েছে, সুযোগের অভাবে খুলে দেখা হয়নি।

পায়ের কাছ থেকে ব্রিফকেসটা তুলে কোলের ওপর রাখল রানা। আসিফ মির্জা নাক বরাবর অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা একটা মূর্তি, কে বলবে প্রাণ আছে। ব্রিফকেস থেকে শুধু টর্চটা বের করল রানা। ওর পিস্তল ওয়ালথার কোমরে বেল্টের সঙ্গে গোঁজা রয়েছে, ছুরিটা রয়েছে বগলের নিচে আটকানো। ব্রিফকেসে তালা লাগিয়ে ওর দিকের দরজা খুলে ক্যাব থেকে নামতে যাবে, মূর্তি জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'অন্ধকারে নামবেন না, জনাব। ওরা ওত পেতে আছে।'

'ওরা কারা?'

'আপনাকে যারা খুন করবে।'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'আপনিই বলেছেন, আমাদের মধ্যে একজন খুনী আছে।'

'হ্যাঁ, বলেছি, তবে এ-ও শুনে রাখো: নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

রানা নেমে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে মির্জা বলল, 'একান্তই যদি নামেন, আপনার সঙ্গে আমাকেও নামতে হবে।'

'কেন?'

'এরকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে,' বলল মির্জা।

'মানে?' ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা।

'মহামান্য নেতার তরফ থেকে আপনাকেই যেহেতু কনভয়ের কমান্ডার হিসেবে পেয়েছি আমরা, তাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করেছি আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি আপনাকে প্রোটেকশন দেয়া। সব সময় আপনার সঙ্গে আমরা কেউ না কেউ থাকব।'

'শুনে সত্যি ভাল লাগছে। কিন্তু তুমি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে, সেই খুনী লোকটা তোমাদের একজন নয়?'

ড্যাশবোর্ডের অল্প আলোয় আসিফ মির্জার চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল। 'আমরা? হামাস? ফিলিস্তিনি স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করব?'

'যে-কোন যুদ্ধে অন্ধবিশ্বাস মারাত্মক বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'হামাস বা হিযবুল্লাহ্ মানেই ফেরেশতা নয়। অস্ত্রের চালান বারবার যখন ধরা পড়ে যাচ্ছে তখন সবাইকেই তোমার সন্দেহ করতে হবে।' কথা আর না বাড়িয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা।

'আমার নিজের ওপর কোন সন্দেহ নেই,' বলে ওর পিছু নিয়ে নেমে পড়ল মির্জাও। 'আপনি চান বা না চান, আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

পাহাড়ী কারনিস ধরে ট্রাক বহরের পিছন দিকে এগোবার সময় রানার সামনে থাকল মির্জা, প্রতিটি ক্যাবের পাশে থেমে ড্রাইভারকে জানাল, 'কেউ তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া নিচে নামবে না। যখন নামবে, দু'জন এক সঙ্গে। আমি বলতে চাইছি, একজন আরেকজনের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখবে। কেউ যেন ভুলেও কারও চোখের আড়াল না হয়।'

পদ্ধতিটা রানার অপছন্দ হলো না। তবে এতে করে সন্দেহ ও উত্তেজনার মাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যাবে।

ট্রাকগুলোকে এবার রানা বাইরে থেকে পরীক্ষা করছে। দু'একটা ক্যাব-এর ছাদেও চড়ল। প্রতিটি ছাদ আধ্ হাত উঁচু কাঠের রেইলিং দিয়ে ঘেরা। খালি বালতি, কুণ্ডলী পাকানো রশি ইত্যাদি পড়ে আছে। টর্চের আলোয় আধুনিক কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রায় সবগুলো ট্রাকের সামনে ও পিছনে কিছুক্ষণ করে দাঁড়াল রানা। টর্চের আলো ফেলে প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করল, নিজেকে প্রশ্ন করছে—আমার বিবেচনায় একটা ব্লীপার লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা কোনটা? হেডলাইট বা ব্যাকলাইটের ভেতর? মাডগার্ড-

এর গায়ে? ড্যাশবোর্ডের তলায় কোথাও?

একটা ট্রাকের যে-কোন জায়গায় ওটা থাকতে পারে। পেতে হলে সব জায়গায় খুঁজতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

মির্জার ওপর রানা খুশি, কারণ ওর কাজে সে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না বা অহেতুক কৌতূহলও দেখাচ্ছে না। সঙ্গী হামাস সদস্য আর ট্রাইবাল হেডম্যানদের সঙ্গে কথা বলছে সে, সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছে চোখ-কান খোলা রাখলে বেঈমান অবশ্যই ধরা পড়বে।

শেষ ট্রাকটার পিছনে এসে অন্ধকার পথের মাঝখানে বসে পকেট থেকে ওবায়েদ খালিদের মানিব্যাগটা বের করল রানা। পেন্সিল টর্চের আলোয় প্রথমেই নজর কাড়ল কড়কড়ে মার্কিন ডলারগুলো। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। লোকটার কাছে এত টাকা ছিল? যার কাছে এত টাকা থাকে, সে দু'শো-একশো টাকার জন্যে ওরকম নির্লজ্জতা করবে? নোটগুলো গুণল রানা। একুশটা। তারমানে দু'হাজার একশো ডলার।

একশো ডলার রানাই তাকে দিয়েছিল, পারিশ্রমিক হিসেবে। বাকি দু'হাজার ডলার খালিদ পেল কোথায়?

হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল রানা। ওর মানিব্যাগে বাইশশো ডলার ছিল, খালিদকে একশো ডলার দেয়ার পর একুশশো ডলার থাকার কথা।

চোখের সামনে ফিরে এল নিকট অতীতের একটা দৃশ্য: ছুটছে খালিদ, চোখ বন্ধ। রানার সঙ্গে ধাক্কা খেলো সে।

ওই ধাক্কা খাওয়াটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল। সেই সুযোগে কাজ হাসিল করে ফেলে। পকেট থেকে এবার নিজের মানিব্যাগ বের করে খুলল রানা। যা ভেবেছে, তাই। ওর মানিব্যাগ খালি। তবে একশো ডলারের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা কথা মনে হতে দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল রানার। পকেটমার হিসেবে ওবায়েদ খালিদ সম্ভবত গিল্টি মিয়ার সমান

দক্ষ ছিল। ধাক্কা খেয়ে রানাকে ধরে ঝুলে পড়ে সে, ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। আসলে সেই মুহূর্তে একটা অসাধ্যসাধন করছিল সে—রানার পকেট থেকে মানিব্যাগটা শুধু তুলে নেয়নি, টাকা বের করার পর সেটা তখনি আবার যথাস্থানে রেখেও দিয়েছে দু'জোড়া চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

ওবায়েদ খালিদের মানিব্যাগে আর কি কি পাওয়া যায় দেখছে রানা। কয়েকটা ভিজিটিং কার্ড রয়েছে। কিছু খুচরো টাকা। ছোট্ট এক ছেলের পাসপোর্ট সাইজ ফটো, পিরামিডের সামনে দাঁড় করিয়ে তোলা। মানিব্যাগের ভেতরের পকেট থেকে বেরুল চার ভাঁজ করা একটা কাগজ। ভাঁজ খুলতে সবুজ কালিতে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ দেখতে পেল রানা। আঁকাবাঁকা একটা মোটা রেখার ওপর দিকে ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো তারকাচিহ্ন। প্রতিটি চিহ্নকে মধ্যবিন্দু ধরে একটা করে বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বৃত্তের পরিধি উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ মাইল। এরকম একটা বৃত্তের মাঝখানে কালো বল পয়েন্ট দিয়ে লেখা হয়েছে—বি.আর.আর।

ম্যাপ বা নকশাটার দিকে ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। কোন সন্দেহ নেই যে এটা জর্দান-ইজরাইল সীমান্তের ম্যাপ। মোটা দাগটা সীমান্তরেখা। তারকাচিহ্নগুলো সম্ভবত ইজরাইলি সেনা চৌকি। সেনা চৌকি মাঝখানে রেখে বৃত্ত আঁকার সম্ভাব্য অর্থ কি হতে পারে? প্রতিটি সেনা চৌকিতে একটা করে ইলেকট্রনিক রিসিভার আছে, পাঁচমাইল পরিধির মধ্যে থেকে কোন ব্লীপার ইলেকট্রনিক সংকেত পাঠালে ধরতে পারবে?

ম্যাপটা দেখে রানার আগের ধারণা আরও দৃঢ় হতে চাইছে। ট্রাক বহরে ব্লীপার অবশ্যই আছে। তবে শুধু ব্লীপার নয়, বিশ্বাসঘাতকও আছে। তাকে বা তাদেরকে থাকতেই হবে, তা না হলে ইজরাইলি সেনা চৌকির পাঁচ মাইলের মধ্যে কনভয়টাকে

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে?

বি.আর.আর মানে কি? ম্যাপটা সবুজ কালিতে আঁকা, এই লেখাটা কালো কালিতে কেন? বি মানে ব্লীপার, আর মানে রিসিভিং, আরেকটা আর মানে রেঞ্জ নয়তো?

রানা প্রায় নিশ্চিত, লেখাটা খালিদের। সে-ই সংক্ষেপে লিখে রেখে গেছে–ব্লীপার রিসিভিং রেঞ্জ।

এখন আর জানার কোন উপায় নেই, এই ম্যাপ কার পকেট থেকে সরিয়েছে খালিদ। কিন্তু রানা তাকে কোটি কোটি ডলার দেবে, ট্রাইবাল হেডম্যান আবরুদি আলফাজকে এ-কথা কেন বলল সে? শুধু এই ম্যাপটার জন্যে? না, তা হতে পারে না। খালিদ আরও কিছু জেনে ফেলেছিল। হয়তো একটা ব্লীপারই খুঁজে পেয়েছিল। নিশ্চয়ই তাই, কারণ এরচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে কোটি কোটি ডলার পাবার কথা ভাবত না সে।

তারপর রানার মাথায় আরেকটা চিন্তা ঢুকল। কালো বল পয়েন্টের লেখাটা যদি খালিদের হয়, ধরে নিতে হবে ওর উদ্দেশে বা ওর সাহায্যে এই কাজ করে গেছে সে। তাই যদি হয়, ব্লীপারটা খুঁজে পাবার কোন সূত্র কেন সে রেখে যাবে না?

ম্যাপটা আরেকবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। না, আর কোন সূত্র আছে বলে মনে হয় না। উল্টোপিঠটা দেখল ও। এদিকে ওই কালো বলপয়েন্টেই খুদে খুদে হরফে লেখা হয়েছে–'আম্মান: ২০০৩'।

এর মানে কি? দু'হাজার তিন সাল বোঝাতে চেয়েছে খালিদ? নাকি এটা কোন ট্রাকের নম্বর?

না, ট্রাক নম্বর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানিগুলো তাদের ট্রাক স্মাগলিং-এর কাজে ভাড়া দেয়ার আগে নম্বর প্লেট থেকে সব লেখা হয় ঘষে ঘষে মুছে ফেলে, নয়তো নতুন রঙ লাগিয়ে ঢেকে দেয়। এই বহরটার কয়েকটা ট্রাকে নম্বর প্লেটই নেই, এমনও দেখেছে রানা।

তবে সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে, সেটা সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে যাচাই করে দেখবে রানা।

প্রতিটি ট্রাকের সামনে ও পিছনে একটা করে নম্বর প্লেট থাকে, ফেরার সময় সবগুলোর ওপর টর্চের আলো ফেলছে। প্রথম দুটো ট্রাকে কোন নম্বর প্লেট নেই। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ট্রাকের নম্বর প্লেটের গায়ে নতুন রঙ চড়ানো হয়েছে। পরেরটাও তাই, তবে যে উদ্দেশে রঙটা চড়ানো হয়েছে তা পূরণ হয়নি–অর্থাৎ রঙটা যথেষ্ট ঘন ছিল না, ফলে নম্বর প্লেটের লেখাগুলো পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি। পেন্সিল টর্চের আলোয় একটু চেষ্টা করতেই পড়তে পারা গেল–'আম্মান: ২০০৩'।

রানা মনে মনে উল্লসিত। ট্রাকটা পাওয়া গেছে! এবার এটাকে সার্চ করতে হবে। তবে নিজের লাগাম টেনে ধরল ও–ধীরে বৎস, ধীরে! কোন সন্দেহ নেই, বেঈমানরা ওর প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে। অন্ধকার রাত, হঠাৎ কোথাও থেকে একটা ছুরি বা বুলেট ছুটে না আসাটাই বিস্ময়কর। ভাগ্যকে নিঙড়ে অতিরিক্ত কিছু পেতে চাওয়াটা বোকামি হবে।

বাকি ট্রাকগুলোর নম্বর প্লেটও চেক করছে রানা। এতে করে শত্রুপক্ষ ধরে নেবে, ও যা খুঁজছে এখনও তা পায়নি। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে কান খাড়া করল ও। এই শব্দ ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে হামাস নেতা আসিফ মির্জাও প্রথম ট্রাকে ফিরছে।

অকস্মাৎ শিরদাঁড়ায় ভয়ের একটা হিমশীতল অনুভূতি। পিছনে পায়ের শব্দ একজোড়া নয়। আর শুধু পিছনেও নয়। রানার বাম হাতে এরইমধ্যে পিস্তল আর ডান হাতে ছুরি বেরিয়ে এসেছে।

মির্জার পায়ের শব্দ দ্রুত হলো। 'জনাব!' পাশে চলে এসে ফিসফিস করল সে। 'ঘাবড়াবেন না, আমরাই পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?' সরু এক ফালি আকাশে অল্প কয়েকটা তারা ফুটেছে, তারই আলোয় কারনিসের কিনারা ঘেঁষে হাঁটছে রানা। আসলে পিস্তল বা ছুরিরও দরকার হয় না, দু'হাত দিয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিলেই চলে, ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে যাবে ও।

'আছে,' ফিসফিস করল মির্জা, রানার একটা কনুই ধরে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। 'ট্রাকগুলোর সামনে চলুন, তারপর সব বলছি।'

'নিজেদের ট্রাক ছেড়ে নামা উচিত হয়নি ওদের,' বিড়বিড় করল রানা।

'ট্রাক থেকে নামেনি, জনাব,' কনভয়ের সামনে এসে রানাকে অন্ধকারে দাঁড় করাল মির্জা। 'তবে সবাই ওরা হামাস সদস্য, আসছে যবর-এ-জালিমের একটা মুসাফিরখানা থেকে।'

'সে কি! কেন?'

'ওই মুসাফিরখানা আমাদের একটা গোপন ঘাঁটি, জনাব,' বলল মির্জা, রানাকে নিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, ওদের সামনে আর দু'পাশে গাঢ় কয়েকটা ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। 'একজন ইনফর্মার ওখানে এসে আমাদের লোককে খবর দেয়, ফিলিস্তিনি কিছু ট্রাইবাল লোক প্রথম ট্রাকের প্যাসেঞ্জারকে মারতে আসছে। তারমানে আপনাকে। খবরটা শুনে ওরা আর দেরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে।'

'আর তারা?'

'তাদের...,' নিজের টর্চ জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল আসিফ মির্জা। '...আধঘণ্টা পর রওনা হবার কথা ছিল। আমার হিসেবে এখানে পৌঁছাতে আর মিনিট দশেক লাগবে ওদের।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল। রানা চিন্তা করছে।

'তুমি কি ভাবছ?' অবশেষে জানতে চাইল ও। 'কি করতে চাও?'

'জেট ফাইটার গুলি করতে পারে, তবু আমি চাই কনভয় আবার রওনা হোক,' বলল মির্জা। 'সচল কনভয়টাই ওদের জন্যে একটা ফাঁদ হবে।'

'কিভাবে?'

'আপনাকে আমরা প্রথম ট্রাকে রাখব না,' বলল মির্জা। 'আপনার বদলে আমরা চারজন থাকব ক্যাবে, ওদের অপেক্ষায়। ট্রাক বহর শামুকের মত গুটিগুটি এগোবে। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে এলেও যাতে ধরতে পারে আমাদের। ট্রাকের পাশে যাকে দেখব আমরা তাকেই ঝাঁঝরা করে দেব।'

'আমিও তোমাদের মত একজন মুক্তিযোদ্ধা, একসময় সেনাবাহিনীতে মেজর ছিলাম,' মির্জা থামতে বলল রানা। 'হামলা হবে, এই ভয়ে আমাকে লুকাতে বলছ? শুধু এই র‍্যাপারটা ছাড়া তোমার প্ল্যানটা সত্যি খুব ভাল। তবে ট্রাকটা আমাকে চালাতে দাও, আর ক্যাবে শুধু তুমি থাকো।'

'বাকি সবাই?'

'ক্যাবের ছাদে,' বলল রানা। 'কারণ শত্রুরা ট্রাকের পিছনেও উঠতে পারে।'

'কিন্তু ট্রাক আপনি কেন চালাবেন?'

রানা জবাব দিল, 'কারণ আমার কাছে পিস্তল আছে, গুলি করতে এক হাত লাগে। তোমাদের কাছে আছে রাইফেল, গুলি করতে দু'হাত লাগে।'

'জনাব,' স্বীকার করল হামাস লীডার, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। বেশ, তবে তাই হোক।'

'আরেকটা কথা,' বলল রানা। 'তোমার লোকদের ডেকে বলো, শত্রুদের দেখলেই যেন কেউ গুলি না করে। তাদেরকে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, তারপর সারেন্ডার করতে বলতে হবে। গুলি করা যাবে সর্বশেষ উপায় হিসেবে। কারণ আমি ওদেরকে বন্দি করে কথা বলাতে চাই। কি বললাম, বুঝেছ?'

'জ্বী, জনাব।'

'গুড। যাও, এক ছুটে সব ড্রাইভারকে জানিয়ে এসো যে তিন মিনিটের মধ্যে আবার রওনা হচ্ছি আমরা। কেউ যদি না জেনে থাকে, তাকে জানাবার দরকার নেই যবর-এ-জালিম থেকে কারা এসেছে।'

'বহুত আচ্ছা, জনাব।'

তিন মিনিট পর হেডলাইট জ্বেলে কনভয় আবার রওনা হয়ে গেল। ওদের হিসেবে রানাকে যারা খুন করতে চায় তারা আর সাত মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

অচেনা বিপদসঙ্কুল পথে অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। ওর ডান দিকে গভীর খাত, দুর্ভাগ্যক্রমে ওই ডান দিকেরই হেডলাইটটা ঠিক মত আলো দিচ্ছে না দেখে শঙ্কিত বোধ করছে ও। জর্দান এয়ার ফোর্সের জেট ফাইটার আবার এদিকে টহলে এসে হেডলাইটের আলো দেখলে শেল ছুঁড়তে পারে, এই ভয় কিছুটা তো আছেই, তাই মির্জা তার ড্রাইভারদের বলে এসেছে সবাই যেন আলো না জ্বালে।

সব মিলিয়ে আঠারোটা ট্রাক, হেডলাইট জ্বলছে মাত্র পাঁচটায়। ফলে পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা কারনিসের ওপর সচল আলো ও ছায়ার একটা অদ্ভুত রকমের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে যেন। সেই আলোছায়ারই একটা অংশ হয়ে কালো চাদরে মুখ ঢাকা দশজনের দলটা ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেল কনভয়ের প্রথম ট্রাকের এক পাশে ও একটু পিছনে।

রানার ট্রাকের পিছনে ও ক্যাবের মাথায় ওরা আটজন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হামাস কমান্ডার আদেল আশরাফ। ক্যাবের মাথা থেকে একজন ঘোড়সওয়ারের বুকে রাইফেল তাক করল সে, তারপর কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল, 'হল্ট! হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঘোড়া থামাও!'

উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। আশরাফের খুলিতেই শুধু বুলেট ঢুকল

পাঁচটা। মুখ আর মাথার কোন অস্তিত্বই থাকল না।

শত্রুপক্ষের অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ থামেনি, রানার ট্রাক থেকে একযোগে গর্জে উঠল আটটা রাইফেল–ট্রাকের ছাদ আর পিছন থেকে গুলি করছে সাতজন, ক্যাব থেকে মির্জাও।

সজোরে ব্রেক কষে ট্রাক দাঁড় করাল রানা। এক সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে স্থির হলো গোটা কনভয়। বাকি তেরোটা হেডলাইটও প্রায় একই সঙ্গে জ্বলে উঠেছে। হামাস ড্রাইভাররা চিৎকার করে জানতে চাইছে, কার এত সাহস কনভয়ে হামলা চালাল? অনেকে প্রশ্ন করারও সময় নেয়নি, হাতে বাগিয়ে ধরা কালাশনিকভ বা একে/ফরটিসেভেন নিয়ে নেমে পড়ল ক্যাব থেকে, কনভয়ের সামনের দিকে ছুটে আসছে।

এ সময় আরেকবার গুলি ছুটল। ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠেছে ঘোড়সওয়ার শত্রুরা। নিচে নেমে অবোধ প্রাণীগুলোকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করল কয়েকজন। ইতিমধ্যে তাদের দু'জন মারা গেছে। বাকি ছ'জনের তিনজন ছুটল সামনে, প্রথম ট্রাকের ড্রাইভার সাইডে পৌঁছাতে চাইছে। দ্বিতীয় দলটা রুখে দাঁড়াল ছুটে আসা হামাস ড্রাইভারদের ঠেকাতে।

অসম সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্যাবের জানালা দিয়ে রাইফেলের ব্যারেল ও নিজের মাথা বের করে দিল মির্জা। রানার নির্দেশের কথা মনে রেখে শত্রুদের পা লক্ষ্য করে গুলি করছে সে। তার জান কবচ করার ইচ্ছে যদি না-ও থাকে, আজরাইলকে বাধ্য হয়ে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।

অকস্মাৎ লাগাম টানায় ঘোড়াগুলো লাফাচ্ছে, ঘোড়সওয়াররা নিশানা করতে পারছে না। তবে খুরের আওয়াজ এত কাছে, শুনেই রানা বুঝে ফেলল কি ঘটতে চলেছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মির্জাকে ক্যাবের ভেতর, সিটের নিচে টেনে নিল ও। যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ক্যাবের পাশে চলে আসা একজন

শত্রু। রাইফেলের ব্যারেল জানালা দিয়ে ক্যাবের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে, মাজল ঠেকাচ্ছে রানার বুকে। মাজলটা ধরে এক পাশে সরিয়ে দিল রানা, বগলের তলা দিয়ে বুলেটটা ক্যাবের অপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, একবারই গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। লোকটার ঘামে চকচকে হিংস্র চেহারা থেকে যেন আলো ঠিকরাচ্ছে, তবে হঠাৎ সেই আলো নিভে গেল—কারও খুলি উড়ে গেলে আর কি-ই বা আশা করা যায়।

পরমুহূর্তে মির্জা যেন ছেড়ে দেয়া স্প্রিং হয়ে উঠল। ক্যাবের দরজা খুলে লাফ দিল নিচে, তার পিছু নিয়ে রানাও।

ইতোমধ্যে প্রচুর গুলি বিনিময় হয়েছে হামাস যোদ্ধা আর শত্রুদের মধ্যে। আলোর কোন অভাব নেই, ঘোড়ার লাশগুলো গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ওরা, সেগুলোর ভেতর থেকে দু'একজন মানুষের হাত বা পা বেরিয়ে আছে।

কালো চাদরে মুখ ঢাকা এক লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে কারনিসের মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, রাইফেলটা খুঁজে না পেয়ে কোমর থেকে ছুরি টেনে নিল, মির্জার পিছনে সিধে হচ্ছে। দু'জনেই ওরা উত্তর দিকে মুখ করে রয়েছে।

রানা আর মির্জাকে ট্রাক থেকে নিচে নামতে দেখে হামাস যোদ্ধারা কেউ আর গুলি করছে না।

রানার মুখ পশ্চিম দিকে, মির্জা আর তার আততায়ী ওর ডান পাশে। কি ঘটতে যাচ্ছে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মির্জাকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই ওর। কারণ ওর সামনেও কালো চাদরে মুখ ঢাকা এক লোককে দেখা যাচ্ছে। তার রাইফেল রানার মাথাকে টার্গেট করেছে। রানার পিস্তলও টার্গেট করেছে লোকটার কপাল।

দু'জনের কেউ এক চুল নড়ছে না। মাঝখানের দশ হাত ব্যবধান কোন ব্যবধানই নয়, কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন

সম্ভাবনা নেই। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত দু'জন একসঙ্গে গুলি করে, অর্থাৎ কেউ বাঁচে না।

সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মির্জার পিছনে সিধে হলো তার আততায়ী, শক্ত মুঠোয় ধরা ছুরি কানের পাশে তুলল। নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে সে, তাকিয়ে আছে মির্জার পিঠের দিকে। মৃত্যু এত কাছে, দেখতে না পেলেও কিছু হয়তো টের পেয়েছে মির্জা, অদ্ভুত এক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে-ও স্থির হয়ে আছে। তবে জানে না পিছন থেকে ছুরি খেতে যাচ্ছে সে।

তারপর গুলি কাকে বলে! যেন একসঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত মেঘ থেকে বজ্রপাত শুরু হলো। শুধু নতুন আসা হামাস যোদ্ধা নয়, টার্গেট প্র্যাকটিসে যোগ দিয়েছে কনভয়ের সঙ্গে থাকা হামাস যোদ্ধারাও। একটানা দশ সেকেন্ড কানের পর্দা ফাটানোর আয়োজন। রানার সামনের লোকটার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না, তবে চোখে-মুখে অন্তত বিশটা বুলেটের গরম বাতাস পেয়েছে সে। হামাস যোদ্ধাদের টার্গেট ছিল রাইফেলটা, এক ঝাঁক বুলেট প্রথমেই সেটাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। মির্জার পিছনের লোকটার অবস্থাও তাই। তার হাতের ছুরি ছিটকে পড়েছে কোথায় যেন। সে-ও আহত হয়নি। হামাস যোদ্ধারা এগিয়ে এসে দু'জনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

লাশ পাওয়া গেল ছ'টা। বাকি দু'জনকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেল। ঘোড়া ও সঙ্গীদের লাশের ভেতর শুয়ে অভিনয় করছিল তারা মারা গেছে।

হামাস লীডার আদেল আশরাফের লাশ ক্যাবের ছাদ থেকে নামিয়ে মর্যাদার সঙ্গে চাদর দিয়ে ঢাকা হলো। নিহত ও জীবিত শত্রুদের টেনে আনা হলো প্রথম ট্রাকের সামনে, হামাস যোদ্ধারা তাদের পরিচয় জানতে চায় কাপড়চোপড়, গায়ের চাদর, পাগড়ি ইত্যাদি দেখে আগেই ধারণা পাওয়া গেছে এরা ফিলিস্তিনি সীমান্ত

এলাকার বিভিন্ন ট্রাইব-এর সদস্য। সনাক্ত করার জন্যে তাই ট্রাইবাল হেডম্যান চারজনকেও ডাকা হলো।

আবরুদি আলফাজ, তাকদির উসমান, কাসুরিয়া বায়উসি, ও মারকান কাসুরি–চার হেডম্যানেরই মন খুব খারাপ, প্রায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা। প্রথমে লাশগুলোর চেহারা দেখল তারা। চার হেডম্যানের দু'জন, আলফাজ ও বায়উসি, স্বীকার করল এরা তাদের গোত্রের যোদ্ধা।

এরপর বন্দি চারজন শত্রুর মুখ থেকে খোলা হলো গিট দিয়ে বেঁধে রাখা চাদর।

চার হেডম্যান প্রায় এক যোগে মাথা নত করল। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে বিস্ময়ে বিহ্বল মির্জা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'এই জীবিত চার খুনী আপনাদের চার গোত্রের লোক?'

হেডম্যানরা মাথা তুলল। তাদের চোখে আগুন জ্বলতে দেখল রানা। মির্জাকে তারা প্রায় একযোগে বলল, 'হ্যাঁ।'

পরমহূর্তে চার হেডম্যান, যেন কোন অদৃশ্য সংকেত পেয়ে, একসঙ্গে নড়ে উঠল; গর্জে উঠল তাদের হাতের চারটে রাইফেল। লাশগুলোই তাদের টার্গেট। আরও ক্ষতবিক্ষত ও কদর্য হয়ে উঠল ওগুলোর অবস্থা।

'স্টপ ইট!'

চার হেডম্যান থামল। কিন্তু তা মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে। অটোমেটিক রাইফেল ঘুরে গেল। তারপর আবার গর্জে উঠল। এবার তারা টার্গেট করল বন্দি লোকগুলোকে। প্রায় প্রত্যেকেই চিৎকার করে নিজেদের প্রচণ্ড আক্রোশ আর ঘৃণা প্রকাশ করছে।

'নে, যা, নরকে গিয়ে যত ইচ্ছে বেঈমানী করগে!'

'বিষাক্ত সাপ মারায় বড় আনন্দ!'

'টাকা যখন খেয়েছিস, নে, গুলিও খা!'

বাধা দেয়ার সময় পাওয়া গেল না, চার বন্দির শরীর প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে সব

ক'জন।

প্রচণ্ড ঘৃণায় থরথর করে কাঁপছে চার হেডম্যান। নিজের গোত্রের লোকদেরকে বিনা বিচারে এভাবেই তারা শাস্তি দিয়ে থাকে, সেজন্যে তাদেরকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে এক্ষেত্রে হবে।

রানা ভাবছে, বন্দি হত্যার ব্যাপারটার মধ্যে যদি কোন গোপন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, সেটা প্রমাণ করা সহজ হবে না। আরও কঠিন হবে হিসেব করে বের করা কে কতটুকু দায়ী। তবে ওর পক্ষে ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। হেডম্যানদের এরকম আনপ্রেডিক্টেবল আচরণ ওর প্ল্যানটাই ব্যর্থ করে দিতে পারে। মির্জা ও কয়েকজন হামাস যোদ্ধাকে একপাশে ডেকে নিয়ে এল ও।

'আমার ধারণা, ইচ্ছে করে সাক্ষীদের সরিয়ে ফেলা হলো,' বলল রানা। 'এটা একটা ষড়যন্ত্র।'

হামাস যোদ্ধারা বিস্মিত। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ভাবটা পরিষ্কার, রানা অবাস্তব অভিযোগ করছে।

তাদের হয়ে মির্জা বলল, 'ফিলিস্তিনি ট্রাইবগুলোর লোকজন সবাই মুসলমান। ওদের হেডম্যানরা যুগ যুগ ধরে স্বেচ্ছায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে আসছে...'

'এখানে কোটি কোটি ডলারের খেলা চলছে, মির্জা,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমি সবাইকে অভিযুক্ত করছি না, তবে এই বন্দি হত্যা মেনেও নিতে পারছি না।'

'আপনি তাহলে এখন কি করতে চান?' ধীরে ধীরে, সাবধানে জিজ্ঞেস করল মির্জা।

'আমি দেখতে চাই ওদের কারও কাছে কোন অস্ত্র নেই,' বলল রানা। 'হেডম্যান আর তাদের বারোজন সঙ্গী, সবাইকে নিরস্ত্র করো।'

মাথা নাড়ল মির্জা। 'অসম্ভব। এ-কথা ওদেরকে বলাই যাবে না।'

'কেন?'

'হেডম্যানরা অত্যন্ত সম্মানী মানুষ,' বলল মির্জা। 'আমাদের আচরণে ওদের বিরুদ্ধে এতটুকু অসম্মান প্রকাশ পেলে তার পরিণতি হবে মারাত্মক।'

'যেমন?'

'সীমান্তের ওপারে ওদের স্কাউট আছে, তারা ইজরাইলি সৈন্যদের মুভমেন্ট মনিটর করে,' বলল মির্জা। 'ওই স্কাউটদের সাহায্য ছাড়া সৈন্যদের এড়িয়ে নিরাপদে ফিলিস্তিনি গ্রামে পৌছানো সম্ভব নয়।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি তোমরা বলতে চাইছ গত তিন মাস ধরে যত কনভয় ধরা পড়েছে তার জন্যে এই স্কাউটরাই দায়ী?'

'তা তো আমরা বলতে পারব না,' বলল মির্জা। 'এর আগে কনভয়ের সঙ্গে আমরা ছিলাম না।'

'আমার ধারণা,' বলল রানা, 'স্কাউটরা নয়, দায়ী ওদের হেডম্যানরা। সবাই হয়তো নয়। খুব বেশি বেঈমান মোসাদের দরকারও নেই। প্রতিটি কনভয়ে একজন হলেই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আপনাকে যারা খুন করতে এসেছিল তাদের মধ্যে চার গোত্রের লোকজনই ছিল।'

'ট্রাইবাল লোকজন কি হেডম্যানকে না জানিয়ে কোন ক্রাইম করে না?'

মির্জা চুপ করে গেল।

'ওদেরকে নিরস্ত্র করাটা জরুরী, মির্জা,' আবার বলল রানা, এবার অত্যন্ত জোর দিয়ে।

সঙ্গীদের একবার দেখে নিয়ে মির্জা বলল, 'ঠিক আছে, বলে দেখতে পারি। তবে সার্চ করার কথা বলা সম্ভব নয়। বললেই ওরা বিদ্রোহ করে বসবে।'

'বেশ। সার্চ করার দরকার নেই। তবে বলো, আমি চাইছি

কারও কাছে কোন অস্ত্র থাকতে পারবে না।'

হেডম্যানদের কাছে ফিরে এল ওরা। মির্জার সশস্ত্র সঙ্গীরা এমনভাবে পজিশন নিল, যাতে গোলাগুলি শুরু হলে পরস্পরের জন্যে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাদেরকে এভাবে পজিশন নিতে দেখে বাকি হামাস সদস্যরা যা বোঝার বুঝে নিল। তারাও হাতের অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকল।

পরিস্থিতির উত্তাপ হেডম্যানরাও অনুভব করছে। সঙ্গে বডিগার্ড ও যোদ্ধারা থাকলেও, হামাস গেরিলাদের তুলনায় সংখ্যায় তারা কম। কাজেই বাধ্য না হলে সংঘর্ষে যেতে রাজি নয় তারা। রানা কি চায় মির্জার মুখে শোনার পর প্রচণ্ড রাগে হাতের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিল চার হেডম্যানই।

রানা অপেক্ষা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে আহত বা অপমানিত পক্ষ সাধারণত ঘোষণা করে যে মিশনের সঙ্গে তারা থাকবে না। অথচ এই চারজন সেরকম কিছু বলছে না। ওর মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি চারজনই টাকা খেয়েছে? তা না হলে এরকম অপমানিত হবার পরও কনভয়ের সঙ্গে থাকতে চাওয়ার মানে কি?

হেডম্যানদের ইঙ্গিতে তাদের বডিগার্ড ও যোদ্ধারাও যে-যার হাতের অস্ত্র ফেলে দিল। ফেলে দেয়া সবগুলো অস্ত্র থেকে বুলেট বের করে নিয়ে প্রথম ট্রাকের ক্যাবে তুলে সীটের নিচে ঢুকিয়ে রাখা হলো।

'এরপর কারও কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া গেলে তাকে শাস্তি পেতে হবে,' হেডম্যানদের উদ্দেশে রানা সরাসরি কথা বলছে। 'আমার আদেশ ও বিধি-নিষেধ কারও যদি পছন্দ না হয়, যবর-এ-জালিমে ফিরে যেতে পারে সে। দিন পনেরো হোটেলে খাওয়া ও থাকার খরচ ইয়াসির আরাফাতই দেবেন।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল মারকান কাসুরি। পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশ। হেডম্যানদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুদর্শন, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী। 'জনাব, আপনি আসলে

আমাদেরকে চেনেন না। আমাদেরকে আপনি যতই অপমান করুন, আমরা কনভয়ের সঙ্গে থেকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাব।'

'অ।' রানার চোখে-মুখে বিদ্রূপের ছাপ। 'তা সাক্ষী মেরে ফেলাও বুঝি সেই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?'

প্রশ্ন শুনে হাঁ হয়ে গেল মারকান কাসুরি। তবে এটা তার অভিনয় কিনা কে বলবে?

রানাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনল মির্জা। 'জনাব,' নিচু গলায় বলল সে, 'ওদেরকে খেপিয়ে তোলা ঠিক হবে না। আপনি বরং পরামর্শ দিন এরপর আমরা কি করব।'

'লাশ দাফন করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর খাওয়াদাওয়া আর ঘুম। কাল সকালে রওনা হলে আল শামায়রা গিরিখাদে রাতের মধ্যে পৌঁছানো যাবে না?'

'পথ খুবই দুর্গম, তবে কোন বাধায় থামতে না হলে রাত দশটার মধ্যে পৌঁছাতে পারব।'

শারিয়া সম্ভবত কাল ভোর রাতের দিকে আসবে, ভাবল রানা। 'গুড। শোনো, মির্জা, ঘরের শত্রু সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ। শুধু আজকের রাত নয়, প্রতিটি রাতে আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। পালা করে পাহারা দেব আমরা। প্রথম দলে আমাকে রেখো।'

'আপনি চোরাগোপ্তা হামলার আশঙ্কা করছেন?'

'কারও কাছে রেডিও বা মোবাইল ফোন থাকলেও আমি আশ্চর্য হব না,' বলল রানা। 'এখান থেকে সাহায্য চাওয়া হলে যবর-এ-জালিম বা অন্য কোথাও থেকে ওদের লোকজন আবারও চলে আসতে পারে।'

এই সময় ওর পকেটে ভাইব্রেশন শুরু হলো। স্যাটেলাইট ফোনে কোন কল এসেছে। সেটটা পকেট থেকে বের করে কানে তোলার আগে আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলিয়ে নম্বরটা দেখে

নিল। এটা সোহেলের নম্বর। প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে হলেও যোগাযোগ করেছে ও। 'হ্যাঁ, বল।' কথা বলতে বলতে হাঁটছে রানা। ফিরে এসে প্রথম ট্রাকের ক্যাবে বসল। সোহেলের প্রোগ্রেস রিপোর্ট খুবই ভাল। খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির আঠারোটা ট্রাক ভাড়া করেছিল সে, কিন্তু ওগুলোর ব্যাকলাইট আর হেডলাইটে ত্রুটি পাওয়া গেছে। কাউকে কিছু জানায়নি সে, তবে একটা জার্মান কোম্পানিকে অর্ডার দিয়েছে, আশা করছে আজকালের মধ্যেই নতুন আঠারোটা ট্রাক আম্মানে ডেলিভারি দেবে তারা। নিকোলাস পাপাডুলার সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছে সে। আগের প্ল্যান বদল করা হয়েছে, এ-কথা জানিয়ে গ্রীক আর্মস ডিলারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন তার অস্ত্র ও গোলা-বারুদ আম্মানের কাছাকাছি একটা পরিত্যক্ত খনিতে পৌঁছে দেয়। সোহেল থামতে রানাও নিজের প্রোগ্রেস রিপোর্ট শোনাল। আরও প্রায় মিনিট তিনেক পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

সামনের একটা পাহাড়ের ঢালে পাথুরে মাটি খুঁড়ে লাশ দাফনের আয়োজন চলছে, সেদিকে তাকিয়ে সোহেলের দেয়া তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করছে রানা। খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাকের হেডলাইট আর ব্যাকলাইটে ত্রুটি দেখা দেবে কেন? সে-সব ত্রুটি আবার এমন যে তাদের ট্রাক সোহেল ব্যবহার করতেই রাজি নয়?

হঠাৎ রানার একটা কথা মনে পড়ল। রাতে এই পাহাড়ী পথে ট্রাক চলে না জর্দান এয়ারফোর্সের রুটিন টহলের ভয়ে। ট্রাক চালাতে হলে হেডলাইট জ্বালতে হবে, হেডলাইট জ্বাললে জেট ফাইটারের পাইলট তা দেখতে পাবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আজ রাতের মত থামার পরও আবার রওনা হয় ওদের কনভয়, সেবার প্রথম ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে ছিল রানা নিজে। আলো জ্বালবার পর ও লক্ষ করে, ডানদিকের হেডলাইট

থেকে আলো খানিকটা কম বেরুচ্ছে, আলোর মাঝখানে কেমন যেন একটা ছায়া ছায়া ভাব।

নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই, ওই লাইটটা ওকে পরীক্ষা করতে হবে। না, 'আম্মান: ২০০৩'-এর কথাও রানা ভোলেনি।

ছয়

রাত জেগে সতর্ক পাহারা দেয়ার সময়ই গাঢ় অন্ধকারের ভেতর কনভয়ের প্রথম ট্রাকের হেডলাইট টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করল রানা। সঙ্গে কাউকে রাখেনি, কারণ হামাস গেরিলাদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও। হেডলাইটের কাঁচের আবরণ খুলতেই নিখোঁজ একশো ডলারের রহস্য উন্মোচিত হলো। কড়কড়ে নোটটা হেডলাইটের ভেতর রয়েছে। রয়েছে মানে, নোটটা দিয়ে কিছু একটা মোড়া হয়েছে। মোড়কের কাগজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে একশো ডলারের একটা নোট, ওবায়েদ খালিদের রসিকতাবোধের তারিফ না করে পারা যায় না। অন্তত রানার কোন সন্দেহ নেই যে এই কাজ অবশ্যই তার।

প্রশ্ন হলো, নোটটা দিয়ে কি জিনিস মুড়ে রেখে গেছে খালিদ? মোড়কটা আস্তে-ধীরে খুলল রানা। ভুল ওরও হতে পারে। এটা কোন ধরনের খুদে বোমা হওয়াও বিচিত্র নয়।

জিনিসটা দেড় ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা। চারকোনা আকৃতি। এরকম আগেও দেখেছে, তাই সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল রানা। এটা একটা ইলেকট্রনিক ক্লীপার–নিঃশব্দে সংকেত

পাঠাচ্ছে, বিশ মাইলের মধ্যে কোন রিসিভার থাকলে এই সিগন্যাল তাতে ধরা পড়বে।

ব্লীপারটা নিয়ে কি করতে হবে, সেটা রানার খুব ভালই জানা আছে। কিন্তু জিনিসটা হেডলাইটের ভেতর ঠিক কোথায় কি ভঙ্গিতে রাখা হয়েছিল, এটা জানার উপায় কি? খালিদ জিনিসটা কিভাবে এখানে আবিষ্কার করে, বেঁচে থাকলে একমাত্র সে-ই বলতে পারত। সে কি হেডলাইটের বালবের নিচে জিনিসটাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল? যেভাবে সে রেখে গেছে? নাকি টেপ দিয়ে আটকানো ছিল কোথাও? সেক্ষেত্রে টেপটা গেল কোথায়?

রানা সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবে পেয়েছে সেভাবেই রেখে যাবে, শুধু একশো ডলারের নোটটা থাকবে ওর মানিব্যাগে।

'আম্মান: ২০০৩'-এও তল্লাশী চালাল রানা। ওটার জোড়া হেডলাইটে কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ব্যাকলাইটে। একই জিনিস, ইলেকট্রনিক ব্লীপার ডিভাইস। এটাও রানা যেখান থেকে পেয়েছে সেখানে রেখে দিল। না, ডিভাইস দুটোর মেকানিজমে কোন রকম কারিগরি ফলায়নি ও, এমন কি খুলে পর্যন্ত দেখেনি।

ওর পালা শেষ হবার আগে আরও দুটো ব্লীপার খুঁজে পেল রানা। জায়গামতই থাকল সব, একটাও সরায়নি।

পরদিন সকাল থেকে শুরু করে, মাঝখানে মাত্র এক ঘণ্টার যাত্রাবিরতি, সেই রাত দশটা পর্যন্ত হেলেদুলে পিঁপড়ের একটা লম্বা সারির মত এগোল ওদের কনভয়, থামল একেবারে আল শামায়রা গিরিপথের শেষ মাথায়, যে জায়গাটাকে বলা হয় আজব আখীর আনজুমন্। আজব আখীর আনজুমন্-এর অর্থ হলো: বিস্ময়কর সর্বশেষ মিলনমেলা।

এখানে পাঁচটা গিরিপথ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে চওড়াটা বাঁ দিক থেকে এসেছে। জায়গাটা ঢেউ

খেলানো বালিয়াড়ির সমষ্টি। বালিয়াড়ির দু'পাশে পাহাড় আছে, তবে দূরত্ব আধ মাইলের কম নয়।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ক্লান্ত ড্রাইভাররা ঘুমোবার আয়োজন করছে। মির্জার সঙ্গে বসে পাহারা দেয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে আলাপ করছে রানা। হেডম্যান আর তাদের সঙ্গীরা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে থাকলেও, গত বিশ ঘণ্টায় কেউ তারা কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। তবে রানার ধারণা, তাদের কাছে পিস্তল ছাড়াও ছুরি ও গ্রেনেড থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত হলো, মির্জার গেরিলারা যতই ক্লান্ত হোক, পালা করে সবাইকেই পাহারা দিতে হবে। তবে তাদেরকে বলে দেয়া হলো, শাতিল শারিয়া ভোররাতে বা কাল সকালে পৌঁছালেও, সন্ধ্যার আগে কনভয় রওনা হবে না—অর্থাৎ বিশ্রাম ও ঘুমের জন্যে লম্বা একটা সময় পাবে তারা। শুনে সবাই খুশি হলো। হবে না-ই বা কেন, কেউ কি জানে ভোর রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে?

ঠিক মাঝরাতে, বারোটা পাঁচ মিনিটে, যবর-এ-জালিম থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে এল লুঁয়ে জাদিব। মনে মনে হাসল রানা, ভাবল—শারিয়ার আসার সময় হয়েছে, না এসে কি পারে সে!

মিষ্টভাষী, নম্র ও বিনয়ী জাদিব রানার প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা দিল, 'হাতে এত কাজ যে সত্যি আপনাদের সঙ্গে আমার যাওয়া চলে না। তবে শারিয়ার আপত্তিটাই আসল বাধা। সে আমাকে এ-ধরনের কোন মিশনে থাকতে দিতে চায় না। তার কথা হলো, অন্যত্র ফিলিস্তিনিদের জন্যে আরও অনেক বড় অবদান রাখতে পারব আমি।'

'শারিয়ার কথায় জোরাল যুক্তি আছে,' বলল রানা। 'আপনি ইন্টারন্যাশনাল ফিগারে পরিণত হয়েছেন, এ-ধরনের ভয়ানক মিশনের সঙ্গে ধরা পড়ে গেলে ফিলিস্তিনিদেরই ক্ষতি হবে।'

সুযোগ পেয়ে রানাকে চেপে ধরল জাদিব। 'তিনটে কলাম

লিখেছি–ওয়াশিংটন পোস্ট, টাইমস আর ডেইলি মিরর-এর জন্যে। প্লীজ, একটু পড়ে দিন।'

'পড়ে দিন মানে?' রানা ভাবছে, আমার অত সময় কোথায়!

'আসলে নিজের লেখার ভাল-মন্দ নিজের চোখে সেভাবে ধরা পড়ে না,' নরম, আবেদনের সুরে কথা বলছে জাদিব। 'রাতটা তো আমরা জেগেই কাটার, তাই না? আপনি পড়ুন, আমি আপনাকে নিজের হাতে কফি বানিয়ে খাওয়াব।'

জাদিব ঠিক টোপটাই ফেলেছে, রানার লোভ জাগল। 'এখানে আপনি কফি পাবেন কোথায়?'

চৌরাস্তার মাথার দিকে তাকাল জাদিব, যেদিকটায় তার যান্ত্রিক ফড়িং বসে রয়েছে। হেলিকপ্টারটার নাকে এখনও একটা লাল আলো মিটমিট করে জ্বলছে। 'ওটায় কফির আয়োজন তো আছেই, আরও আছে...'

'আরও কি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, থাক,' বলল জাদিব। রীতিমত আড়ষ্ট দেখাচ্ছে ওকে, যেন কোন অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে।

রানা নাছোড়বান্দা। 'থাক বললে শুনছি না। বলতে হবে আপনার কপ্টারে আর কি আছে।'

'বলব?' জাদিবের চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত একটা ভাব। 'আচ্ছা, বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে যে ব্যাপারটা কোন অবস্থাতেই শারিয়াকে জানাবেন না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'ঠিক আছে, জানাব না।'

'আপনিও কিন্তু মাইন্ড করতে পারবেন না।'

'উফ্! আপনি আমার ব্লাডপ্রেশার বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি বলুন।'

'কপ্টারে এক বোতল ব্র্যান্ডি আছে।' দ্রুত মাথা নাড়ল জাদিব। 'তাই বলে রোজ না, মাঝে মধ্যে খাই আর কি।' একটা আঙুল তুলে রানাকে সাবধান করে দিল। 'আপনি কিন্তু কথা

দিয়েছেন, শারিয়াকে জানাবেন না।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে রানা। তারপর বলল, 'কথা দিয়েছি? কই, আমার তো মনে পড়ছে না!'

দু'জনেই ওরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ জাদিবকে একটু গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখল রানা। 'না,' বলল সে, 'রানা, ব্যাপারটা সিরিয়াস। মদ খেতে দেখে প্রথমবার খুব রাগারাগি করেছিল শারিয়া। বলেছিলাম আর খাব না। তারপর আরেক দিন ধরা পড়ে যাই। সেদিন বিনা নোটিশে আমাকে চড় মারে সে।'

'যাকে ভালবাসেন সে যখন চায় না, ছেড়ে দিলেই পারেন,' বলল রানা।

জাদিবকে হঠাৎ শান্ত ও সিরিয়াস দেখাল। 'ছেড়ে না দেয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে। যতই ভালবাসি, সে-সব কোন মেয়েকে কোনদিন বলা যায় না। আর বললেও সে বুঝবে না। প্রথম কারণ, আমি মুসলমান হলেও, ধর্মীয় সমস্ত অনুশাসন মেনে চলতে পারি না। আমি একজন ফ্রেঞ্চ, মদ তৈরি করা ও পান করা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার গ্র্যান্ডফাদার মুসলমান হন, কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবসা ছাড়েননি। বাবা ব্যবসা ছেড়ে ভার্সিটিতে পড়িয়ে রোজগার করতেন, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় মদ্যপান চালিয়ে গেছেন। আমিও খাই, মাঝে-মধ্যে, খুব যখন টেনশনে থাকি। তবে মদ খেয়ে আমি কখনও মাতাল হইনি। হবও না। এবং সত্যি কথা বলতে কি, শারিয়াকে লুকিয়ে চিরকালই আমি এক-আধটু খাব।'

'আর কি কারণ?'

'এটাই সবচেয়ে বড় কারণ,' বলল জাদিব। চেহারা দেখে বোঝা গেল, মজার কিছু বলতে যাচ্ছে। 'শারিয়া এত কিছু করেছে, কিন্তু মদ খেতে কখনও আমাকে বারণ করেনি।'

"কিন্তু এই না বললেন মদ খাওয়ার অপরাধে আপনাকে চড়

মেরেছে?'

'হ্যাঁ, মেরেছে। বলেছে, আমার সামনে মদ খেতে তোমার লজ্জা করে না? আরও বলেছে–আর যদি কোনদিন নিজের চোখে দেখি যে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছ, ওই গ্লাস আমি তোমার মাথায় ভাঙব।' একটু থেমে রানাকে সে প্রশ্ন করল, 'আপনি অমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কেন? মদ খেতে দেখে খেপে যাওয়া এক কথা, আর খেতে নিষেধ করা আরেক কথা নয়? শারিয়া তো কখনও আমাকে বলেনি, এই, লুঁয়ে, লক্ষীটি, কসম খেয়ে বলো আজ থেকে তুমি আর মদ খাবে না। সে আসলে বলেছে আমি যেন তার সামনে ওই জিনিস না খাই।'

'তাই?' হেসে ফেলল রানা।

'তা না হলে আমি কি খেতাম?'

কৌতুক করার লোভটা সামলাতে না পেরে রানা বলল, 'ঠিক আছে, খান আপনি, শারিয়াকে আমি কিছুই বলব না। তবে আপনিও কিন্তু ওই দজ্জাল মেয়েটিকে বলতে পারবেন না যে কফির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি আমিও খেয়েছি।'

'হোয়াট!' রানার দিকে আঙুল তাক করল জাদিব, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তার সঙ্গে যোগ দিল রানাও।

রাত তখন প্রায় দেড়টা, ওর ওপর হামলার ঘটনাটা জাদিবকে জানাল রানা। তারপর বলল কিভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল হেডম্যানরা।

শুনে শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ জাদিব রেগে প্রায় আগুন হয়ে উঠল। রানাকে তিরস্কার করতেও ছাড়ল না সে। এত বড় দুটো ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ দেখা হওয়া মাত্র তাকে বলা হয়নি! তারপর সে জানতে চাইল, সবাইকে সার্চ করা হয়েছে কিনা। সার্চ করা হলে হেডম্যানরা বিদ্রোহ করবে, মির্জার এই যুক্তির কথা শুনে আরও অসন্তুষ্ট হলো জাদিব। রানাকে বলল, 'সবার আগে

তো দেখছি ওই মির্জাকেই আপনার সার্চ করা উচিত ছিল।' সে প্রশ্ন তুলল, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি অশিক্ষিত এবং বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন ট্রাইবাল হেডম্যানের দয়া আর করুণার ওপর নির্ভর করে চালাতে হবে? রানাকে আরও কঠোর হবার পরামর্শ দিল সে। বলল, ওর জায়গায় সে হলে ওদেরকে সার্চ না করার ঝুঁকি অবশ্যই নিত না। সবশেষে বলল, এ বিষয়ে কাল সকালে মির্জার সঙ্গে সে নিজেই কথা বলবে। এমন কি প্রয়োজন হলে হেডম্যানদের সঙ্গেও।

রাত জাগতে হলে কফি খুব কাজে আসে, সরঞ্জাম থাকায় রানাকে নিয়মিত সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে জাদিব। নিজেও মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে বরফ ভর্তি ব্র্যান্ডির গ্লাসে। সময় কাটাতে ওদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। রানা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জাদিবের লেখাগুলো পড়তে রাজি না হওয়ায়, জাদিব নিজেই সেগুলোর বাছা বাছা অংশ পড়ে শোনাল ওকে। শুধু মুখে নয়, মনে মনেও রানাকে স্বীকার করতে হলো যে জাদিবের কলমে ধার যেমন আছে, তেমনি যে-কোন সমস্যার গভীরে ঢুকে তা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তার প্রখর।

রাত চারটের দিকে রানা খেয়াল করল, শারিয়ার পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় যত এগিয়ে আসছে, জাদিবের ব্র্যান্ডি খাওয়ার মাত্রাও যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

'এই আপনার এক-আধটু খাওয়া?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা।

জাদিবের ঠোঁটে কাঁপা কাঁপা হাসি, বুঝতে অসুবিধে হয় না সাংঘাতিক নার্ভাস ফিল করছে সে। 'যদি জানতেন মাঝখানে ক'টা দিন আমার ওপর দিয়ে কি রকম চাপ গেছে। রামাল্লা থেকে নেতা যেদিন জানালেন যে শারিয়ার মিশন সম্পর্কে সব জেনে ফেলেছে মোসাদ, অথচ শারিয়ার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই, শুনে আমার শুধু পাগল হওয়া বাকি ছিল।'

'স্বাভাবিক।'

'ওই ক'টা দিন কোন কাজ করিনি, বোকার মত শুধু শারিয়ার মোবাইল ফোনের নম্বর টিপেছি,' বলল জাদিব।

'শারিয়া আসলে সিকিউরিটির কথা ভেবেই তার মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। আল্লাহর কাছে হাজারও শোকর, সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করার কারণেই মোসাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে শারিয়া।'

'শারিয়া কি আবার আপনাকে ফোন করেছে? নাকি ওই একবারই?'

'করেনি, সেজন্যে আমি খুশি,' ম্লান সুরে বলল জাদিব। 'ওর নিরাপত্তার দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? আবার খবর না পেয়ে মনটা ভারি উতলাও হয়ে আছে...' তার গলায় আওয়াজ ফুটছে না, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে থেমে গেল।

চারটে বিশ মিনিটে পাইলটকে ডেকে ব্র্যান্ডির আধ খালি বোতল, গ্লাস, ছোট বালতি ভর্তি বরফ ইত্যাদি সব আবার কপ্টারে পাঠিয়ে দিল জাদিব। একটা চুরুট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করল। রানাকে বলল, 'চুরুট কেন খাচ্ছি, জানেন? ব্র্যান্ডির গন্ধটা লুকাবার জন্যে। আর হাঁটাহাঁটি করছি নেশার ঘোরটা যাতে কেটে যায়।'

'দেখে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না যে আপনার নেশা হয়েছে,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'পা টলছে না, মুখে কথা বাধছে না।'

'ধন্যবাদ।' হাসছে জাদিব। 'পরীক্ষায় তাহলে নির্ঘাত আমি পাশ করব। এখন আপনি শুধু তাকে বলে না দিলেই হলো।'

'খুব, মানে, মারাত্মক সুন্দরী?' জানতে চাইছে যেন একটা ভিজে বিড়াল।

'মারাত্মক মানে! অতুলনীয় সুন্দরী।'

'তাহলে ভাই আপনাকে আমি কোন কথা দিতে পারছি না!'

রানার কৌতুকে হাসল জাদিব, তবে তাতে প্রাণ নেই, বেশিক্ষণ টিকলও না। রানা বুঝতে পারছে, শারিয়া নিরাপদে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই টেনশন তার কাটবে না।

তারপর কনভয়ের মাঝামাঝি কোথাও থেকে হামাস গেরিলাদের কেউ একজন আজান দিল। মির্জা আর তার দলের তিনজন গেরিলা রানা ও জাদিবকে পাহারা দিচ্ছে, বাকি সবাই নামাজ পড়বার জন্যে কনভয়ের পিছন দিকে চলে গেল।

নামাজ শেষ হতে কেউ আর ট্রাকে উঠল না, চৌরাস্তায় এসে হেলিপ্টারের সামনে ভিড় জমাল সবাই, যদিও ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। কারণ আর কিছুই নয়, বাম দিকের ঢেউ খেলানো পথটা এখান থেকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায়। আর এই সংবাদ তো কারুরই অজানা নয় যে ভোরের আলো ফোটার সময় এই পথ ধরেই শাতিল শারিয়ার পৌঁছানোর কথা।

শারিয়াকে দু'একজন হামাস গেরিলা ছাড়া আর কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। তবে তার সম্পর্কে সবারই সব কিছু জানা। শারিয়ার সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে ফিলিস্তিনিদের মহান নেতা ইয়াসির আরাফাতের আপনজনদের অন্যতম। তাঁর কোলে-পিঠে চড়েই মানুষ হয়েছে মেয়েটা। তাঁকে বাবা বলে ডাকে। এর বেশি আর কিছু জানার দরকার করে না। এতেই সবাই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট। শারিয়াকে তারা একাধারে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে। হামাস গেরিলারা তো বটেই, ট্রাইবাল লোকজনের বেলায়ও কথাটা সত্যি। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের কথা আলাদা।

পাঁচ গিরিপথের মাথায় ভোরের আলো ফুটল অসম্ভব অলস একটা ভঙ্গিতে। আকাশে মেঘ আছে, নিচে আছে জোরালো বাতাস। বালিময়, পাথুরে এলাকায় বাতাসের ভাষা পরিবেশের মতই, যেমন রুক্ষ তেমনি ধারাল। শুধু আজ নয়, আগেও রানা লক্ষ করেছে—শুকনো বালি, পাথুরে পাহাড় কিংবা দুর্গ-প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুটে যাবার সময় অদ্ভুত একটা হাহাকার ধ্বনি ওঠে

বাতাস থেকে, শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এ বোধহয় অতৃপ্ত কোন আত্মার বিলাপ।

অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি, অস্পষ্টভাবে দেখা গেল একটা কাফেলা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো—এক সারিতে পাঁচটা মরু জাহাজ। প্রথম উটের পিঠে লাল সিল্ক কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সুদৃশ্য একটা হাওদা। হাওদা সাধারণত হাতির পিঠেই দেখা যায়, উটের পিঠে এই প্রথম দেখছে রানা। পিছনের বাকি চারটে উটের পিঠে বসে আছে একজন করে লোক। বালুঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শরীর ও মুখ চাদরে ঢেকে রেখেছে তারা। পাঁচটা উটই দীর্ঘ এক প্রস্থ রশির সঙ্গে বাঁধা, সেটার একটা প্রান্ত রয়েছে প্রথম উটের দশ হাত সামনে এক লোকের হাতে। লোকটার পরনে হিযবুল্লাহ্ গেরিলার ইউনিফর্ম। সে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসছে। এরপর দেখা গেল একই আকৃতির আরেকটা কাফেলা, পঞ্চাশ গজ পিছনে।

রানার মনে পড়ল, ইয়াসির আরাফাত ওকে বলেছিলেন, পথের কোথাও থেকে কিছু গেরিলাকে জুটিয়ে নিতে পারে শারিয়া। তাই বলে এত লোক? তারপর রানা হিসেব করল—না, লোক বেশি আর কোথায়। হাওদায় শারিয়া নিশ্চয় একাই আছে; তাকে বাদ দিলে সব মিলিয়ে নয়জন পুরুষ।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ওরা, রানা ও জাদিব। দিনের আলো একটু একটু করে ফুটছে, দু'ভাগে বিভক্ত কাফেলাটাও এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একবার প্রথমটা বালিয়াড়ির আড়ালে একটু একটু করে পুরোটাই হারিয়ে গেল। খানিক পর দ্বিতীয়টাও। তারপর আবার একে একে উঠে এল পরবর্তী বালিয়াড়ির মাথায়। ওটাই শেষ বালিয়াড়ি।

রানা ও জাদিবের সামনে লোকজন গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওদের। লোকজনও খুব চাপের মধ্যে আছে, কারণ শারিয়ার নিরাপত্তার

কথা ভেবে মির্জার নেতৃত্বে হামাস গেরিলারা তাদের পথ রোধ করে একটা কঠিন পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না।

রানা ও জাদিব অতি কষ্টে ওই পাঁচিলটার কাছে এসে পৌঁছাল। প্রথম কাফেলা ওদের কাছ থেকে এখনও পঞ্চাশ থেকে ষাট গজ দূরে। ভোরের আলো এখনও ম্লান। পায়ে হাঁটা লোকটার চেহারাই পরিষ্কার নয়, উটগুলোর পিঠে বসা লোকগুলো তো আরও দূরে।

হয়তো বাতাসেই, কিংবা কোন হাত দায়ী, হাওদা একটু ফাঁক হলো। এক সেকেন্ডও নয়, পলকের জন্যে রূপসী এক রমণীকে দেখা গেল কি গেল না, আবার বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা। দ্রুত চোখ থেকে চশমা খুলে শার্টের কিনারা দিয়ে মোটা লেন্স মুছছে জাদিব, ব্যাকুল গলায় রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'দেখলেন নাকি, শারিয়াকে দেখলেন?'

মাথা নাড়ল রানা। জাদিবের অস্থিরতা উপলব্ধি করতে পারছে ও। গলা চড়িয়ে মির্জার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বলল, 'অন্তত মঁশিয়ে জাদিবকে একটা সুযোগ দাও। উনি অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসুন শারিয়াকে।'

'দূর!' হেসে ফেলল জাদিব। 'ও তো এসেই পড়েছে।'

মির্জা দূর থেকে বলল, 'ঠিক আছে। মঁশিয়ে জাদিব, আপনি আগে বাড়ুন।'

জাদিবের একটা বাহু ধরল রানা। 'চলুন, আপনি নিজে শারিয়ার হাত ধরে হাওদা থেকে নামাবেন। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।' জাদিব পুরোপুরি রাজি নয়, তবে তাকে টান দিয়ে হামাস-এর তৈরি মানব-বন্ধনের বাইরে বের করে আনল রানা। 'আরে, ভাই...'

রানার কথা শেষ হলো না, ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

অকস্মাৎ যেন রোদ ঝলমলে দুপুর হয়ে গেল চারদিক, প্রায়

সেই মুহূর্তেই শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। শক ওয়েভের ধাক্কায় বালির ওপর আছড়ে পড়ল মানব-বন্ধন, ওপারে ভিড় করা প্রায় সব ক'জন মানুষ, এপারে রানা ও জাদিব।

চারদিক চোখ-ধাঁধানো দুপুর হয়ে ওঠার কারণ প্রথম উটের পিঠে, হাওদার ভেতর, যেন একটা সূর্যের বিস্ফোরণ ঘটেছে। অন্তত লাল ও কমলা আগুনের ঝলসে ওঠার এটাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বর্ণনা। আক্ষরিক অর্থেই প্রায় সব কিছু তুলোর মত উড়ে গেল। হাওদা, হাওদার ভেতর শারিয়া, উটটা, দশ গজ সামনে ইউনিফর্ম পরা হিযবুল্লাহ্ পথ-প্রদর্শক, হাওদার পিছনে বাকি চারটে উট ও চার আরোহী, সব একসঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে এমন বদলে গেল যে দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই যে নিশ্চিত হয়ে বলে কোনটা কি ছিল। মানুষ ও উটের কোন চিহ্ন নেই। হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। মানুষ ও পশুর মাংস এক হয়ে বালিমাখা ভর্তায় পরিণত হয়েছে।

গলা কেটে ছেড়ে দেয়া মুরগীর মত ঘন ঘন লাফাচ্ছে লুঁয়ে জাদিব। পুরু লেন্সে বালি, সেদিকে খেয়াল নেই। ফোঁপাচ্ছে, চোখ দুটো থেকে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে। 'শারিয়া! শারিয়া!' বিড় বিড় করছে সে। রানা বাধা দিতে গিয়েও কি মনে করে সরিয়ে নিল হাতটা।

দাঁড়াল রানা, কয়েক পা হেঁটে ঝুঁকল, হাত ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল জাদিবকে। মুহূর্তের জন্যে রানার কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে বাচ্চা ছেলের মত হু-হু করে কেঁদে ফেলল সে তারপর রানাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে এগোল।

'কোথায় যাচ্ছেন?' রানা তার পাশেই থাকছে। ও জানে, জাদিবের আশা পূরণ হবার নয়। শারিয়ার লাশ তো দূরের কথা, তার এমনকি একটা আঙুলও খুঁজে পাওয়া বা সনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

আহত পশুর মত একটা আওয়াজ করল জাদিব। ওটাই তার

জবাব, কি বলতে চায় বোঝার চেষ্টা করা বৃথা।

রানার মনে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছে। বোমাটা ফাটল কিভাবে? হাওদার ভেতর ওটা কি কোন টাইম বোমা ছিল? ক্ষনভয় সহ কাফেলা উড়িয়ে দেয়ার মোসাদ চক্রান্ত?

কাফেলার দ্বিতীয় অংশটা পঞ্চাশ গজ পিছনে ছিল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় উটসহ আরোহীরা ছিটকে পড়েছে বালিতে। তবে ধুলো-বালির মেঘের ভেতর, ভোরের অস্পষ্ট আলোয়, উট ও লোকগুলোকে অলস একটা ভঙ্গিতে নড়াচড়া করতে দেখছে রানা, কেউ কেউ দাঁড়াতেও পারছে।

রানার মনে সেই একই প্রসঙ্গ–নাকি বোমাটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়েছে?

হঠাৎ খেয়াল হতে রানা দেখল, বালির ওপর বসে রক্তাক্ত একটা মাংসপিণ্ডকে বুকে তুলে নিয়েছে জাদিব। থেঁতলানো সেই মাংসের গায়ে হাত বুলাচ্ছে সে। চোখ বুজে দুলছে সে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। ঘুরে তার সামনে চলে এল রানা। প্রায় চমকে উঠে লক্ষ করল, একটা মানুষের উরু ধরে আছে জাদিব–হাঁটু সহ ওপরের দিকটা, খুব বেশি হলে দেড় ফুট। গঠন ও লোম দেখে রানার ধারণা হলো, এই পা কোন মেয়ের নয়। জাদিবের আচরণে পাগলামির ভাব স্পষ্ট। 'এ আপনি কি করছেন!' প্রায় ধমকের সুরে বলল রানা। 'ছেড়ে দিন ওটা। উঠে আসুন। ওই পা শারিয়ার নয়।'

'শারিয়ার নয়?' হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল জাদিবের। রক্তাক্ত পা ফেলে দিয়ে রানার বাড়ানো হাত ধরে দাঁড়াল। 'চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন! টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো করি।'

'মানে?'

'আপনি জানেন না? শারিয়া আম্মাকে বলেছিল, দেশের মাটিতে মরতে চায় সে। আর যদি অন্য কোথাও মারা যায়, তার লাশ যেন যেভাবেই হোক রামাল্লায় পাঠিয়ে দেয়া হয়–ওখানকার

কবরস্থানে শুয়ে থাকবে সে।'

'এখানে আপনি কোথায় পাবেন তার লাশ?' এই মুহূর্তে জাদিবের মানসিক বিপর্যয় রানার প্রথম বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে কিভাবে কি ঘটল, তাতে কারও কোন ভূমিকা আছে কিনা জানতে হবে ওকে।

মির্জা আর তার সঙ্গীরা ছুটে যাচ্ছে কাফেলার দ্বিতীয় অংশের লোকজনকে সাহায্য করতে। তাকে ডেকে রানা বলল, 'সবাই নয়, প্রথমে দু'জন যাও তোমরা। ওই পাঁচটা উটের ওপর বাক্স বা পোঁটলা যা পাও সব খুলে দেখো কোন বোমা আছে কিনা।'

'জ্বী, জনাব!' বলে আবার ছুটল মির্জা, নিজের লোকদের চিৎকার করে থামতে বলছে।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে জাদিবের হাত ধরে টান দিল রানা। তার হেলিকপ্টারের পিছনে কার্গো তোলার জন্যে প্রচুর জায়গা আছে। জাদিবই ওকে জানিয়েছে, ইটালিয়ান রেড ক্রস-এর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কার্গো কপ্টার ছিল ওটা, ওষুধ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হত। কপ্টারে তুলে ওখানে তাকে শুইয়ে দেবে রানা। ট্যাঙ্কুইলাইজার খাওয়ানোর দরকার নেই, খাওয়ানো চলেও না, পেটে যে পরিমাণ ব্র্যান্ডি পড়েছে তাতে এমনিতেই ঘুম চলে আসার কথা।

কপ্টারের দিকে এগোবার সময় হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডেরা ওদেরকে পথ ছেড়ে দিল ঠিকই, তবে তাদের বিরূপ ও বৈরী দৃষ্টির আঁচ অনুভব করল রানা। অস্ত্র চেয়ে নেয়া হয়েছে, ওর ওপর রাগের সেটাই বোধহয় কারণ। তাই বলে তারা কেউ বিপদে পড়া লোকজনকে সাহায্য করতেও যাবে না?

পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, তবে লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসার পরও ঘাড়ের পিছনে তাদের দৃষ্টি অনুভব করছে ও। এই সময় ছুটতে ছুটতে ওদের পাশে চলে এল কপ্টারের পাইলট আলমগীর।

কন্টারের দরজা খুলে জাদিবকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। কন্ট্রোলের একটা সুইচ অন করে এয়ারকুলিং সিস্টেম চালু করল। কমপিউটর, ফ্যাক্স-মেশিন, ছোট্ট একটা ফ্রিজ, এক ডজন ব্র্যান্ডির বোতল সহ কাঠের একটা বাক্স রাখার পরও স্ক্রু দিয়ে আটকানো একটা কট-এর জায়গা হয়েছে। সেই কট-এর ওপর জাদিবকে শুইয়ে দিয়ে রানা বলল, 'চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আলমগীরকে পাহারায় রেখে যাচ্ছি। খানিক পর সময় করে একবার দেখে যাব।'

রানার একটা হাত চেপে ধরল জাদিব। চশমার লেন্সে বালি লাগায় নাক থেকে খুলে ফেলেছে সে, ভেজা চোখ দুটো টকটকে লাল দেখাচ্ছে। 'শারিয়াকে ওরা আমার সামনে মারল। এই কাজ ওরা ইচ্ছা করে করেছে। আমি মোসাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছি, এটা তার প্রতিশোধ।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে এ-ও হতে পারে যে শারিয়ার সঙ্গে আপনাকেও মারতে চেয়েছিল ওরা।'

'ওটা কি টাইম বোমা ছিল?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'তবে বেশিরভাগ সম্ভাবনা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়েছে।'

'হায় আল্লাহ!' কটের ওপর ঝট করে উঠে বসল জাদিব। 'তারমানে আমাদের মধ্যে কেউ বেঈমান আছে! অথচ আপনি আমাকে ঘুমাতে বলছেন?' কট থেকে নামতে গেল সে।

রানা তাকে জোর করে শুইয়ে দিল আবার। 'এ-সব ব্যাপার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। মির্জাকে সঙ্গে নিয়ে যা করার আমিই করছি।'

আর সময় দেয়া যায় না, পাইলট আলমগীরকে পাহারায় বসিয়ে রেখে অকুস্থলে ফিরে এল রানা। ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ি, সুটকেসের ঢাকনি, ভাঙা কাঁচ, মানুষ ও পশুর বিচ্ছিন্ন পা ও মুণ্ডু ইত্যাদির মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, একমাত্র ও-ই জানে

কিসের আশায়। এই সময় ছুটে এসে মির্জা জানাল, 'পিছনের কাফেলায় কোন বোমা বা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি, জনাব। ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, বোমাটা কিভাবে ফাটল বা কোথায় ছিল। কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'বলতে পারছে না মানে?'

'ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে আছে, জনাব!' মির্জা বিস্মিত ও বিমূঢ়। 'শারিয়াকে চোখের সামনে এভাবে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে।'

'ধাক্কাটা সামলে উঠুক, তখন জেরা করব,' বলল রানা। 'তোমার কি ধারণা, মির্জা? ওটা কি ধরনের বোমা ছিল?'

কোন সংশয় নেই মনে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হামাস গেরিলা লীডার, 'রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়েছে, জনাব।'

'কি করে নিশ্চিত হলে?'

'সময়টা বিশ্লেষণ করে,' বলল মির্জা।

'কি রকম?' রানার কৌতূহল বাড়ছে।

'ঠিক যখন আপনাদের দু'জনকে হাওদার দিকে এগোবার সুযোগ দিলাম, আপনি মঁশিয়ে জাদিবকে নিয়ে ওদিকে পা বাড়ালেন, অমনি বিস্ফোরণটা ঘটল। কেন, আগে কেন ঘটেনি? কিংবা পরে? পরে ঘটলেই তো বেশি যুক্তিসঙ্গত হত, কারণ হামাস গেরিলাদের খুন করার সুযোগ মোসাদ কখনোই ছাড়ে না।'

'তাহলে পরে কেন ফাটেনি?'

'ফাটেনি আপনাকে আর মঁশিয়ে জাদিবকে মোসাদ জ্যান্ত ধরতে চেয়েছে বলে,' জবাব দিল মির্জা। 'এখানে তাদের এজেন্ট আছে, তাদের ওপর নির্দেশ আছে—মাসুদ রানা আর লুঁয়ে জাদিবকে খুন করা যাবে না।'

'জ্যান্ত ধরতে চাওয়ার কারণ?'

'মঁশিয়ে জাদিবের হাড়গোড় গুঁড়ো করবে, কারণ ইজরাইলের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মিডিয়াতে একাই যুদ্ধ করে চলেছেন তিনি।

আর আপনাকে তাদের জ্যান্ত দরকার···ঠিক জানি না কেন, সম্ভবত আপনি ওদের অনেক গোপন তথ্য জানেন, তাই–ধরে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট করবে।'

মির্জার এই ব্যাখ্যা সবটুকু উড়িয়ে দেয়ার মত নয়, মনে মনে স্বীকার করল রানা। 'তোমার কোনও ধারণা আছে, রিমোট কন্ট্রোলটা কার কাছে ছিল? মোসাদের এজেন্ট হিসেবে কে বা কারা এখানে কাজ করছে?'

মির্জা মাথা নাড়ল। শোনা গেল, 'আমার খানিকটা ধারণা আছে।'

দু'জনেই ওরা চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে ওদের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাইবাল হেডম্যান কাসুরিয়া বায়উসি। হেডম্যানদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বয়স্ক, বাষট্টি কি তেষট্টি বছর বয়স।

'হ্যাঁ, বলুন,' উৎসাহ দিল রানা। 'কে বা কারা এখানে মোসাদের এজেন্ট?'

'কারা বলতে পারব না,' বৃদ্ধ বায়উসি জবাব দিল। 'আমি কাউকে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করতেও দেখিনি। তবে রোমাটা ফাটবার দু'মিনিট পর, সবাই যখন হায়-হায় করছে, নিজের চোখে দেখলাম উলফাত আসমার বালির তলায় কি যেন পুঁতে রাখছে।'

'আপনি তার চোখে ধরা পড়ে যাননি তো?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে অত কাঁচা লোক ভাববেন না, জনাব,' জবাব দিল বায়উসি। 'বোমার ধাক্কায় পড়ে যাবার পর সবাই একটু পর উঠে দাঁড়ালেও, আমি ইচ্ছে করে পড়ে থাকি। উদ্দেশ্য ছিল কে কি করে দেখা।'

'আপনার তাহলে আগেই সন্দেহ হয় যে···'

'কি বলেন সন্দেহ হবে না!' পাকা ও ঘন ভুরুর ভেতর হেডম্যান বায়উসির চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। 'ওবায়েদ

খালিদ খুন হয়নি? আপনারা আমাদের সবার অস্ত্র চেয়ে নেননি? এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে...'

'নিজের চোখে দেখলেন উলফাত আসমার বালির নিচে কিছু একটা পুঁতে রাখছে, তারপর?'

'তারপর আবার কি। জায়গাটা চিনে রাখলাম। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম কখন কথাটা আপনাকে জানাব। গেরিলাদের সবাই যে-যার ট্রাকে ফিরে যাচ্ছে দেখে চলে এলাম আপনার কাছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল হেলিকপ্টারের সামনে সত্যি এখন আর কেউ নেই। 'উলফাত আসমার কার বডিগার্ড?' মির্জাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাকদির উসমানের,' বলল মির্জা, তারপর হেডম্যান বায়উসিকে জিজ্ঞেস করল, 'আসমার এখন কোথায়?'

'আসার সময় দেখলাম গান শুনতে শুনতে একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল—সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে।'

'গান শুনতে শুনতে মানে?' রানার মাথার ভেতর অ্যালার্ম বেজে উঠল।

'ওর কাছে ছোট্ট একটা ট্র্যানজিস্টর রেডিও আছে, সিগারেট প্যাকেটের চেয়ে বড় নয়,' বলল বৃদ্ধ হেডম্যান। 'আওয়াজ বোধহয় খুব কম বেরোয়, তাই কানে চেপে ধরে গান শোনে।'

ছোট্ট ওই রেডিওটার সাহায্যে আসমার যদি মোসাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'কাউকে বলেননি তো, আপনি কি দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল বায়উসি।

'বেশ, আপনি আমাদেরকে ওখানে নিয়ে চলুন,' বলল রানা।

'কোথায়? রিমোট যন্ত্রটার কাছে? নাকি আসমারের কাছে?'

'চলুন আগে দেখি সত্যি ওটা রিমোট যন্ত্র কিনা।'

অকুস্থল থেকে ফিরে আসছে ওরা, এই সময় রানার চোখে

ধরা পড়ল জিনিসটা।

বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে দুটো হাড়। হাড়ের সঙ্গে মাংসও আছে। রানা থামত না, কিন্তু হাড় ও মাংসের সঙ্গে সরু একটা তার দেখতে পেল ও। 'মির্জা, ওঁকে নিয়ে তুমি এগোও, আমি আসছি।' আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল ও। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মির্জা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেডম্যান বায়উসিকে পাশে নিয়ে আবার হাঁটা ধরল।

পা দিয়ে বালি সরাল রানা। প্রায় কব্জি পর্যন্ত বালির নিচে ডুবে ছিল, কোন পুরুষমানুষের একজোড়া হাত। হাত দুটো এক করে তার দিয়ে বাঁধা রয়েছে, কব্জির একটু ওপরে।

ওদের পিছু নেয়ার সময় রানাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাল। প্রথম কাফেলার সঙ্গে উটের আরোহীরা তাহলে বন্দি ছিল! এই বন্দিদের পরিচয় কি? শারিয়ার হাতও কি এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল? এ-সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দ্বিতীয় কাফেলার ওই পাঁচজন লোক জানে। তাহলে তাদের বোবা বনে যাওয়াটা কি অভিনয়? ওরা মোসাদ এজেন্ট? সেজন্যেই নিরাপদ দূরত্বে ছিল? বোমা ফাটলে যাতে গায়ে আঁচড়টিও না লাগে?

আসার সময় বিচ্ছিন্ন হাত দুটো বালির নিচে পুঁতে রেখে এসেছে রানা।

উলফাত আসমার তার গোপন জিনিসটা হেলিকপ্টারের কাছাকাছি পুঁতেছে। রানা যখন পৌঁছাল, হেডম্যান কাসুরিয়া বায়উসির দেখিয়ে দেয়া জায়গাটা খুঁড়ে ফেলেছে মির্জা। গর্তের ভেতর থেকে তার হাত বেরিয়ে এল, সেই হাতে সত্যি একটা যন্ত্র। জিনিসটা দেখতে টিভি অপারেট করার রিমোট কন্ট্রোলের মতই। মির্জার হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। হ্যাঁ, এটা একটা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসই বটে। আমেরিকান এক কোম্পানির তৈরি, ব্যবহার বিধি গায়েই লেখা রয়েছে।

'আমরা আগে আসমারকে ধরব, না হেডম্যান তাকদির

উসমানকে?' জানতে চাইল মির্জা।

'তাকদির উসমানকে কেন ধরা হবে?' প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ হেডম্যান বায়উসি। 'তাকে তো আমরা কোন অপরাধ করতে দেখিনি!'

'প্রশ্নটা আমি আপনাকে করিনি,' মির্জা শান্ত সুরে বলল, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

রানা কিছু বলবার আগে হেলিকপ্টারের দরজায় দেখা গেল লুঁয়ে জাদিবকে। বোঝাই যায় যে সে ঘুমাতে পারেনি। 'যা শুনলাম তাতে আর বুঝতে বাকি নেই আমার কি ঘটেছে। ওদের সবাইকে ধরতে হবে।' কপ্টার থেকে নেমে এল সে, ট্রাক বহরের দিকে এক রকম ছুটছেই বলা যায়।

জাদিবের পিছু নিল রানা, মির্জা ও বায়উসি ওর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছে।

কনভয়ের মাথা থেকে গুণতে গুণতে পিছন দিকে এগোলে এগারো নম্বর ট্রাকটায় থাকার কথা তাকদির উসমানের। সে একা নয়, ড্রাইভার হিসেবে ওই ট্রাকে একজন হামাস গেরিলা থাকে। তবে এই মুহূর্তে ট্রাক বহরের কোন ড্রাইভারই ট্রাকে নেই, মির্জার নির্দেশে আহতদের শুশ্রূষা করতে গেছে তারা।

মির্জার কাছে তালিকা আছে, সেটা দেখে জানা গেল উলফাত আসমার ছিল সাত নম্বর ট্রাকে। হেডম্যান তাকদির উসমানের বাকি দু'জন বডিগার্ড আছে তেরো আর ষোলো নম্বর ট্রাকে।

সাত নম্বর ট্রাকে কাউকে পাওয়া গেল না। কেউ নেই এগারো নম্বর ট্রাকেও। বারো নম্বর ট্রাক থেকে নেমে এসে আরেক হেডম্যান, আবরুদি আলফাজ, জানতে চাইল, 'আপনারা কাকে খুঁজছেন?'

'শারিয়ার খুনীকে!' শান্ত, নির্বিরোধী, মিষ্টভাষী লুঁয়ে জাদিবকে চেনা যাচ্ছে না। রাগে কাঁপছে সে, চিৎকার করছে, চোখ দুটো ভেজা ভেজা। 'কোথায় উলফাত আসমার? কোথায় তার হেডম্যান

তাকদির উসমান?'

ভয়েই হোক বা সমীহ দেখিয়ে, জাদিবের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল আবরুদি আলফাজ। অপর একজন হেডম্যান, মারকান কাসুরি, সে-ও তার বডিগার্ডদের নিয়ে ওদের পিছু পিছু আসছে। আশ্চর্য! মির্জার প্রশ্নের উত্তরে সবাই তারা বলছে, তাকদির উসমান বা তার তিন বডিগার্ডকে অনেকক্ষণ হলো তারা দেখেনি।

তবে জলজ্যান্ত চারজন মানুষ তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। কনভয়ের কোথাও যখন তাদেরকে পাওয়া গেল না, রানার নির্দেশে আশপাশের এলাকায় খোঁজ নিতে হামাস গেরিলাদের পাঠাল মির্জা। তাদেরই একজন খবরটা নিয়ে এল।

বাঁকের ওদিকটায় একটা গিরিপথ আছে, এই তো পাঁচশো গজ দূরে, নাম শয়তানের গহ্বর। ওটার গভীরতা প্রায় আটশো ফুট, তবে প্রস্থ সামান্যই, মাত্র চল্লিশ ফুট। ওই গহ্বর বা খাদ পার হওয়ার জন্যে কাঠের একটি পুরানো সেতু আছে। ওই সেতু পার হয়ে পালাতে গিয়ে নিচে পড়ে ইহজগৎ ত্যাগ করেছে হেডম্যান তাকদির উসমান আর তার তিন বডিগার্ড। কি? সম্ভব নয়?

গহ্বরের কিনারায় পৌঁছে রানা দেখল, সেতুটা সত্যি ভেঙে পড়েছে। খাদের নিচে শুকনো নালার ধারে চারটে পুতুল আকৃতির কাঠামো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে—এত ওপর থেকে কারও চেহারা পরিষ্কার বোঝা না গেলেও, তারা যে তাকদির উসমান আর তার তিন বডিগার্ড, তাতে কারও কোন সন্দেহ থাকল না।

জাদিব জিজ্ঞেস করল, 'ওরা পালাচ্ছিল?'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা, তবে এ-কথা কাউকেই বলল না যে ওর ধারণা চারটে লাশের মাথায় বা বুকে বুলেটের ক্ষত পাওয়া যাবে। তবে যে-সব প্রশ্নের উত্তর ওর জানা নেই তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো—সবার লাশ দেখার পরই কি উলফাত আসমারের বিরুদ্ধে রানার কাছে অভিযোগ

করতে গিয়েছিল বৃদ্ধ কাসুরিয়া বায়উসি? রানার কেন যেন মনে হচ্ছে, মোসাদ কাউকে বাদ দেয়নি, টাকা খাইয়ে সব ক'জনকে হাত করেছে। তিন ট্রাইবাল হেডম্যান আর তাদের সঙ্গীরা একজোট হয়ে খুন করেছে আরেক ট্রাইবাল হেডম্যান আর তার বডিগার্ডদের। মোটিভ? অনেক কিছুই হতে পারে, এক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য নিশ্চয় করে বলা কঠিন। হয়তো ওই দলটার আচরণে এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছিল, ঝুঁকি দেখা দিলে মোসাদের সঙ্গে হেডম্যানদের সম্পর্ক ফাঁস করে দেবে। কিংবা হয়তো কোন গুরুতর অন্যায়ের সাজা দেয়া হয়েছে। মোসাদের কাছ থেকে পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা মানচিত্র হারিয়ে ফেলাটাও গুরুতর অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। যে ম্যাপটা এখন রানার কাছে রয়েছে সেটা হয়তো তাকদির উসমানের কাছে ছিল। ওবায়েদ খালিদের বেয়াড়া আঙুল থেকে সেটাকে সে রক্ষা করতে পারেনি।

এখন পুরো একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায়, বাকিরা সবাই ভাগে বেশি করে টাকা পাবে। বাকিরা বলতে আর হয়তো একটা দলকে বোঝায়, কিংবা তিনটেকেই। রানার জানা নেই।

সাত

হামাস গেরিলাদের সাহায্যে নিহত শারিয়ার পাঁচ সফরসঙ্গী বালির ওপর নিজেদের তাঁবু ফেলল। মির্জা রানাকে জানাল, ওরাও হামাস গেরিলা, তবে বয়সে ছোট আর অনভিজ্ঞ; সেজন্যেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটা তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে–বোবা

হয়ে থাকার সেটাই নাকি কারণ। রানা তার সঙ্গে একমত হতে না পারলেও, এ-নিয়ে কোন তর্কের মধ্যে গেল না। মির্জাকে শুধু বলল, 'ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই আমি। তুমিই বলো সেটা কখন সম্ভব।'

'ওদেরকে অন্তত একটা দিন সময় দিলে ভাল হয়,' অনুরোধ করল মির্জা। 'শোকটা তাহলে সামলে উঠতে পারত।'

রানার ইচ্ছে দু'একদিন দেরি করে সীমান্ত পেরুবে। ও চায় ওর দ্বিতীয় চালানটা প্রথমটার চেয়ে এগিয়ে থাকুক। 'ঠিক আছে,' মির্জার কথায় রাজি হলো ও।

রানার সঙ্গে আলোচনা করে হামাস গেরিলারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু মানুষ ও পশুর ছিন্নভিন্ন শরীর আলাদাভাবে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই, যেখানে যা পাওয়া যায় সব এক জায়গায় জড়ো করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। বিষয়টা নিয়ে জাদিবের সঙ্গে ওরা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি, করার কোন সুযোগও ছিল না, কারণ তার পাইলট আলমগীর একটু আগে জানিয়ে গেছে কন্টারে বসে তার মনিব ঢক-ঢক করে মদ খাচ্ছে।

ওদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এই সময় কন্টার থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল জাদিব। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নিজের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হামাস গেরিলারা মদ তো খায়ই না, অন্যের খাওয়াটাকেও ঘৃণার চোখে দেখে। লুঁয়ে জাদিব তাদের কাছে একটা মহৎ চরিত্র, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত হিসেবে সমাদৃত, তার এই বদভ্যাসটা মেনে নিতে পেরেছে এই কারণে যে সে ওই হারাম জিনিস ওদের কাছ থেকে আড়াল করে খায়। কিন্তু সেই আড়াল এখন আর থাকছে না। জাদিব আসলে এখন আর কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। কে কি ভাবল না ভাবল তাতে তার কিছু আসে যায় না। শারিয়ার শোকে জাদিব যেন আর জাদিব নেই।

তবে তার কথা শুনে বোঝা গেল, যতই টলুক, হুঁশ-জ্ঞান এখনও তার টনটনে। এমন কি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন সে।

'ওদের জানাজা হতে হবে,' বলল সে। 'আর আমি চাই শারিয়ার জন্যে একটা আলাদা কবর খোঁড়া হবে। এটা খুব অন্যায় যে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করছ তোমরা।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। ইঙ্গিতে তাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করল রানা।

'আমি জানি তোমরা কি ভাবছ,' আবার বলল জাদিব। 'যার লাশই পাওয়া যায়নি তার আবার আলাদা কবর কি! ওদিকে, বোমাটা যেখানে ফেটেছে, লম্বা চুল দেখেছি আমি। আর কিছু না পেলে ওই চুল থাকবে শারিয়ার জন্যে আলাদা কবরটায়। কবর না থাকলে কোথায় দাঁড়িয়ে ওর কাছে মাফ চাইব আমি?' তারপরই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে, পাইলট ছুটে এসে ধরে না ফেললে আছাড় খেয়ে পড়েই যেত। 'খুনী আমাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল, শারিয়াকে আমি বাঁচাতে পারিনি...'

আলমগীর তাকে কন্টারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

'উনি একা নন,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল মির্জা, 'শারিয়ার মৃত্যুর জন্যে আমরা সবাই দায়ী।'

'কে দায়ী সেটা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব শারিয়ার সফরসঙ্গীদের জেরা করার পর,' বলল রানা।

পরদিন সকাল হওয়া মাত্র হৈ-চৈ পড়ে গেল। কি ব্যাপার? না, গুজব ছড়িয়েছে যে তাঁবু ছেড়ে নবাগত হামাস গেরিলারা পালিয়েছে। শুনে একেবারে থ হয়ে গেল জাদিব। আর রানার রাগ গিয়ে পড়ল মির্জার ওপর। কনভয়ের সামনে তাকে ডেকে পাঠাল ও।

সত্যি তারা পালিয়েছে কিনা দেখতে গিয়েছিল মির্জা, খবর

পেয়ে ছুটে এল কনভয়ের কাছে। 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, ওরা ওখানে নেই।'

রানা তাকে বলল, 'কাল রাতে পালা করে পাহারা দেয়া হয়েছে। আমি রাত দুটোয় দেখেছি তাঁবুতে ওরা ছিল। আমার ধারণা, এরপর যারা পাহারা দিয়েছে তারা সাহায্য না করলে লোকগুলো পালাতে পারত না। তুমি কি বলো?'

'ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, জনাব,' বলল মির্জা। 'বলছে, টহল দেয়ার সময় একই সঙ্গে পাঁচ দিকে নজর রাখা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, ওদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে এদের কোন হাত নেই।'

'এই যে ওরা পালাল, এর অর্থ বোঝো?'

মির্জা চুপ করে থাকল।

'এর অর্থ হলো, হয় ওরা হামাস ছিল না, ছিল মোসাদ এজেন্ট; আর তা না হলে টাকা খেয়ে বেঈমানী করেছে—শারিয়া আর তার লোকদের হাত-পা বেঁধে পৌঁছে দিয়ে গেছে রিমোট কন্ট্রোলের রেঞ্জের মধ্যে।'

নত মস্তকে চুপ করে আছে মির্জা।

'আর এ-ও আমি ভুলতে পারছি না যে,' রানা থামছে না, 'কাল ওদেরকে তুমি জেরা করতে দাওনি।'

'জনাব,' এতক্ষণে মুখ খুলল মির্জা, 'এ আপনার ভুল ধারণা যে ওরা আমাদের লোক নয়। ওরা নতুন যোগ দিলেও, ওদেরকে আমি চিনি। এ-ও আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে হামাস বা হিযবুল্লাহ্ সদস্যরা টাকা খেয়ে মাতৃভূমির সঙ্গে কখনোই বেঈমানী করবে না। ওরাও করেনি।'

'তাহলে তুমি ওদের পালানোটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'এর জবাব আমার জানা নেই, জনাব,' বলল মির্জা। 'তবে আমি আমার একটা ধারণার কথা বলতে পারি।'

'কি ধারণা?'

'ওদের এই চলে যাওয়াটা হয়তো স্রেফ আত্মরক্ষার স্বার্থে।'

'মানে?'

'নেত্রী আর তাঁর বডিগার্ডরা ওদের চোখের সামনে খুন হয়নি?' জিজ্ঞেস করল মির্জা। 'ওরা বোঝেনি, রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে অসম্ভব শক্তিশালী বোমাটা ফাটানো হয়েছে? এরপর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে আমাদের মাঝে শত্রু আছে। কাজেই পালাবে না তো কি করবে?'

'আমাদের সবাইকে ফেলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এরকম কাপুরুষের মত? এটা কোন যুক্তি হলো না।'

'এটা হয়তো পালানো নয়, আসলে একটা কৌশল,' মাথা চুলকে বলল হামাস লীডার। 'পিছু হটেছে, হয়তো বাড়তি শক্তি নিয়ে আবার ফিরে আসবে।'

'এ-সব বাজে অজুহাত আমাকে শোনাতে এসো না,' ধীরে ধীরে বলল রানা, রাগ সামলে শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। 'ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন না বলে উপায় দেখছি না। আভাসে একবার বলেছি, কিন্তু তোমরা বোঝোনি।'

'কি ব্যাপার, রানা?' এতক্ষণে মুখ খুলল জাদিব। 'কি চেপে রেখেছ? কি আমরা বুঝিনি?'

'আমার ধারণা যারা পালিয়েছে তারা মোসাদের লোক ছিল, বলল রানা। 'বোমাটা ফাটার পর ওই জায়গায় আমি তার দিয়ে বাঁধা একজোড়া হাত দেখেছি।'

'সেকি! এর অর্থ?' জাদিব বিমূঢ়।

'মানে?' একটা ঢোক গিলল মির্জা।

'পরিষ্কার নয়? বন্দি শারিয়া আর তার বডিগার্ডদের এখানে, রিমোট কন্ট্রোলের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ওদের বোধহয় সবার হাতই বাঁধা ছিল। সম্ভবত পা-ও। আর পিছনে ছিল স্নাইপাররা। তবে শারিয়া আর তার বডিগার্ডরা নিজেদেরকে শুধু

বন্দি বলেই মনে করছিল, অন্তত আমার তাই ধারণা–জানত না শারিয়ার উটের দু'পাশে যে পোঁটলা ঝুলছে তাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

অকস্মাৎ ওদের দিকে পিছন ফিরে ছুটল জাদিব। পনেরো-বিশ গজ দূরে গিয়ে ঝুঁকল সে, পেটে যা কিছু আছে সব হড়হড় করে উগরে দিচ্ছে বালির ওপর। বাগদত্তার এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা কারুরই সহ্য হবার কথা নয়।

এই সময় রানা একটা ফোন পেল।

মাত্র সকাল, এইমাত্র সবার ঘুম ভেঙেছে, তা সত্ত্বেও রানা নির্দেশ দিল, দশ মিনিটের মধ্যে আল শামায়রা গিরিপথের এই পাঁচ মাথা ছেড়ে রওনা হবে কনভয়।

জাদিব প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, রানা তাকে থামিয়ে দিয়ে নরম গলায় বলল, 'আমার দায়িত্ব সীমান্ত পেরিয়ে এই কনভয়কে ত্রিশ মাইল ভেতরে পৌঁছে দেয়া। নিরাপত্তা ও সময়, এই দুটো ব্যাপারকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, আমি চাই না আরও নষ্ট হোক। তাছাড়া, এই জায়গাটাকে আমি নিরাপদ বলেও মনে করছি না।'

'কনভয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিচ্ছেন আপনি,' বলল জাদিব। 'ফোন কলটা পাবার পর।'

'ফোন পাবার সঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই,' বলল রানা। 'তবে ফোনে পাওয়া সুখবরটা আপনাদেরকে আমি জানাতে পারি। আমাদের দ্বিতীয় কনভয় নির্দিষ্ট সময়ের আগে রওনা হয়ে কাল মাঝরাতে বর্ডার ক্রস করেছে। ইজরাইলের দশ মাইল ভেতরে ঢুকে একটা পাহাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে এখন, আকাশে এয়ার ফোর্সের জেট ফাইটার থাকায় খোলা মরুভূমিতে বেরুতে পারছে না।'

'তাহলে এটাকে আপনি সুখবর বলছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল

জাদিব, চেহারায় শঙ্কার ছাপ।

'সুখবরই,' বলল রানা। 'ইজরাইলি ফাইটারগুলোর এটা আসলে রুটিন টহল। তেল ফুরানোর আগেই ফিরে যাবে, তারপর আবার সেই বিকেলে আসবে। ততক্ষণে বাকি বিশ মাইল পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে কনভয়।'

'গুড। ভেরি গুড।' চশমার কাঁচ মুছছে জাদিব।

রানার নির্দেশ পেয়ে মির্জা ইতিমধ্যে কনভয় ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে চলে গেছে। হঠাৎ প্রসঙ্গটা মনে পড়ল রানার। 'জাদিব, কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কি করবেন আপনি?'

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর জাদিব বলল, 'রানা, আপনি শুধু জেনে রাখুন যে লুঁয়ে জাদিব কাপুরুষ নয়।'

'এটাই যদি আপনার উত্তর হয়ে থাকে, স্বীকার করছি এর অর্থ আমি বুঝিনি।'

রানার দিকে পিছন ফিরল জাদিব, ধীর অথচ দৃঢ় পায়ে ফিরে যাচ্ছে কন্টারের দিকে। 'চেষ্টা করে দেখি বোঝাতে পারি কিনা।' কন্টারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল জাদিব, দু'হাতে ধরে আছে ব্র্যান্ডির বোতল ভরা কাঠের বাক্সটা। বালির ওপর বাক্সটা নামাল। একটা বোতল হাতে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল সে। পাথরে লেগে ভেঙে চুর-চুর হয়ে গেল বোতলটা। এভাবে সব ক'টা ব্র্যান্ডি ভর্তি বোতল ভাঙল জাদিব। তারপর রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে আবার কন্টারে গিয়ে ঢুকল।

পাইলট আলমগীরের দিকে তাকাল রানা। তাকে বরাবরের মত ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। চোখাচোখি হতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকাল সে।

এক মিনিট পরেই আবার কন্টার থেকে নেমে এল জাদিব। এবার তার হাতে লাল কাপড়ে জড়ানো একটা স্বাস্থ্যবান বই দেখা

যাচ্ছে। 'মদ ছেড়ে দিলাম, জীবনে আর স্পর্শ করব না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'এবং এই পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, শারিয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ অবশ্যই আমি নেব।' একটু থামল সে, তারপর আবার বলল, 'আজ থেকে কলম নয়, আমার হাতে কালাশনিকভ রাইফেল দেখবেন আপনি। আমি হামাস গেরিলা হব। যেখানে পাব সেখানেই মারব ইহুদি সৈন্য। আমি ট্রেনিং নিয়ে যোদ্ধা হব...'

রানা বলতে যাচ্ছিল, ও একমত নয়, কারণ জাদিব ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আরও অনেক বড় ও মহৎ অবদান রাখতে পারছে লেখালেখি করে–কিন্তু কথাটা বলা হলো না, মির্জা এসে ট্রাকে ওঠার তাগাদা দিল ওদেরকে।

'আমি পিছন দিকের কোন একটা ট্রাকে থাকছি,' চিৎকার করে বলল জাদিব।

'ঠিক আছে,' বলে সামনের ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়ল রানা, উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাতে দেখতে পেল পাইলটকে দ্রুত কি যেন বোঝাচ্ছে জাদিব।

একটু পরই কনভয় রওনা হয়ে গেল। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল জাদিবের কপ্টার যবর-এ-জামিলের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

সীমান্তের দিকে বাকি পাঁচ মাইল রাস্তার প্রথম তিন মাইল সবচেয়ে দুর্গম ও বিপজ্জনক, পেরুতে ওদের সময় লাগল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় মির্জা রানাকে অনুরোধ করল কনভয় একবার থামালে ভাল হয়, কারণ ওরা নাস্তা করতে চায়। রানা ইস্তত করছে দেখে আবার সে বলল, সামনে একটা পাকা রাস্তা পড়বে, নাম আমরাহী, ওটা জর্দানিরা নয়, নিয়ন্ত্রণ করে হামাস ও হিযবুল্লাহ্ গেরিলারা। হিযবুল্লাহ্রা যে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ইজরাইলিদের জান কাবাব করে দিচ্ছে, তা তো জনাবের জানাই আছে, ভাই না? সেই হামাস আর

হিযবুল্লাহ্‌দের গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প আছে এই এলাকায়। আভাস রানার সম্মতি আদায় করা যাচ্ছে না দেখে মির্জা আরেকটা অস্ত্র ছাড়ল, 'ওই পাঁচ হামাস গেরিলা সম্পর্কে খোঁজ নিতে চাই আমি, জনাব। এদিকের লোকজন ওদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারবে বলে আশা করি আমি।'

'ঠিক আছে।' কনভয় থামাতে রাজি হলো রানা। 'তবে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে।'

ওরা কনভয় থামাল পাকা রাস্তার এক ধারে। রাস্তার পাশে কিছু ঝোপ-ঝাড় আছে, কাছেপিঠে একটা ঝর্ণাও পাওয়া গেল। নাস্তা বলতে সঙ্গে করে নিয়ে আসা বাকরখানির মত মুড়মুড়ে রুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম, জেলি আর কলা। পরিমাণে প্রচুর থাকায়, নিজের হাতে বানিয়ে সবাইকে কফিও পরিবেশন করল জাদিব। সবার চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ছে, তার মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন এসেছে। মাথার টুপিটা নতুন সংযোজন। ঘোষণা করেছে, দাড়ি-গোঁফ কামাবে না। রানার কানে এল, সে খোঁজ নিচ্ছে হামাস গেরিলাদের কারও কাছে নামাজ শিক্ষার বই আছে কিনা। বই পাওয়া গেল না, তবে তাকে নামাজ শেখাবার জন্যে সবারই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

এত কিছুর মধ্যে হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্ত আর বিষণ্ন হয়ে উঠছে জাদিব। সবার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে একা একা বসে থাকল। ঠোঁট নড়তে দেখে বোঝা গেল আপনমনে বিড় বিড় করছে। শার্টের আস্তিন ঘষছে চোখে।

রানার বরাদ্দ করা সময় শেষ হতে আর পাঁচ মিনিট বাকি, এই সময় হাল ছেড়ে দেয়ার সুরে মির্জা বলল, 'কাছেই ওদের ক্যাম্প, কনভয়ের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে, অথচ কেউ ওরা এদিকে একবার এল না। ব্যাপারটা আমার বিশেষ ভাল ঠেকছে না, জনাব। চলুন, আমরা সামনে এগোই।'

'মির্জার কথায় যুক্তি আছে,' হঠাৎ পিছনে জাদিবের নরম গলা

শোনা গেল। 'ব্যাপারটা আমারও ভাল ঠেকছে না।' ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'হামাস আর হিযবুল্লাহ্ ক্যাম্পের কথা বলছিলাম,' জবাব দিল মির্জা। 'ওরা নিজেরাই হয়তো কোন সমস্যায় আছে, তা না হলে কনভয়ের আওয়াজ পেয়েও একটা খোঁজ নিতে এল না কেন?'

'আসেনি,' বলল রানা, 'তবে আসার সময় পারও হয়ে যায়নি।' হাত তুলে রাস্তার পশ্চিম দিকটা দেখাল। 'ওই দেখো, একটা জীপ আর একটা ট্রাক আসছে।'

সত্যি তাই। ছাদবিহীন জীপের সামনে ফিট করা একজোড়া লম্বা রড-এর মাথায় পতপত করে দুটো পতাকা উড়ছে। একটা হামাস গেরিলা বাহিনীর, অপরটা প্যালেস্টাইন-এর জাতীয় পতাকা। জীপের ড্রাইভিং ও প্যাসেঞ্জার সিটে কালো সালোয়ার ও একই রঙের ঢোলা শার্ট গায়ে বসে রয়েছে দু'জন লোক। বাকি দু'জনকে দেখা যাচ্ছে পিছনের সিটে। চারজনেরই মাথা ও মুখ কালো মুখোশ দিয়ে ঢাকা। শুধু চোখ আর নাকের কাছে ফুটো করা ওগুলো। ড্রাইভার ছাড়া আর সবার হাতে একটা করে সাব মেশিনগান।

ওরা তিনজন কনভয়ের সামনে, রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কনভয়ের প্রথম ট্রাকটা পনেরো কি বিশ গজ পিছনে। বাকি লোকজন সবাই ইতোমধ্যে যে-যার ট্রাকে যদি না-ও উঠে থাকে, কাছাকাছিই থাকার কথা।

জীপটা ওদের ঠিক দশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে থামল হাফ ট্রাক। ট্রাকের গেরিলারাও একই পোশাক পরেছে—সব কালো, এমনকি মুখোশগুলোও।

জীপ থেকে প্রথমে নামল ড্রাইভার। তাকে বেঁটে বলা চলে না, তবে তেমন লম্বাও নয়। শরীর স্বাস্থ্য ভাল, কাপড়চোপড় ঢোলা হওয়ায় একটু বরং মোটাসোটা দেখাচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখা গেল যে তার কাছেও অস্ত্র আছে। কালো কাপড়ের ওপর

কালো লেদার স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছিল না, অস্ত্রটা ঝুলছিল তার পিঠে। সামনে নিয়ে আসতে চেনা গেল। এটাও একটা সাব মেশিনগান।

ভাব দেখে মনে হলো, ড্রাইভারই দলটার লীডার। লীডারের ধীর-স্থির আচরণে একটু কৌতুকের ভাব, নাকি রানার বুঝতে ভুল হচ্ছে? মুখোশের আড়ালে লোকটা কি ওর পরিচিত কেউ? ওর সঙ্গে এরকম রসিকতা একমাত্র সোহেল ছাড়া আর তো কেউ করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সোহেল এখানে আসবে কিভাবে, তার এতক্ষণে সীমান্ত পার হয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাবার কথা।

হঠাৎ সাব মেশিনগান তুলে ওদের মাথার ওপর দিয়ে এক পশলা ফাঁকা গুলি করল ড্রাইভার। এটা সম্ভবত একটা সংকেত। জীপ ও হাফ ট্রাক থেকে গেরিলারা লাফ দিয়ে নেমে দ্রুত ছুটে এসে পজিশন নিল চারদিকে, ওদের টার্গেট যেন কনভয়টা। সব মিলিয়ে সংখ্যায় ওরা বিশজনের কম নয়।

তারপর আরেকটা চমক। একটানে মুখোশটা খুলে ফেলল ড্রাইভার। রানা দেখল, সোহেল নয়। না, ওর পরিচিত কেউ নয়। এমনকি ড্রাইভার কোন পুরুষও নয়। এ এমন এক মুহূর্ত, চামড়ার চোখে দেখা দৃশ্য বিশ্বাস্য কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে মানুষকে চোখ রগড়াতে হয়। রানার জন্যে চমকটা হলো, রূপের এমন স্নিগ্ধ, কোমল মাধুর্য আগে কখনও দেখেনি, সম্ভব বলে কখনও বিশ্বাসও করেনি।

'শারিয়া?' ফিসফিস করল জাদিব। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত—ভূত দেখার আতংকে, নাকি সীমাহীন উল্লাসে, বলা কঠিন।

প্রথমে এগোল হামাস লীডার আসিফ মির্জা। সামরিক কায়দায় স্যালুট করল সে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি আসিফ মির্জা, হামাস ফোর্থ ব্রিগেড-কমান্ডার। আপনি মহামান্য

ইয়াসির আরাফাতের অন্যতম উপদেষ্টা, শাতিল শারিয়া, এখানে এসেছেন স্পেশাল এনভয় হিসেবে...'

প্রায় খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। তারপর হাসি থামিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শারিয়া? কে শাতিল শারিয়া? তাকে তো তোমরা রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে উড়িয়ে দিয়েছ!'

'শারিয়া!' অকস্মাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বিপুল উল্লাসে ও চরম উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ছুটল জাদিব। রানা লক্ষ করল, শারিয়ার সঙ্গী ও বডিগার্ডরা তার পথ থেকে দ্রুত সরে দাঁড়াল। ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের চর্চা এখানে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থগিত থাকল; একা শুধু জাদিব নয়, এগিয়ে এল শারিয়াও, পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। অবশ্য পুনর্মিলনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে ব্যাপারটাকে কেউই খারাপ চোখে দেখছে না। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে এখানে উপস্থিত সবাই জানে শারিয়া জাদিবের বাগদত্তা, ঘোষণা করা না হলেও বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে।

'না, শারিয়া, না!' প্রেমিকাকে ছেড়ে দিয়ে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল জাদিব। 'এ তোমার ভুল ধারণা। শারিয়াকে...তোমাকে... হামাস মারতে যাবে কেন...'

তার কথা কেড়ে নিয়ে মির্জা বলল, 'কোন্ হামাস গেরিলার কাছে নয়, রিমোট যন্ত্রটা একজন ট্রাইবাল হেডম্যানের বডিগার্ড উলফাত আসমারের কাছে পাওয়া গেছে। একটু ভুল হলো, ঠিক তার কাছে পাওয়া যায়নি; ওটা সে বালির নিচে লুকিয়ে রাখছিল, আড়াল থেকে হেডম্যান কাসুরিয়া বায়উসি দেখে ফেলেন।'

শারিয়ার পেশীতে ঢিল পড়তে দেখল ওরা। 'তোমরা তার ব্যবস্থা করেছ? তার সঙ্গীদের সনাক্ত করা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমরা তাদেরকে জীবিত পাইনি,' জবাব দিল জাবিদ। 'শয়তানের গহ্বরে তাদের লাশ দেখা গেছে। হেডম্যান তাকদির

উসমান আর তিন বডিগার্ড। সবার ধারণা, পুরানো কাঠের সেতু ধরে পালাচ্ছিল ওরা, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে।'

মাথা নাড়ল শারিয়া। কিছু বলতে যাবে, এই সময় তার চোখ পড়ল রানার ওপর।

সেই একই প্রতিক্রিয়া, আরও বরং জোরালো—কারণ চোখ রগড়াতেই হলো তাকে। তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল—চোখে যেন তার কিছু পড়েছে। ব্যস্ত হয়ে তার চোখে কি পড়ল পরীক্ষা করছে জাদিব। তারই ফাঁকে রানাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে শারিয়া। তার চমকটা হলো—কোন মানুষের মধ্যে এমন পৌরুষদীপ্ত দৃঢ় ভাব, লাগাম টেনে সামলে রাখা বুনো ঘোড়ার মত উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্য, আবার একই সঙ্গে কোমল মায়াময় রোমান্টিকতার জাদু আগে কখনও দেখেনি সে, কোন দিন দেখবে বলে কল্পনাও করেনি।

জাদিবকে সাদরে সরিয়ে দিয়ে আবার মাথা নাড়ল শারিয়া। 'আমি এ-ধরনের দুর্ঘটনায় বিশ্বাস করি না,' বলল সে, গলার আওয়াজ মিষ্টি হলেও, তাতে কাঠিন্যও যথেষ্ট। 'জাদিব ও মির্জা, তোমাদের দু'জনকেই বলছি, এই কনভয়ের সঙ্গে এখনও বেঈমানরা রয়ে গেছে। চারজন মানুষকে শয়তানের গহ্বরে ফেলে দিতে হলে অন্তত আটজন প্রতিপক্ষ দরকার।' থামল সে, তারপর রানাকে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমি নিকোলাস পাপাদুলাকে দেখছি না কেন? তার বদলে নতুন একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। ও কে?'

শারিয়ার একটা হাত ধরল জাদিব। তার সেই হাতটায় চুমো খেতে গিয়েও পরিবেশের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে দমন করল সে। হঠাৎ হেসে উঠে ইঙ্গিতে রানাকে কাছে ডাকল। 'বোঝা গেল মহামান্য নেত্রার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়নি...'

'বাবার সঙ্গে? না। কেন, কি হয়েছে?' শারিয়া লক্ষ করল, ইঙ্গিত পেয়েও অপরিচিত পুরুষটি এগিয়ে আসছে না।

'নেতা গোপন একটা সূত্রে খবর পান,' পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করছে জাদিব, 'তোমার মিশন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য মোসাদ জেনে ফেলেছে।' শুধু তাই নয়, তিনি এ-ও জানতে পারেন যে এখানে আসার পথে কোথাও তোমাকে খুন করা হবে। অনেক চেষ্টা করেও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি তিনি। সব কথা আমাকে জানাবার পর আমিও ফোনে তোমাকে পাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমার মোবাইল থেকে কোন সাড়া পাইনি। এই অবস্থায় সব দিক চিন্তা করে নেতা সিদ্ধান্ত নেন, মিশন-এর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করবেন বিসিআই-কে...'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স?' বিস্মিত শারিয়া এবার শুধু তাকাল না, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখও বুলাল। সেটার গতি অস্বাভাবিক ধীরই বলতে হবে।

'হ্যাঁ,' বলে শারিয়াকে রানার দিকে টেনে নিয়ে এল জাদিব। 'ও রানা–মাসুদ রানা। এসপিওনাজ জগতের সেই জীবন্ত কিংবদন্তী।'

রানাকে একটু অবাক করে দিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল শারিয়া। 'তুমি আমার হিরো, তোমাকে পাওয়াটা আমাদের পরম সৌভাগ্য, এ-সব বলে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না,' বলল সে। 'কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতিপদে নিরাপত্তার অভাব আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাই আমি কোন ঝুঁকিও নিতে চাই না–তোমাকে প্রমাণ করতে হবে সত্যি তুমি মাসুদ রানা।'

জাদিবকে বিচলিত দেখাল। 'শারিয়া, এ-সব কি বলছ তুমি! এইমাত্র না বললাম তোমাকে, নেতা নিজে আমাকে ওর সম্পর্কে জানিয়েছেন...'

মাথা নাড়ল শারিয়া। 'দুঃখিত, জাদিব। বাবা যদি ওকে পাঠিয়ে থাকেন, সেটার সত্যতা ওকেই প্রমাণ করতে হবে। বাবা তোমাকে মাসুদ রানার কথা বলেছেন। কিন্তু ও-ই যে মাসুদ রানা,

তার প্রমাণ কি? ধরো তোমাকেই আমি চ্যালেঞ্জ করছি–প্রমাণ করো ও মাসুদ রানা।'

জাদিব হতভম্ব, পালা করে ঘন ঘন রানা আর শারিয়ার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 'তাই তো, কি করে প্রমাণ করি! এই, রানা, আপনি কিছু বলছেন না কেন?'

'জাদিব,' শারিয়া বলল, 'প্রশ্নটা আমি তোমাকেও করেছি।'

'আমি হার মানছি,' বলল জাদিব। 'ও যে মাসুদ রানা, এর কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। তবে আর্মস ডিলার নিকোলাস পাপাডুলা ওই নামেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।'

'এবার তুমি,' রানার দিকে তাকাল শারিয়া। 'প্লীজ।'

'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক...' বলল রানা।

'দ্যাটস দা কোড!' রানার হাতে একটা চাপড় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল শারিয়া। 'এই কোডের অর্থ হলো: তুমি ইয়াসির আরাফাতের প্রতিনিধিত্ব করছ।'

'তারচেয়ে বড় কথা, এই মিশনের নেতৃত্ব তিনি একা আমাকেই দিয়েছেন,' বলল রানা। 'সেই অধিকার বলে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। আরও বলে রাখছি, জবাবটা সন্তোষজনক হলেই কেবল এই কনভয়ের সঙ্গে থাকতে পারবে তুমি।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলেও চেহারায় তার কোন প্রকাশ ঘটল না। শারিয়া হাসিমুখে বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

'উটের পিঠে একটা মেয়ে ছিল, পর্দার ফাঁকে দেখেছি আমি,' বলল রানা। 'কাফেলার প্রথম অংশে ছিল আরও পাঁচজন পুরুষমানুষ। বিস্ফোরণে কেউ তারা বাঁচেনি। তাদের পরিচয় কি? কেন তাদের হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছিল?'

'তুমি আমাদের মত ফিলিস্তিনি নও, হলে উত্তরটা আন্দাজ করে নিতে পারতে,' বলল শারিয়া, জাদিবের দিকে তাকাল সে। কমান্ডার?'

মির্জা এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, 'আমি নিজে শুনিনি, জনাব মাসুদ রানা আমাকে খবরটা দিয়েছেন। ইজরাইলি রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়। হ্যাঁ, বিস্ফোরণে যারা মারা গেছে তাদের হাত-পা বাঁধা ছিল শুনে ওই খবরটার সঙ্গে এই মৃত্যুগুলোর একটা সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ হয় আমার...'

'রানা তোমাকে কি খবর শুনিয়েছিল?' জানতে চাইল শারিয়া, কোঁচকানো ভুরুতে একটু বিস্ময়।

'জনাব রানা আমাকে বললেন যে আমাদের মহামান্য নেতা রেডিওতে শুনেছেন পাঁচজন ইহুদি বসতিস্থাপনকারী ও একজন ইজরাইলি মহিলা সৈন্যকে হিযবুল্লাহ্ তরুণরা কিডন্যাপ করেছে।'

রানার দিকে যেন নতুন এক দৃষ্টিতে তাকাল শারিয়া, তাতে সমীহের ভাবটুকু গোপন থাকল না। 'হ্যাঁ, ওই পাঁচজন ইহুদি আর একজন সৈন্যকে আমরাই কিডন্যাপ করি,' বলল সে। 'এটা করা হয় আমার লাগেজের ভেতর অত্যন্ত শক্তিশালী বিশ কেজি বিস্ফোরক পাবার পর। বিস্ফোরকের সঙ্গে রিমোট কান্ট্রোলড্ ডিটোনেটিং মেকানিজমও ছিল। কাজেই গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিলাম কোথায়, কিভাবে আমাদেরকে খুন করা হবে। রিমোটটা রয়েছে কনভয়ে, বেইমানদের কারও কাছে। অতএব, টিট ফর ট্যাট। আমরা নেমে গিয়ে বন্দিদেরকে হাত-পা বেঁধে তুলে দিই ওই কাফেলায়।'

'তারা জানতই না যে হাওদার ভেতর বিস্ফোরক আছে?'

'না, জানত না।'

'আর দ্বিতীয় কাফেলার তরুণরা?' জিজ্ঞেস করল জাদিব। তারপর নিজেই আন্দাজ করল, 'হিযবুল্লাহ্ গেরিলা? ওদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু এত দূরে থাকে যাতে বিস্ফোরণের আঘাতে আহত না হয়? রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তুমিই বোধহয় ওদেরকে বোবার অভিনয় করতে বলে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' শারিয়ার মুখে গম্ভীর হাসি। ইঙ্গিতে তার সঙ্গে আসা হিযবুল্লাহ্ তরুণদের দেখাল সে। 'এদের মধ্যে তারাও আছে।'

'শারিয়া, তোমার কোন তুলনা হয় না!' উচ্ছ্বসিত জাদিব আবার তার প্রিয়তমার একটা হাত ধরল। 'আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে গর্বিত।'

'আমাদের রওনা হবার সময় হয়েছে,' সবাইকে মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল রানা। 'আমি আজ সন্ধের মধ্যে ইজরাইলি সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে চাই।'

'তোমার রণকৌশলটা কি?' সরাসরি চ্যালেঞ্জের সুরে রানাকে প্রশ্ন করল শারিয়া। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে চেষ্টা করলেই ইজরাইলি সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিতে পারবে? গত তিন মাসে প্রতিটি কনভয়, মোট ছয়টা, সীমান্তের ওপারে বিশ মাইলের মধ্যে অন্তত তিন থেকে চারবার আক্রান্ত হয়েছে। কাজেই ওদের চোখ ফাঁকি দেয়ার কথা ভেবে থাকলে সেটা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত।'

'তাহলে কিভাবে আমরা এগোব?' জানতে চাইল রানা।

'সামনে ইজরাইলি সৈন্যরা অপেক্ষা করছে, এটা ধরে নিয়ে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল শারিয়া। 'এগোবার জন্যে আমাদেরকে মরণপণ যুদ্ধ করতে হবে। সেজন্যেই জানতে চাইছি, তোমার রণকৌশলটা কি হবে?'

'আমার কৌশল হলো কনভয়টা ইজরাইলি সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া,' এই জবাব রানা উচ্চারণ করল না, মনেই লুকিয়ে রাখল। মুখে বলল, 'সেটা সিক্রেট ব্যাপার, সময়ের আগে কাউকে আমি জানাতে পারি না।'

'কিছু সিক্রেসি আমারও আছে।' শারিয়ার হাসি দেখে মনে হলো মিষ্টি প্রতিশোধ নিচ্ছে। 'সেগুলোর কথা আমিও তোমাকে সময়ের আগে জানাতে পারব না।'

'আরও একবার কথাটা মনে করিয়ে দিতে আমার ভাল

লাগছে না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'এই মিশনে আমিই নেতৃত্ব দিচ্ছি। সমস্ত সিদ্ধান্ত আমি নেব, সবাইকে তা মেনে চলতে হবে। আমার ধারণা, মিস্টার ইয়াসির আরাফাত এ-ব্যাপারে মঁশিয়ে লুঁয়ে জাদিবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। জাদিব?'

'হ্যাঁ,' নরম সুরে, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে শারিয়াকে নিশ্চিত করার চেষ্টায় জাদিব বলল, 'নেতা ঠিক তাই বলেছেন, শারিয়া। বলেছেন, রানা যদি বলেন কনভয় নিয়ে উল্টোদিকে ছোটো, ইজরাইলি গ্যারিসন বা ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে পড়ো, বিনা প্রতিবাদে ওর নির্দেশ পালন করতে হবে।'

'এ নির্দেশ আমি মানি না,' এটাই শারিয়ার জবাব, তবে সে তা উচ্চারণ করল না। বলল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

'আমি পরিপূর্ণ আনুগত্য আশা করি,' রানার কণ্ঠস্বর কঠিন হলো। 'তা না পেলে মিস্টার আরাফাতকে ফোন করে জানাতে বাধ্য হব যে এই মিশনের দায়িত্ব আমি ত্যাগ করছি।'

ঝাড়া তিন সেকেন্ড রানার দিকে আগুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শারিয়া। তারপর অবজ্ঞা প্রকাশের ঢঙে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার সিদ্ধান্তই মেনে চলা হবে। তবে এ-ও মনে রেখো, আত্মরক্ষা করা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। সে অধিকার প্রয়োগ কিভাবে করলে বিধিসম্মত হবে, আর কিভাবে প্রয়োগ করলে বিধিসম্মত হবে না, দয়া করে সেই শিক্ষা দিতে এসো না।'

শারিয়া ঠিক কি বোঝাতে চাইছে রানার জানা নেই, তবে কথা বাড়িয়ে আরও সময় নষ্ট করতে মন চাইছে না ওর। মির্জাকে ইশারা করে কনভয়ের দিকে ঘুরল ও, বলল, 'তিন মিনিটের মধ্যে কনভয় রওনা হবে। সীমান্তে ইজরাইলিদের টহল না দেখলে ফুলস্পীডে ছুটব আমরা।'

'ও বোকার স্বর্গে বাস করছে,' পিছন থেকে ভেসে আসা শারিয়ার গলা প্রায় স্পষ্টই শুনতে পেল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা

পানির মত সহজ মনে করছে। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে, পাঁচ-সাত মাইল পর-পর ইজরাইলি সৈন্যরা হঠাৎ যখন সামনে এসে দাঁড়াবে। জাদিব, ডার্লিং, তুমি আমার জীপে ওঠো।'

আট

বাকি দু'মাইল পেরুতে দুপুর হয়ে গেল ওদের। এক সারি বোল্ডার পড়ে আছে, মির্জা জানাল ওগুলোকেই সীমান্ত রেখা বলে ধরা হয়। যেন রানার ইচ্ছায় বাদ সাধতে আর শারিয়ার ভবিষদ্বাণীকে সত্যি প্রমাণিত করতেই বোল্ডারগুলোর আড়াল থেকে বাদামী আলখেল্লা পরা তিনজন ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে জানাল, মাইল তিনেক সামনে ইজরাইলি সৈন্যরা অস্থায়ী চৌকি বসিয়েছে, কাজেই ধরা পড়তে না চাইলে কনভয়কে অপেক্ষা করতে হবে। কতক্ষণ? ট্রাইবাল স্কাউটরা জানাল, সেটা বলা মুশকিল। এই অস্থায়ী চৌকি কয়েক ঘণ্টার জন্যেও হতে পারে, আবার কয়েকদিনের জন্যেও হতে পারে।

জীপ থেকে নেমে এসেছে শারিয়া, সঙ্গে জাদিবও আছে। স্থির কনভয়ের পাশে রানার সঙ্গে রয়েছে মির্জা।

'কি করতে চাও, রানা?' স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, শারিয়া সিরিয়াস; সে জানে এটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার সময় নয়।

স্কাউট তিনজনের দিকে তাকাল রানা। তিনজনই ঘোড়া থেকে নেমে হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডদের ভেতর মিশে গেছে, নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কুশল বিনিময় করছে। 'প্রথমে আমি ওদের পরিচয় জানতে চাই,' বলল ও।

'ওরা তিনজন সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গোত্রের সদস্য,' জবাব দিল মির্জা। 'আবরুদ্দি আলফাজ, কাসুরিয়া বায়উসি আর মারকান কাসুরি ওদের গোত্র-প্রধান বা হেডম্যান।'

ব্যাপারটা মানানসই বলেই বেমানান, অন্তত রানার চোখে সেভাবেই তাৎপর্যটা ধরা পড়ল। তিনজন হেডম্যান আছে, তাই সীমান্তে অপেক্ষাও করছে তিনজন স্কাউট। হেডম্যান তাকদির উসমান নেই, কাজেই তার দলের স্কাউটও এখানে নেই। রানার বিশ্বাস, হেডম্যানদের মেসেজ পেয়ে এখানে অপেক্ষা করছে ওরা তিনজন। 'স্কাউটদের মেসেজ আমি যাচাই করে দেখতে চাই,' শারিয়াকে বলল রানা। 'তোমার জীপটা পেলে মির্জাকে নিয়ে একটু সামনে যেতে চাই আমি। একটা পাহাড়ে চড়ে চোখে বিনকিউলার লাগালেই বোঝা যাবে কি ঘটনা।'

'চলো, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব,' বলল শারিয়া। জাদিবের দিকে তাকাল সে। 'তোমার না যাওয়াই ভাল, লুঁয়ে। ফেরার পথে সৈন্যরা ধাওয়া করলে তুমি আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেবে।'

'মানে?' রানা অবাক।

চেহারা দেখেই বোঝা গেল লজ্জা পেয়েছে জাদিব। আড়ষ্ট হেসে বলল, 'না, মানে...'

কথাটা শেষ করল না সে। শারিয়া বলল, 'এতে কারও কিছু মনে করার তো নেই, জাদিব। তুমি একজন ফটো-জার্নালিস্ট ও লেখক, আর্মস ব্যবহার করতে না জানাটাই তোমার জন্যে স্বাভাবিক।' রানার দিকে তাকাল সে, কৌতুক করে বলল, 'কেউ তোমরা হেসো না, ভাই। লুঁয়ে এমন কি জীবনে কখনও একটা পিস্তলের গুলিও ছোঁড়েনি।'

'নিয়ে যাবে না, বেশ, নিয়ে যাবে না; তাই বলে আমাকে নিয়ে এত তামাশা করার কি আছে!' অভিমান করায় আত্মভোলা লোকটাকে একদম ছেলেমানুষ লাগছে। 'যাচ্ছ যাও, কিন্তু

তাড়াতাড়ি ফিরে এসো–তা না হলে হেলিকপ্টারটা আনিয়ে সোজা রোমে ফিরে যাব আমি।'

ড্রাইভিং সিটে শারিয়া বসল, তার পাশে রানা, পিছনের সিটে মির্জা। রানার হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল ধরিয়ে দিয়েছে শারিয়া। রওনা হবার খানিক পর রানা খেয়াল করল খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে হাফ ট্রাকটাও পিছু নিয়েছে। ওটায় সম্ভবত স্কাউটরা আছে বলে ধরে নিল ও। কিন্তু ভুলটা ভাঙল জীপ আর হাফ ট্রাকের মাঝখানে দূরত্ব কমে আসতে। স্কাউট বা ট্রাইবাল হেডম্যানদের কাউকে আনা হয়নি, ওটায় রয়েছে শারিয়ার সঙ্গী হিযবুল্লাহ্ জঙ্গী তরুণরা। সবাই আসেনি, মাত্র চারজন।

'আমরা তো শুধু রেকি করতে বেরিয়েছি,' রানার গলায় অসন্তোষ। 'এত লোক নিয়ে আসার কোন দরকার ছিল না।'

'রানা,' নরম সুরে বলল শারিয়া, 'ভুলেও ভেবো না যে তোমার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করছি আমি। সে-রকম কোন ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তুমি মিশনের দায়িত্ব পেয়েছ হঠাৎ করে, আমার ও আমার সঙ্গীদের অগোচরে। ওরা হিযবুল্লাহ্, ওদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে কখন আমার নির্দেশ পাবে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ কি? ওরা আমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকবে, ওই নির্দেশটা কখন দিই শোনার অপেক্ষায়। তুমি কেন, বাবা স্বয়ং হুকুম করলেও আমাকে ছেড়ে দূরে কোথাও যাবে না ওরা।'

পাহাড়টা আধ মাইল দূরে। হিযবুল্লাহ্ তরুণরা জীপ ও ট্রাকের কাছে অপেক্ষায় থাকল, শারিয়া আর মির্জাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এল রানা।

চূড়ায় উঠে উল্টোদিকের কিনারায় ক্রল করে পৌঁছাল ওরা, তা না হলে অনেক দূর থেকেও আকাশের গায়ে ওদেরকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই সাবধানতা অবলম্বন বৃথা গেল না। কিনারায় পৌঁছে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে দূরে তাকাতেই ইজরাইলি

সৈন্যদের দলটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। নিচু একটা রিজ-এর ওপাশে, ডেবে থাকা জমিনে তাঁবু ফেলছে লোকগুলো। নিচু জমিনটা আকারে একটা ছোট স্টেডিয়ামের মত। চোরাচালানীদের জন্যে ফাঁদ পাতার আদর্শ জায়গা। ওই গর্তের কিনারায় না পৌঁছালে সৈন্যদের অস্তিত্ব কারও চোখে ধরা পড়বে না। ওই জায়গার এমন সব পয়েন্টে সৈন্যরা পজিশন নেবে, তখন পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না, স্নাইপাররা গুলি করে ফেলে দেবে। রানা দেখল, সৈন্যদের সঙ্গে দুটো জীপ আর দুটো ট্রাক রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজন তারা।

'স্কাউটরা সঠিক খবরই দিয়েছে,' বলল শারিয়া। 'এখন উপায়?' একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিল সে। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

পকেট থেকে বের করে একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল রানা। এক মিনিট পর মুখ তুলে বলল, 'ওই ডিপ্রেশান-এর ডান দিকে আরেকটা সেনা চৌকি আছে, ওটা স্থায়ী, বিশ মাইল দূরে...'

'এ-সব আমাদের মুখস্থ,' বাধা দিয়ে বলল শারিয়া। 'বাম দিকে আছে একটা গ্যারিসন, পঁচিশ মাইল দূরে। আমি জানতে চাইছি তোমার প্ল্যানটা কি?'

'ওদেরকে এড়িয়ে,' ইঙ্গিতে সৈন্যদের দেখিয়ে বলল রানা, 'বাম দিকে এগোতে চাই আমি।'

শারিয়া হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'তারমানে? সামনে থাকবে গ্যারিসন, কয়েক হাজার সৈন্য, আর পিছনে ধাওয়া করবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন। তুমি কি সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও?'

ক্রল করে পিছাতে শুরু করে রানা জবাব দিল, 'আমি যদি সত্যি তাই করতে চাই, আমার কথায় তোমরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য। তবে না, সেরকম কোন নির্দেশ তোমাদেরকে আমি দেব না।'

'তাহলে কি নির্দেশ দেবে তুমি?'

'যে নির্দেশই দিই, সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার মধ্যেই সবার মঙ্গল,' বলল রানা। 'হয়তো মনে হবে আমি তোমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছি, কিন্তু পরে দেখবে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। মোট কথা, আমার ওপর আস্থা রাখতে হবে।'

রানার সঙ্গে শারিয়া ও মির্জাও পিছিয়ে এল। তিনজন একই সঙ্গে দাঁড়াল ওরা। 'জানি না তুমি আমার পরামর্শ নেবে কিনা, তবে এই সমস্যার খুব ভাল একটা সমাধান আছে আমার কাছে।'

রানাকে তেমন আগ্রহী মনে হলো না। বলল, 'শুনতে আপত্তি নেই।'

'সাধারণ রণকৌশল বলে, পিছনে শত্রু রেখে সামনে বাড়তে নেই। আমি চাই ডিপ্রেশান-এ হামলা করে প্রথমে ওদেরকে খতম করি, তারপর এগোই।'

পাহাড় থেকে নামতে শুরু করে রানা, 'প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আমার কাজ যুদ্ধ করা নয়, চালানটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিরাপদে পৌঁছে দেয়া।'

'যুদ্ধটা তোমাকে করতে হবে না, রানা,' বলল শারিয়া, গলায় বেশ ঝাঁঝ। 'হিযবুল্লাহ্‌রা করবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার প্ল্যান সম্পূর্ণ অন্য রকম, শারিয়া। আমি সব সময় যুদ্ধ এড়িয়ে থাকতে চাইব।'

শারিয়া রেগে গেল। 'পিছনে শত্রু রেখে যাওয়াটা তোমার দৃষ্টিতে মারাত্মক একটা বোকামি নয়?'

রানা জবাব না দেয়ায় একটু থতমত খেয়ে চুপ করে থাকল সে।

ফেরার পথে অস্বস্তিকর, থমথমে হয়ে থাকল জীপের পরিবেশ। হাফ ট্রাকের আওয়াজ পাচ্ছে রানা, জীপটাকে অনুসরণ করে আসছে, তবে ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকানোর গরজ অনুভব করল না। তাকালে দেখতে পেত ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই

ওটায়।,

তারপর সেই তিন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল, ওদের উল্টোদিকে ছুটছে।

কনভয়ের কাছে ফিরে এল ওরা। জাদিবকে দেখে মনে হলো একেবারে মুষড়ে পড়ার অবস্থা। শারিয়া বিড় বিড় করে বলল, 'আল্লাহই জানে কি ঘটেছে!' জীপ ভাল করে থামেনি, তার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে, হন-হন করে এগোল, ঢিলে-ঢালা সালোয়ার ও শার্ট ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে। সাব মেশিনগানটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে।

জীপ থামতে নিচে নামল রানা। শারিয়াকে এড়িয়ে রানার দিকে ছুটে আসছে জাদিব, প্রায় হোঁচট খেতে খেতে।

'কি ব্যাপার, মঁশিয়ে জাদিব?'

'রানা,' কাতর সুরে বলল জাদিব। 'খুব বড় একটা দুঃসংবাদ।'

পিছন থেকে জাদিবকে ধরে ফেলল শারিয়া, 'আগে তুমি শান্ত হও, লুঁয়ে। মনে নেই, তোমার হার্টের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়? যাই ঘটে থাকুক, আগে শান্ত হও তুমি। তারপর ধীরে ধীরে বলো।'

'পাপাডুলা এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিল,' রানাকে বলল জাদিব। 'ভাই, আপনার দ্বিতীয় চালান ধরা পড়ে গেছে!'

'হোয়াট!' একটা ঝাঁকি খেলো রানা। 'এত বড় একটা খবর পাপাডুলা আমাকে না জানিয়ে আপনাকে জানাল?' তারপর হঠাৎ জাদিবের ওপর রেগে উঠল ও। 'আমার চালান মানে? আপনি এ-কথা বললেন কেন? ওটা ফিলিস্তিনিদের না হয়ে আমার হয় কি করে?'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল জাদিব, তারপর ম্লান সুরে বলল, 'পাপাডুলার কোন দোষ নেই, ভাই। সে আপনার টেলিফোন নম্বর হারিয়ে ফেলেছে। বলল, নম্বরটা খুঁজে পেলেই আপনার সঙ্গে কথা বলবে। আর আপনার চালান বললাম···ওটা

আমার স্লিপ অভ টাং–'

'কিভাবে কি ঘটল পাপাড়ুলা ব্যাখ্যা করেছে?' জানতে চাইল রানা, উদ্বেগ আর উত্তেজনায় অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে।

'না, ডিটেলস্ কিছুই উনি আমাকে বলেননি,' নরম, সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল জাদিব। 'আপনি শান্ত হন, রানা। এ সময় আপনার ভেঙে পড়লে তো চলবে না। একটা চালান ধরা পড়ে যাবার মানে এই নয় যে সব শেষ হয়ে গেছে...'

'এ কথা তুমি কি করে বলতে পারছ?' জাদিবকে থামিয়ে দিল শারিয়া, তার বিরক্তি চাপা থাকছে না। 'গত তিন মাসে একশো কোটি ডলার পানিতে গেছে, এক টাকার অস্ত্রও রামাল্লায় পৌঁছায়নি। বুশ-ব্লেয়ার দু'একদিনের মধ্যে ইরাক আক্রমণ করবে। তার এক কি দু'দিন পরই হত্যা করা হবে বাবাকে, তাঁর সব ক'জন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে সহ। মোসাদের এই নীল নকশার কথা তুমিও জানো, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছ অস্ত্রের একটা চালান ধরা পড়ায় তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি...'

'আমাদের এখন উচিত হবে এই চালানটা যাতে ঠিকমত পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করা। যেটা হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটার জন্যে হায় হায় করে তো কোন লাভ নেই।' জাদিবকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমরা সবাই আমার ওপর কেন রেগে যাচ্ছ।'

'দুঃখিত, মঁশিয়ে,' বলল রানা। 'সত্যিই আমি আপনার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করেছি। নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, প্লীজ।'

'দোষ কারও নয়,' বলল জাদিব। 'আসলে এই পরিবেশে একেবারেই বেমানান আমি। আমার বোধহয় আলমগীরকে ডেকে পাঠানো উচিত। শারিয়াকে নিয়ে রোমে ফিরে যাই আমি।'

'কি বলছ কি!' শারিয়া যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ফিরে যাব? আমি?'

'আমাদের নেতা এই মিশনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব তোমার

বদলে রানার হাতে তুলে দিয়েছেন,' যুক্তি দেখাল জাদিব। 'কাজেই, সত্যি কথা বলতে কি, এখানে তোমার কোন কাজ নেই। হিযবুল্লাহ্‌দের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বলো। আর তুমি আমার সঙ্গে রোমে চলো...'

'কেউ আমাকে এই কনভয় থেকে আলাদা করতে পারবে না,' অদ্ভুত এক জেদের সুরে বলল শারিয়া। 'আর এখানে আমার কাজ আছে কি নেই, একটু পরই টের পাবে তুমি।'

'সত্যি তুমি রোমে যাবে না?'

'না!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জাদিব। 'তাহলে আমিই বা এত বড় কাপুরুষ হই কিভাবে যে বাগদত্তাকে ফেলে পালাব?'

এই সময় ফোন এল রানার। ওদেরকে মান-অভিমান করার সুযোগ দিয়ে একটু দূরে সরে এল ও, একজোড়া ট্রাকের মাঝখানের ফাঁকে ঢুকে নির্জনতা আর আড়াল খুঁজে নিল। তারপর স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে কানে চেপে ধরল। 'মাসুদ রানা।'

'নিকোলাস,' অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা পাপাডুলার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার চিনতে পারল রানা। 'যবর-এ-জালিম থেকে বলছি। আশা করি দুঃসংবাদটা শুনেছেন!' শেষ শব্দ দুটো জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সে।

পাপাডুলা কি কারণে প্রথমে জাদিবকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে, এ প্রশ্নটা রানা তুললই না। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'মার্সেনারিরা ক'জন ফিরেছে?'

'একুশজন।'

'ওদের লীডার? তাওহিদ জাকার্তিয়া?'

'ফিরেছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন।'

'দাও ওকে।'

ইন্দোনেশিয়ান ভাড়াটে সৈনিক তাওহিদ জাকার্তিয়ার পরিচিত

গলা ভেসে এল, 'স্লামালেকুম, জনাব।'

জবাব দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'ন'জন মারা গেল!'

'সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক,' স্বীকার করল জাকার্তিয়া, গলার স্বরে বেদনা। 'কিন্তু এ-ও সত্যি যে ওরা মারা না গেলে ডিফেন্সিভ যুদ্ধটা বিশ্বাসযোগ্য হত না।'

'টাইমিং?' সংক্ষেপে প্রশ্ন করল রানা, কি জানতে চাইছে ও-ই জানে। 'ক'টা?'

'ইজরাইলি সময় রাত আটটা। সবগুলোই, জনাব—আঠারোটা।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। এখন বাজে বিকেল চারটে। হঠাৎ মনটা চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল ওর। ভাবল, চার ঘণ্টা যথেষ্ট সময় নয়। 'টাকা-পয়সা পাপান্ডুলার কাছ থেকে বুঝে নিয়ো।'

'জ্বী, ঠিক আছে।'

'আবার কখনও প্রয়োজন হলে তোমার জাকার্তার ঠিকানাতেই যোগাযোগ করব তো?'

'জ্বী।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'পাপান্ডুলাকে দাও।'

একটু পর আবার লাইনে এল পাপান্ডুলা। 'ইয়েস?'

'তোমার কাছে আমার অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে না?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা, আরেকবার ঘড়ি দেখল।

'আছে,' বলল পাপান্ডুলা। 'কোথায় পাঠাব বলে দিন।'

'কত?'

'এক লাখ ডলার।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'তুমি জানো, আমার সেই গাইড ওবায়েদ খার্লিদের বাড়িতে কে কে আছে?'

'কেন জানব না। কায়রোয় আমি ওর বাড়িতেও তো গেছি। ওর একটাই ছেলে, স্কুলে পড়ে। বউটা পঙ্গু...'

'পঙ্গু?'

'মানে রোড অ্যাক্সিডেন্টে দুটো পা-ই হারাতে হয় বেচারিকে,' বলল পাপাড়ুলা। 'আসলে সেই থেকে তো খালিদের মাথায় একটু গোলমাল দেখা দেয়। স্ত্রীর চিকিৎসা হচ্ছিল না, টাকার জন্যে নাকি মানুষের পকেটও মেরেছে।'

'আর কেউ নেই? শুধু ছেলে আর বউ?'

'বুড়ো মা-বাপও আছে, এত অভাবের মধ্যেও তাদেরকে খালিদ ফেলে দেয়নি...'

'ওই টাকাটা তুমি খালিদের স্ত্রীকে দিয়ে আসতে পারবে?'

'আপনি বললে অবশ্যই পারব।'

'ধন্যবাদ, নিকোলাস,' বলল রানা। 'আর কোন খবর?'

'ওহ্, ইয়েস!' হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল পাপাড়ুলা। 'মিস্টার সোহেল আমাকে একটা ভাল ব্যবসা দিয়েছেন।'

'এটা কোন নতুন খবর নয়, আমি জানি—তোমার কাছ থেকে প্রচুর আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন ডেলিভারি নিয়েছে ও, আম্মানের কাছে, পরিত্যক্ত এক খনিতে।' রানার চোখ হাতঘড়িতে।

'হ্যাঁ, এটা পুরানো খবর,' বলল পাপাড়ুলা। 'তবে আমি অন্য খবর, অন্য ব্যবসার কথা বলতে চাইছি।'

'যেমন?' রানার দম আটকে এল।

'মিস্টার সোহেল জার্মান কোম্পানির তৈরি আঠারোটা ট্রাক, প্রায় নতুনই বলা যায়, বাজারদরের অ-নে-ক কম দামে আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।'

রানার গলা থেকে আওয়াজ বেরুল নিঃশ্বাসের সঙ্গে। 'কবে?'

'আজ, এই খানিক আগে,' জানাল পাপাড়ুলা।

'খালি?'

'মানে?' রানার প্রশ্ন পাপাড়ুলা বুঝতে পারেনি।

'ট্রাকগুলো তুমি খালি অবস্থায় কিনলে?'

হাসল পাপাড়ুলা। 'ও, আপনি ভাবছেন আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন সহ ট্রাকগুলো কিনলাম কিনা। জ্বী-না, আমার

কোম্পানির নীতি হলো–বিক্রিত মাল ফেরত লওয়া হয় না।'

ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে প্রেমালাপে মগ্ন শারিয়া আর জাদিব, নির্জনতা ও আড়ালের খোঁজে পরস্পরের হাত ধরে চলে এল একজোড়া ট্রাকের মাঝখানের ফাঁকে। রানা অনুভব করল দু'জোড়া বিনকিউলার তাক করা হয়েছে ওর দিকে। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ও। বিনকিউলার নয়, শারিয়া আর জাদিবের দু'জোড়া চোখ। তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল রানার চেহারায় আশ্চর্য একটা আলো ফুটে রয়েছে।

'দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি প্রেম নিবেদন করলেই শুধু কোন পুরুষের চেহারায় এরকম পরিবর্তন ঘটতে পারে,' মন্তব্য করল জাদিব।

'আমার বেলায় তা ঘটেনি,' বলল রানা, 'কারণ দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি অনেক আগেই আপনাকে প্রেম নিবেদন করে বসে আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে পাকা আপেলের মত রাঙা শারিয়ার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে উঠল। তার আড়ষ্টতা কাটতে সময় লাগছে, মুখে কোন কথা সরছে না, ঠিক এই সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রথমে একটা। দশ সেকেন্ড পর আরেকটা। পাঁচ সেকেন্ড পর তৃতীয়টা।

নয়

আওয়াজগুলো ভেসে এল উত্তর-পশ্চিম, অর্থাৎ সেই ডিপ্রেশান-এর দিক থেকে। কোথায় লজ্জা কোথায় কি, এক পলকেই বদলে

গেল শাতিল শারিয়ার রূপ; লাফিয়ে সিধে হলো সে, রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করল অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে। 'ওরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিযবুল্লাহ্! আমাদের ভাই! দেখো জাদিব, দেখো রানা, দেশকে ভালবাসার এই নমুনা আর কোথাও পাবে তোমরা? ওরা হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে মরার অনুমতি নিয়ে গেছে! পাহাড়ের মাথা থেকে ছোট্ট একটা পাথর ফেলে ওদেরকে আমি সেই অনুমতি দিয়েছি। আমরা সেই রামাল্লা পর্যন্ত পথ তৈরি করে নেব!'

'হিউম্যান-বম্!' আবেগে বেসুরো, কর্কশ শোনাল জাদিবের কণ্ঠস্বর। ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। 'তিনজন হিযবুল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে ফিরে আসেনি। তারমানে আত্মঘাতী বোমা ফাটিয়ে ইজরাইলি সৈন্যদের মারছে ওরা?' হার্ট দুর্বল, নিজের বুকের বাম পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরল সে।

শারিয়া জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতঘড়ি থেকে চোখ তুলে তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'ওরা বীর, ওরা নমস্য, আমার হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ওদের প্রাপ্য। এখন আরেক প্রসঙ্গ। আরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা দিনের আলো পাব আমরা। শারিয়া, আমি কনভয় ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছি।'

মির্জাকে ছুটে আসতে দেখা গেল, সেদিকে একবার তাকিয়ে শারিয়া রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যেতে চাও? বাঁয়ে, না ডানে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখন কোন বাধা নেই, জীপ ছুটবে উত্তর-পশ্চিমে, মানে সোজা।'

রানার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল শারিয়া। 'ওদিকের পথটা সবচেয়ে ভাল চিনি আমি,' বলল সে, 'কাজেই আমার জীপ কনভয়ের আগে থাকবে। জীপে আমার সঙ্গে তুমিও থাকো, রানা। লুঁয়ে, তুমি...'

'জানি,' মুখ ভার করে জাদিব বলল, 'যেহেতু আমি অস্ত্র

চালাতে জানি না, তাই আমাকে থাকতে হবে সবচেয়ে পিছনের ট্রাকটায়।'

হেসে ফেলল রানা, বলল, 'না-না, অত পিছনে কেন থাকতে যাবেন। আপনি প্রথম ট্রাকে, মির্জার পাশে বসুন। কনভয় যদি আক্রান্ত হয়, মির্জাকে আপনি বডিগার্ড হিসেবে পাবেন।'

একটু পরই রওনা হয়ে গেল কনভয়। হুডবিহীন জীপের সামনে একটা মেশিনগান বসিয়েছে হিযবুল্লাহ্ সুইসাইড স্কোয়াডের তরুণরা। পিছনের সিটে তারা চারজন—দু'জন বসে, দু'জন দাঁড়িয়ে। ড্রাইভিং সিটে শারিয়া, মির্জার ট্রাক থেকে রানার লাগেজগুলো জীপে আনা হয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ছুটল জীপ। পিছনের হাফ ট্রাকে প্রায় পনেরোজন হিযবুল্লাহ্। সবাই তারা আত্মঘাতী হবার জন্যে তৈরি।

ডিপ্রেশান-এর কিনারায় একবার থামল জীপটা। ইজরাইলিদের ট্রাক আর জীপ সবগুলো পুড়ে শেষ, তবে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটু একটু। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন সৈন্য ছিল—ছাতু হয়ে গেছে বললেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বর্ণনা দেয়া হয়। তবে আধখানা বা দুই-তৃতীয়াংশ শরীর নিয়ে দু'চারজন এখনও এক-আধটু নড়াচড়া করছে, তাদের সম্পর্কে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তাদেরকে মুক্তি দেবেন আজরাইল।

শারিয়া আবার জীপ ছাড়তে যাবে, তার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'এটা আমার নির্দেশ। আমি চাই বিনা তর্কে এই নির্দেশ তুমি পালন করো,' ইংরেজিতে বলল ও।

নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল শারিয়া। 'কি নির্দেশ?' সে-ও ইংরেজিতে কথা বলছে। জীপের স্টার্ট বন্ধ করে দিল সে।

'কনভয় নিয়ে আমি বাম দিকে যাব,' বলল রানা।

'ওদিকে ইজরাইলিদের গ্যারিসন, তুমি জানো!'

'আমি কোন ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নই,' বলল রানা, 'তবু বলছি—অতদূর আমরা যাব না।'

'কনভয়ের সবাই জানে সোজা যাব আমরা,' বলল শারিয়া। 'হঠাৎ দিক বদলালে ওদের কি প্রতিক্রিয়া হবে?'

'তুমি আর আমি এক থাকলে,' রানার চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, 'আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাবে কেউ?'

'আমার এই সন্দেহ কি তাহলে ঠিক যে তুমি আমাকে আড়ালে কিছু বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল শারিয়া। 'তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম কোন দিকে যাবে। বাঁয়ে, না ডানে? তোমার জবাবটা ছিল অদ্ভুত। তুমি বললে—জীপ ছুটবে উত্তর-পশ্চিমে।'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ করি,' বলল রানা, 'রূপের সঙ্গে সাধারণত যা খুব কমই দেখা যায়। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে তুমি প্রস্তাব দিলে তোমার জীপ সামনে থাকবে, আর তাতে আমিও থাকব।'

'কিন্তু কেন?' একটু তীক্ষ্ণ হলো শারিয়ার কণ্ঠস্বর, তবে চোখের দৃষ্টিতে প্রচুর কৌতূহল। 'আমাকে তোমার কি-ই বা বলবার থাকতে পারে?'

'বলবার আছে, শোনবারও আছে। তবে তার আগে জীপ ছাড়ো তুমি।'

অনড় মূর্তির মত স্থির বসে থাকল শারিয়া। জীপের ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। শুধু অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে টিক্‌টিক-টিক্‌টিক-টিক্‌টিক। দূর, স্রেফ কল্পনা! এখানে ওয়াল বা টেবিল ক্লক আসবে কোত্থেকে। শব্দটা দু'জন এক সঙ্গে শুনেছে, ওদের চিন্তাধারাও একই ধারায় বইছে, তারপর বিপদ চিনতে পেরে একযোগে চিৎকার করে উঠল, 'টাইম বোমা!'

টিকটিক এক সঙ্গে শুনতে পাবার কারণ হলো, পায়ের কাছে পড়ে থাকা রানার সুটকেস থেকে বেরুচ্ছে শব্দটা। দু'হাতে ধরে তুলল রানা ওটা, যত জোরে পারা যায় ছুঁড়ে দিল ফাঁকা একটা দিকে। ওটা বালির ওপর পড়ার আগেই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত

হয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল, মৃত্যুর কত কাছে চলে এসেছিল ওরা।

ধুলোবালির বিশাল মেঘ চোখের পলকে ঢেকে ফেলল জীপটাকে। পিছনের কনভয় থেকে হাহাকার ও বিলাপ করছে হামাস গেরিলারা। শক ওয়েভের ধাক্কায় রানার মাথা ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে, শারিয়ার কপাল স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকে গেছে। তবে কারও আঘাতই মারাত্মক নয়। পিছনের সিটে যে দু'জন হিযবুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে ছিল তারা ছিটকে পড়েছে জীপের নিচে। বাকি দু'জন শুধু ঝাঁকি খেয়েছে, আহত হয়নি।

কনভয় থেকে লোকজন ছুটে আসছে, বুঝতে পেরে শারিয়া হিযবুল্লাহ্ তরুণদের বলল, 'প্রথমে ফাঁকা গুলি করো, তারপর চিৎকার করে এদিকে আসতে নিষেধ করো সবাইকে।'

সঙ্গে সঙ্গে গুলি, তারপরই কড়া নির্দেশ। যারা ছুটে আসছিল, ফিরে গেল যার যার নিজের ট্রাকে। গলা শুনে বোঝা গেল তাদের মধ্যে মির্জা ও জাদিবও আছে। ওদের প্রশ্নের উত্তরে শারিয়া জানাল, ওরা সবাই ভাল আছে।

ধুলো-বালির মেঘ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

'কি ছিল তোমার ওই সুটকেসে?' জিজ্ঞেস করল শারিয়া।

'তেমন কিছু না। একজন আরব বেদুইনের কাপড়চোপড়। এক ইজরাইলি মেজরের দেয়া ওভর্ক পারমিট। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। এই সব।'

'বোমাটাও ছিল। বুঝতে পারছ নিশ্চয়, আমাকে নয়, ওটা ছিল তোমাকে খুন করার পরিকল্পনা,' বলল শারিয়া। 'আমরা যখন জীপ নিয়ে ইজরাইলি সৈন্যদের তাঁবু দেখতে গিয়েছিলাম, সম্ভবত তখনই কেউ সুটকেসের ভেতর বোমাটা রাখে। তুমি একা নও, তোমার সঙ্গে মির্জাও মারা যেত। কারণ সুটকেসটা ট্রাকে ছিল, তোমারও ওই ট্রাকেই থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি,' বলল রানা। 'তোমার এই কথাটা ঠিক যে আমাকেই টার্গেট করা হয়েছিল। তবে খুনী

আমাদের সঙ্গেই আছে, তাই না? কাজেই সুটকেসটা ট্রাক থেকে জীপে নিয়ে আসার সময় সে বুঝতে পারে আমার সঙ্গে তুমিও মারা যাবে।'

যুক্তিটা হজম করতে দু'সেকেন্ড সময় লাগল শারিয়ার। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ। জীপের আমরা সবাই মারা যাব, এটা সে জানত।' তার চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে।

'প্লীজ, শারিয়া। যা বলছি শোনো। আমি যেদিকে চাইছি সেদিকে চলো।'

এবার সঙ্গে সঙ্গে জীপ ছাড়ল শারিয়া। দিক বদলাল সাবধানে, ধীরে ধীরে। ওর ধারণা অমূলক প্রমাণিত হলো। পিছনের কনভয় থেকে কেউ কোন প্রশ্ন তুলল না বা প্রতিবাদও করল না।

'কাজটা কার হতে পারে?' এক সময় জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি কাউকে সন্দেহ করো?'

'তুমি প্রথম থেকে কনভয়ের সঙ্গে আছ,' কি কারণে কে জানে মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে আছে শারিয়ার, জবাব দিচ্ছে ঝাঁঝের সঙ্গে। 'কার আচরণ সন্দেহজনক সেটা আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা।'

এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না রানা, তবে বুঝতে পারল প্রশ্নটা শারিয়া এড়িয়ে গেল।

'স্কাউট তিনজন?' অন্য প্রসঙ্গ তুলল রানা। 'ওরা এত কাঁচা নয় যে ইজরাইলি সৈন্যদের সঙ্গে মারা যাবে।'

'আমার ধারণা, ওরা এক সময় ঠিকই খুঁজে নেবে আমাদের,' বলল শারিয়া। 'বেশিরভাগ সম্ভাবনা সামনে কোথাও আছে ওরা। তা না হলে পিছন থেকে এসে ঠিকই ধরে ফেলবে।'

যতদূর দৃষ্টি যায়, চারদিকে শুধু উঁচু-নিচু পাহাড় আর সুবিশাল ঢাল। পাহাড় সারির মাঝখানে মরু প্যাসেজ কোথাও সরু, কোথাও এক-আধ মাইল চওড়া। তারপর আছে খানিক পর পর

ঢেউ আকৃতির পাঁচিল বা বালিয়াড়ি। চাঁদের গায়ে যেমন দেখা যায়, তেমনি বিশাল আকারের গভীর গর্তেরও কোন কমতি নেই। এতসব আড়াল-আবডাল থাকায় অনায়াসে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকেই হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে ফিলিস্তিনি ট্রাইবাল জনবসতি। এই সীমান্ত এলাকার প্রায় সবটুকু দুর্গম বলেই গোত্র প্রধানদের সাহায্য ছাড়া চোরাচালান সম্ভব নয়।

'একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে,' হঠাৎ বলল শারিয়া। সরু একটা মরু প্যাসেজ ধরে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটছে জীপ।

'ইয়েস?' আলাপ শুরু করতে রানার আগ্রহ শারিয়ার চেয়ে কম নয়।

'দুটো চালানের একটা ধরা পড়ে গেছে। সেই খবরটাই সম্ভবত তুমি নতুন করে শুনলে ফোনে। কিন্তু আলাপ সেরে যখন ফিরে এলে, তোমাকে মনে হচ্ছিল দারুণ একটা সুখবর পেয়েছ।'

'সত্যি তাই,' বলল রানা। 'এমন একটা সুখবর, আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করে।'

'দয়া করে যদি শোনাও তো আমিও একটু নাচি।' বোঝা গেল, ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছে শারিয়ার মেজাজ।

'দুঃখিত।'

'কেন?'

'এখন পর্যন্ত জানি সুখবরটা শুধু আমার। তোমার বা তোমাদেরও কিনা, সেটা বলতে পারব এক গাদা জটিল প্রশ্নের উত্তর পাবার পর।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর শারিয়া ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, 'আমার দেশপ্রেম নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ আছে?'

'মোটেও না। তবে মনে রাখতে বলি যে শুধু ফেরেশতাদের ভুল হয় না।'

আরও এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর শারিয়া বলল, 'বেশ! বলো কি জানতে চাও।'

'নিজের খুব বড় কোন ভুল ধরতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' একটু থেমে জবাব দিল শারিয়া।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা, তারপর স্পীডোমিটারের কাঁটাটা একবার দেখে নিল। 'এবার সীমান্ত প্রসঙ্গ,' বলল ও। 'এরকম অরক্ষিত সীমান্ত খুব কমই দেখা যায়। বিচ্ছিন্ন দু'একটা নয়, বিরাট বিরাট সব ট্রাক বহর ঢুকে পড়ছে ইজরাইলে, অথচ সীমান্তকে নিশ্ছিদ্র করার কোন গরজ নেই ওদের। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'খুব সোজা,' জবাব দিল শারিয়া। 'প্রথমে আমি জর্দানের কথা বলি। এমনিতেই সরকার দুর্বল, তার ওপর দেশটায় গণতন্ত্র নেই, ফলে শাসকরা মার্কিনিদের পা চাটতে বাধ্য। পেন্টাগন ইজরাইলকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, জর্দানের তরফ থেকে ওদের কোন বিপদ নেই। ফলে ইজরাইলিরা সীমান্তে প্রচুর সৈন্য রাখার প্রয়োজন বোধ করে না।'

'কিন্তু জর্দানি এলাকায় হিযবুল্লাহ্‌রা ট্রেনিং তো নিতে পারছে,' বলল রানা। 'জর্দান সরকার সহানুভূতিশীল না হলে...'

'সহানুভূতিশীল সরকার নয়, সাধারণ জনগণ। তাছাড়া যবর-এ-জালিমের কথাই ধরো, ওখানে ওরা প্রায় সবাই ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু। জর্দান সেনাবাহিনীর এত শক্তি নেই যে হিযবুল্লাহ্‌র ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা চালাবে। মাঝে-মধ্যে মাথার ওপর দিয়ে জেট ফাইটার উড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বোমা ফেলার সাহসও হয়নি।'

'কিন্তু চোরাচালান তো হচ্ছেই,' বলল রানা। 'গোলা-বারুদও ঢুকছে দেদার। ইজরাইল এটা ঘটতে দিচ্ছে কেন?'

'চোরাচালান হওয়ায় আরব বিশ্বের উন্নতমানের সমস্ত পণ্য

ব্যবহার করতে পারছে ইজরাইলিরা। ইরাক ও সিরিয়ার প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট চোরাই পথে চলে যাচ্ছে ওদের হাতে, সেগুলো ওরা আমেরিকান ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিক্রি করছে। সব মিলিয়ে, এই চোরাচালান ইজরাইলি অর্থনীতির জন্যে শুভ ফল বয়ে আনছে।'

এরপর রানা প্রসঙ্গ বদল করল। 'তোমার ধারণাটা জানতে চাই—গত তিনমাসের সবগুলো চালান ধরা পড়ার পিছনে কারণ কি?'

'এর উত্তর পানির মত সহজ,' বলল শারিয়া, তার রাশি রাশি কালো চুল পতাকার মত পিছনে উড়ছে। 'প্রতিটি কনভয়ের সঙ্গে মোসাদের একজন এজেন্ট বা তার প্রতিনিধিরা ঢুকে পড়ছে।'

'সে বা তারা কিভাবে ঢুকছে, এ-প্রশ্ন পরে করছি,' বলল রানা। 'তার আগে বলো, ঢোকার পর কি এমন করছে যে কনভয়ের সামনে হঠাৎ করে সদলবলে হাজির হচ্ছে ইজরাইলি সৈন্য? প্রতি একজোড়া সেনা চৌকির মাঝখানে ব্যবধান গড়ে প্রায় বিশ মাইল, সৈন্যরা জানছে কিভাবে কোন্ পথ ধরে এগোচ্ছে কনভয়?'

'একজন মোসাদ এজেন্টকে তুমি কি মনে করো?' তিক্ত হাসির রেখা দেখা গেল শারিয়ার ঠোঁটে। 'সংক্রামক ভাইরাস নয়?'

'টাকা দিয়ে মানুষকে বেঈমান বানাবার একটা দু'পেয়ে কারখানা?'

'ঠিক তাই।'

'সেই বেঈমানরা হামাস ড্রাইভারদের ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তুলে দিচ্ছে ইজরাইলি সৈন্যদের হাতে?'

'আমার তাই ধারণা।'

'তারা কারা? এই বেঈমানরা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার বিশ্বাস, তুমি অন্তত মূল মোসাদ এজেন্ট, অর্থাৎ বেঈমানের

কারখানাটাকে চেনো।'

রানার শেষ কথাটা ঠাস করে চড় মারার সমতুল্য, সত্যি সত্যি ঝাঁকি খেলো শারিয়া। তবে নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এত দূর এসেছে, নিজেকে দ্রুত সামলে নিতেও জানে। 'না, চিনি না। তবে সন্দেহ করি। সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্যেই কনভয়ের দায়িত্ব নিয়ে রামাল্লা থেকে রওনা হই আমি।'

'তবে শুধু ভাইরাস সনাক্ত করতে নয়, যে-কোন মূল্যে চালানটা জায়গামত পৌঁছে দেয়াও তোমার আসল উদ্দেশ্য।'

'হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।'

'সেজন্যেই সঙ্গে করে বিশ-পঁচিশজন আত্মঘাতী হিযবুল্লাহ্ গেরিলাকে নিয়ে এসেছ, ইজরাইলি সৈন্যদের উড়িয়ে দিয়ে পথ করে নেবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, শারিয়া, এরকম কচি আর তাজা প্রাণগুলোকে অযথা মরতে বলার কোন কারণ নেই!' আচমকা উঠে আসা আবেগে রানার গলা কি একটু কেঁপে গেল? 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এবারের চালান অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের গ্রামগুলোয় পৌঁছাবে।'

'ওদের এই আত্মদানকে তুমি অযথা বললে?' শারিয়া যেন বুঝতে পারছে না সে হাসবে না কাঁদবে। 'না, দোষটা আসলে তোমার নয়। তুমি ফিলিস্তিনি নও, সেটাই কারণ। রানা, হিযবুল্লাহ্দের এই আত্মঘাতী হওয়া পবিত্রতম প্রার্থনা হিসেবে দেখা হয়। এ তো সরাসরি আল্লাহর হাতে নিজেকে সমর্পণ। আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান আমাদের এই জীবন, ওরা সেটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে তাঁকে। ওরা শাহাদাত বরণ করছে, রানা! ইসলাম বলে, ওরা সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ,' বলল রানা। 'আমি তোমাদের ধর্মচর্চা বা রণকৌশলের সমালোচনা করছি না। আমি বলতে চাইছি, কেউ আত্মহত্যা না করলেও যেখানে এই মিশন সফল

হবে; সেখানে কেন ওদেরকে মরতে বলবে তুমি?'

'কি করে বুঝব তোমার নেতৃত্বে এই মিশন সফল হবে?' রেগে উঠছে শারিয়া। 'তোমার একটা চালান ধরা পড়ে গেছে। আর এই চালানটা কি উদ্দেশ্যে কে জানে, নিষেধ করা সত্ত্বেও ইজরাইলি গ্যারিসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। তারপরও কি করে তোমার কথায় বিশ্বাস রাখব আমি?'

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, তাই অনেক কথা চেপে রাখছ তুমি,' বলল রানা। 'সেরকম আমারও কিছু কারণ আছে, সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারছি না বা উল্টোপাল্টা তথ্য দিচ্ছি। তবে আমি তোমাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে বলি যে এবারের চালান ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছাবে।'

'পৌঁছালে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না,' ধীরে ধীরে বলল শারিয়া। 'তবে একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। রামাল্লা থেকে আসলে একটা নয়, দুটো মিশন নিয়ে রওনা হই আমি। বাবা তোমাকে একটা মিশনের দায়িত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয় মিশনটার নেতৃত্ব এখনও আমার হাতেই রয়েছে।'

'আরেকটা মিশন?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'কি সেটা?'

'যেখানে পাব সেখানেই মারব। দেখতে না পেলে খুঁজে নিয়ে মারব।'

'কাদের?'

'ইজরাইলি সৈন্যদের।'

কি যেন বলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা। না, সব কথা বলার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তবে তর্কটা এখানেই শেষ হতে দিল না ও। বলল, 'আমার সঙ্গে থেকে তুমি যদি আলাদা একটা মিশন সফল করতে চাও, তাহলে আমার কাজে বাধা পড়বে যে! সেটা আমি হতে দিই কিভাবে?'

মিষ্টি বাঁশীর সুর, বাতাসের খস্‌খস্ শব্দ, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, ঝর্ণার কলকল, এগুলোর সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল শারিয়ার

অপ্রত্যাশিত হাসি। তারপর সে বলল, 'জনাব, একটু চিন্তা করুন। আমি আপনার সঙ্গে, নাকি আপনি আমার সঙ্গে?'

'ঠিক আছে, তোমার জীপ থেকে নেমে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'জীপ আর হাফ-ট্রাক নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যাও তোমরা।'

'আর তুমি?'

'মিশনটা পুরোপুরি সফল করতে হলে,' হাতঘড়ি দেখল রানা, 'সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে ওই কনভয়কে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে। জটিল একটা পরিকল্পনা, নির্বিঘ্নে কাজ করবার সুযোগ চাই আমার।'

'কিন্তু আমি মনে করি কনভয়ের পথ পরিষ্কার করার জন্যে আমার সাহায্য তোমার দরকার আছে।'

'আসলে ঠিক উল্টোটা সত্যি,' বলল রানা। 'কনভয়ের সঙ্গে তুমি আর হিযবুল্লাহ্‌রা থাকলে আমার মিশন পুরোপুরি সফল না-ও হতে পারে।'

'তাহলে সব কথা খুলে বলো আমাকে,' জেদ ধরল শারিয়া। 'তোমার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সব আমি জানতে চাই।'

'তুমিও তাহলে আমাকে বলো কাকে ভাইরাসের কারখানা বলে সন্দেহ করছ।'

'কাকে নয়, মানে একজনকে নয়, সন্দেহ আমি কয়েক-জনকেই করি,' ধীরে ধীরে, ভেবেচিন্তে জবাব দিচ্ছে শারিয়া। 'নাম বলা যাবে না, কারণ নিরেট কোন প্রমাণ পাওয়ার আগে কারও দিকে আঙুল তাক করাটা অন্যায় হবে।'

'বোঝা গেল, যতটা না পরস্পরকে আমরা অবিশ্বাস করছি,' বলল রানা, 'তারচেয়ে বেশি ভুগছি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। সময়ই হয়তো এর সমাধান করে দেবে। শারিয়া, জীপ থামাও। আমি ট্রাকে ফিরে গিয়ে মঁশিয়ে জাদিবকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

'লুঁয়ে তোমার লোক, কনভয়ের সঙ্গে এসেছে,' রানার কথা

শুনে শারিয়া শুধু অবাক নয়, রেগেও উঠেছে। 'ওর দায়িত্ব তুমি আমাকে নিতে বলছ কেন?'

'তুমি বোধহয় ভুল করছ,' বলল রানা। 'মঁশিয়ে জাদিব এর আগে কখনোই কোন কনভয়ের সঙ্গে ছিলেন না। এবার আছেন, তার কারণ মিস্টার আরাফাত তাঁকে যবর-এ-জালিমে আসতে বলেছিলেন—পাপাডুলার সঙ্গে তোমার আলোচনায় তিনি যাতে দোভাষীর দায়িত্বটা পালন করতে পারেন।

'কিন্তু ঘটলটা কি? আমরা সবাই দেখলাম বিস্ফোরণে উড়ে গেলে তুমি। মঁশিয়ে জাদিব পবিত্র কোরান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর মদ স্পর্শ করবেন না। শুধু তাই নয়, ট্রেনিং নিয়ে ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর কি হলো? তুমি পুনর্জীবন লাভ করলে। ফলে মঁশিয়ে জাদিবও প্রেমিকাকে ছেড়ে চলে যেতে পারলেন না। এখন তুমিই বলো, তিনি আমার বোঝা, না তোমার?'

'বোঝা, না? লুঁয়ে বোঝা?' বিস্মিত শারিয়ার দুঃখে হাসি পাচ্ছে। 'তুমি যেন জানো না লুঁয়ে ফিলিস্তিনিদের কত বড় উপকার করছে? ওর লেখালেখি আর ফটোর কারণে...'

'আমি সবই জানি। সত্যি কথা বলতে কি, মঁশিয়ে জাদিবের একজন ভক্তও বলতে পারো আমাকে,' শারিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা।

'তাহলে তাকে বোঝা বলছ কেন?'

'কারণ উনি ক্যামেরা আর কলম চালাতে জানেন, পিস্তল বা রাইফেল চালাতে জানেন না। তুমিই বলেছ।'

'শুধু লুঁয়েকে নয়,' শারিয়ার চোখে-মুখে তীব্র সন্দেহ, 'আমাকেও তুমি ভাগিয়ে দিতে চাইছ। আসলে তোমার উদ্দেশ্য কি?'

এবার হাসতে দেখা গেল রানাকে। 'উদ্দেশ্য: চালানটা ইজরাইলি সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া।'

'এ-ধরনের কৌতুক আমি পছন্দ···নাহ্, কৌতুকই বা বলি কি করে!' রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল শারিয়া। 'একটা চালান তো তোমার লোকেরা সত্যি সত্যি ইজরাইলিদের হাতে আগেই তুলে দিয়েছে।'

রানা নির্বিকার। 'দিয়েছে। এবং প্রসঙ্গত বলছি, তুমি প্রতিবার যে ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক ভাড়া করো, আমার ওই প্রথম চালানের ট্রাক সেই কোম্পানি থেকে ভাড়া করা হয়নি, অথচ তারপরও ট্রাকগুলোর ব্যাকলাইট ও হেডলাইটে ব্লীপার পাওয়া গেছে।'

'অথচ তারপরও···তোমার ভাষার মধ্যে কি যেন একটা অর্থ আছে, ঠিক ধরতে পারছি না।' শারিয়াকে হঠাৎ বিস্মিত দেখাল। 'ব্লীপার? ব্লীপার পাওয়া গেছে!'

'তুমি আবাবিল ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক ভাড়া করো,' বলল রানা। 'এই ট্রাকগুলো ওই কোম্পানিরই। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এই ট্রাকগুলোর হেড ও ব্যাক লাইটে ব্লীপার আছে।' ব্লীপার কি, রিসিভারের সম্ভাব্য রেঞ্জ, মানচিত্র ইত্যাদি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। 'আমার প্রথম চালানের ট্রাকগুলো ভাড়া করা হয় খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে। তাতেও ব্লীপার ছিল।'

'ও আল্লাহ রে!' এক হাতে স্টিয়ারিং, আরেক হাত গালে তুলল শারিয়া। 'রোম থেকে প্রতিবার আমিই ট্রাক ভাড়া করি। কাজেই আবাবিল কোম্পানির ট্রাকে ব্লীপার পাওয়া গেলে আমার ওপর সন্দেহ হবার কথা। কিন্তু খাদেমুল আব্বাসিয়া কোম্পানির ট্রাক তো আর আমি ভাড়া করিনি···'

'রোমে বা যবর-এ-জালিমে তোমার হয়তো লোক আছে, সে বা তারা খবর রাখছে কোন কোম্পানির ট্রাকে আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন লোড করা হচ্ছে···'

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো জীপ, হঠাৎ ব্রেক কষায় ছিটকে নিচে পড়ার অবস্থা হলো সবার। তারপরও প্রতিবাদ বা অভিযোগ করার কথা মনে পড়ল না কারও, কারণ সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ডানপাশে, বাঘের থাবা আকৃতির জোড়া পাহাড়ের মাঝখানে। ভোজবাজির মত, যেন ওখানকার মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়েছে সেই তিন ঘোড়সওয়ারের দু'জন।

পাহাড় দুটো ওদের জীপ থেকে একশো গজ ডানে, মাঝখানে একটা ঢাল, সেই ঢাল বেয়ে সমতল মরুভূমিতে উঠে এসেছে স্কাউটরা। তাদের তাগড়া ঘোড়াগুলো টগবগিয়ে পাশ কাটাল জীপ ও হাফ ট্রাককে। ইতোমধ্যে তিন ট্রাইবাল হেডম্যান ট্রাক থেকে নেমে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তাদের কাছে থামল স্কাউটরা, নিচে নেমে যে যার নেতাকে আলিঙ্গন করল। নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে, বর্ণনা করছে কোথায় কি দেখে এসেছে। ভিড়ের ভেতর মির্জাও আছে, সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে। তার সঙ্গে জাদিবও নেমেছে ট্রাক থেকে, তবে কনভয়ের পিছন দিকে নয়, সে ছুটছে সামনে। হাফ ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে জীপের পাশে চলে এল সে। বেচারি এমনই ব্যগ্র-ব্যাকুল হয়ে আছে, তিনবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল, নাকের ডগা থেকে চশমাটা ফেলে দিল দু'বার।

জীপ থেকে নেমে তাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করতে হলো শারিয়ার। 'তোমাকে নিয়ে কি করব বলো তো আমি!' তার আচরণে প্রবল ভালবাসার প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি আছে একটা অসহায় ভাব। 'যতদিন না স্বাধীন হচ্ছি এরকম বিপদের মধ্যেই আমার জীবন কাটবে। তুমি যদি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে না পারো, তোমার হার্ট কিন্তু বেঁকে বসবে। লুঁয়ে, প্লীজ!' তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল শারিয়া। 'এই দেখো, আমার গায়ে কোথাও একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

একদম অসহায় একটা কিশোরের মত লাগছে জাদিবকে।

শারিয়ার কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল সে, একটা কথাও বলতে পারল না।

এই সময় দেখা গেল ওদের দিকে ছুটে আসছে আসিফ মির্জা। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে রানাকে সে বলল, 'জোড়া পাহাড় দুটোকে প্যালেস্টাইনের থাবা বলা হয়। দু'সারি পাহাড়ের ভেতর ইজরাইলি সৈন্যরা অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছে। স্কাউটরা বলছে ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না।'

কিসের ভয় কিসের কি, প্রবল উত্তেজনায় শারিয়ার চোখ-মুখ থেকে যেন আলোর আভা ফুটে বেরুচ্ছে। তার অস্থির ভাব দেখে মনে হলো ইজরাইলি সৈন্যদের কাবাব বানাবার জন্যে তখনি ছুটবে। 'কোথায় অ্যামবুশ পেতেছে? কোথায়?'

প্রশ্নটা করার কারণ আছে শারিয়ার। এই এলাকা তার অতি পরিচিত। ঢালের নিচে নেমে মাইলখানেক এগোবার পর একাধিক গিরিপথ দেখতে পাওয়া যাবে, তার মধ্যে অনেকগুলোই খাদের নিচে। পশ্চিমে একটা বাঁধও দিয়েছে ইজরাইলিরা, নদীর পানি থেকে জর্দানকে বঞ্চিত করাই উদ্দেশ্য। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই গিরিপথে ঢোকার একটা পথের দু'পাশের দুটো পাহাড় যেমন বাঘের থাবার মত দেখতে, বেরুবার একটা পথের দু'পাশে একজোড়া পাহাড় প্রায় হুবহু যেন বাঘের মুখ। ওটাকে বলা হয় শের্-এ-প্যালেস্টাইন।

'তা ওরা জানে না,' বলল মির্জা। 'ওরা ইজরাইলি সৈন্যদের নিজের চোখে দেখেনি।'

'তারমানে? তাহলে অ্যামবুশের কথা বলছে কিভাবে?' শারিয়া অবাক।

'ওদের কাছে লেটেস্ট মডেলের একটা রেডিও আছে,' বলল মির্জা। 'যবর-এ-জালিম থেকে কেনা। সেটায় ওয়্যারলেস মেসেজ পিক করা তো যায়ই, দূরত্বও পরিমাপ করা যায়। দু'দল ইজরাইলি বার্তা বিনিময় করছিল, সেটা শুনে ওরা অ্যামবুশ

সম্পর্কে জানতে পেরেছে। ওদের হিসেবে সৈন্যদের একটা দল গিরিখাদের ভেতর কোথাও আছে, আরেকটা আছে মাইল চারেক উত্তরে–মরুভূমিতে কোথাও।'

রানার দিকে তাকাল শারিয়া, কথা বলছে আরবীতে, 'গিরিপথ, নাকি খোলা মরু, কোনদিকে যেতে চাও? খাদের ভেতর ওরা কাছাকাছি, চলো আগে ওদের রক্তে গোসল করে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন মরার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠল হিযবুল্লাহ্ তরুণরা। কি এক উন্মাদনা আর উল্লাসে শারিয়াকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিল তারা। এরকম আগে কখনও দেখেনি রানা। ওর যে পেশা, বহু মানুষের চেহারায় খুনের নেশা ফুটে উঠতে দেখেছে ও। কিন্তু তার সঙ্গে এর কোন তুলনা চলে না। এ শুধু খুন করতে চাওয়া নয়, খুন হতে চাওয়াও। আত্মদানের এই নেশার মধ্যে ফ্যানাটিক্যাল এলিমেন্ট প্রচুর পরিমাণেই আছে, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না রানা। অথচ এ-ও সত্যি যে হিযবুল্লাহ্ তরুণ গেরিলাদের চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা পবিত্র আভা ফুটে উঠেছে। শারিয়ার প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ল রানা। 'কনভয় নিয়ে খাদের ভেতর ঢুকলে ফাঁদে আটকা পড়তে পারি।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল শারিয়া। 'তাহলে আমার যুক্তিও মেনে নাও। সামনে তাকাও, দিগন্ত পর্যন্ত শুধু বালিয়াড়ি। সামনে ও পিছনে যদি শত্রু থাকে, সেটাই কঠিন ফাঁদ। অ্যামবুশ নয়, ওরা আসলে এই ফাঁদ তৈরি করে অপেক্ষায় আছে। জোড়া পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে আমরা যদি সোজা এগোই, ঢাল বেয়ে আমাদের পিছনে উঠে আসবে ওরা। আর সামনে তো আরেক দল আছেই।'

রানা ভাবছে। শারিয়ার হিসেবটা বোধহয় নির্ভুল।

এই সময় বিপদটা টের পেল ওরা। তৃতীয় স্কাউট এল কনভয়ের পিছন থেকে। শারিয়া ও জাদিবের পাশে ঘোড়ার

লাগাম টানল সে। উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করল, 'পিছনে! সৈন্য!'

'এসো, এক কাজ করি,' রানাকে তাড়াতাড়ি বলল শারিয়া। 'জীপ নিয়ে ঢালের নিচে নামি, জীপে আমরা যে-ক'জন ছিলাম—আমি, তুমি আর আমার চারজন ভাই। দেখে আসি সত্যি গিরিখাদের ভেতর ইজরাইলি সৈন্যরা অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছে কিনা।'

'আর কনভয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, খেয়াল করল ওদের কাছে পাত্তা না পেয়ে নিজ গোত্র-প্রধান আর তার দেহরক্ষীদের দিকে চলে গেল স্কাউট।

'এখানে অপেক্ষা করুক,' বলল শারিয়া। 'কিংবা ধীরে ধীরে এগোতে থাকুক। যদি এগোয়, খাদ থেকে বেরিয়ে সামনে কোথাও ওদের সঙ্গে মিলিত হব আমরা।'

'খাদ থেকে ঠিক কোথায় বেরুব?' জানতে চাইল রানা। 'তোমার কাছে এই গিরিপথের ম্যাপ আছে?'

'তা নেই, তবে এঁকে দেখাতে পারি,' বলল শারিয়া। জাদিবের কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে একটা মানচিত্র এঁকে ফেলল সে।

রানা বারবার কনভয়ের পিছনে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ ধুলোবালির ছোট্ট একটা মেঘ দেখতে পেল বহু দূরে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে সেটা। সন্দেহ নেই, ইজরাইলি সৈন্য।

ম্যাপটা শারিয়ার হাত থেকে নিয়ে কনভয়ের দিকে হাঁটা ধরল রানা, ইঙ্গিত করায় ওর পিছু নিয়েছে হামাস লীডার আসিফ মির্জা।

রানার নির্দেশে ট্রাক বহরের সব ক'জন হামাস ড্রাইভারকে খবর দিয়ে দ্রুত ডেকে আনাল মির্জা। লক্ষ রাখা হলো ট্রাইবাল হেডম্যান বা তাদের লোকজন যাতে ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। শারিয়া আর হিযবুল্লাহ্ তরুণদের কাছ থেকেও যথেষ্ট দূরে রয়েছে

ওরা। ম্যাপে আঙুল রেখে মির্জাকে রানা দেখিয়ে দিল গিরিখাদ থেকে ঠিক কোথায় উঠে আসতে চেষ্টা করবে ও। তারপর উপস্থিত সবার উদ্দেশে বলল, 'আমাদের সামনে, পিছনে আর গিরিখাদের নিচে রয়েছে ইজরাইলিরা। খাদের লোকগুলোকে আগে খতম করা দরকার। আমার অনুপস্থিতিতে কনভয়ের নেতৃত্ব দেবে কমান্ডার আসিফ মির্জা। আমি চাই, এই মুহূর্তে ফুলস্পীডে রওনা হয়ে যাও তোমরা। আসিফ মির্জার প্রতিটি নির্দেশ তোমাদেরকে মেনে চলতে হবে। এ-ব্যাপারে কারও কিছু বলবার থাকলে আমি শুনতে রাজি।'

কেউ কিছু বলছে না।

এরপর মির্জাকে এক পাশে সরিয়ে এনে রানা নিচু গলায় বলল, 'যদি দেখো ইজরাইলি সৈন্যরা সংখ্যায় বেশি, যুদ্ধ করে জিততে পারবে না, কনভয় ফেলে জান বাঁচাবে সবাই। এটা আমার নির্দেশ।'

'কাপুরুষের মত পালাব?' বাঘের চেহারায় বিস্ময়।

'এতেই ফিলিস্তিনিদের মঙ্গল হবে,' বলল রানা। 'তবে দেখে যেন মনে না হয় তোমরা পালাচ্ছ।' পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে মির্জার হাতে ধরিয়ে দিল। 'বাতীল-এ-বাহানায় পৌঁছে চোরাবালির ওপারে লুকিয়ো।'

'বেশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার নির্দেশ মেনে নিল মির্জা। 'আর কিছু?'

'যদি দেখো ইজরাইলিদের হাতে আমাদের কেউ ধরা দিচ্ছে বা ধরা পড়ে যাচ্ছে, গুলি করে ফেলে দেবে তাকে। যতই কঠিন মনে হোক; এই কাজে ব্যর্থ হয়ো না।'

'জ্বী, জনাব, আপনার নির্দেশ আমরা সাধ্যমত পালন করব।'

মির্জাকে আরও কিছু নির্দেশ দিয়ে জীপের কাছে ফিরে আসার সময় রানা দেখল ধুলোবালির মেঘটা আকারে আরও অনেক বড় হয়েছে। দুটো ট্রাক আর একটা জীপ চিনতে পারা যাচ্ছে, তবে

এখনও তিন-চার মাইল দূরে ওগুলো। শারিয়াকে রানা বলল, 'স্কাউট তিনজনকে বলো তারা যেন পথ দেখায় আমাদের।'

ইতিমধ্যে দীর্ঘ কনভয় রওনা হয়ে গেছে। প্রথম ট্রাক জীপটাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

স্কাউটদের ডেকে আনার জন্যে একজন গেরিলাকে পাঠাল শারিয়া। তারপর হাফ ট্রাকের দিকে এগোল হিযবুল্লাহ্ গেরিলাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে।

জাদিব ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তবে অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। এতক্ষণ শারিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সে, যতক্ষণ সম্ভব প্রেমিকার স্পর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে রাজি নয়।

'মঁশিয়ে কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন? জীপে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সঙ্গে সুইসাইড স্কোয়াড আছে, কাজেই আপনার নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বলে মনে করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও আপনার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখব।'

কৃতজ্ঞতায় রীতিমত আপ্লুত হয়ে পড়ল জাদিব। এগিয়ে এসে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে; মন না ভরায় পরক্ষণে আবার বুকের সঙ্গে চেপে ধরল ওকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমার ধারণা, শারিয়া আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। ওকে বাধা দেয়ার শক্তি আমার নেই। একটাই কাজ করার আছে আমার, ওর সঙ্গে মরা। আপনি ভাই যেভাবে পারেন ওকে রাজি করান—আমাকেও যাতে সঙ্গে নেয়।'

হাতে বাগিয়ে ধরা সাব মেশিনগান, দশজন হিযবুল্লাহ্ আত্মঘাতী গেরিলাকে নিয়ে ছুটে ফিরে এল শারিয়া। 'স্কাউটরা আসবে না, কনভয়ের সঙ্গে থাকবে,' রানাকে বলল। জাদিবকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠল সে। সর্বনাশ, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে! ছোটো! ছোটো! যে-কোন একটা ট্রাকে উঠে পড়ো...'

রানা বলতে চেষ্টা করল, 'জাদিব বলছিলেন জীপে থাকতে

চান...'

গেরিলারা জীপে উঠছে, লাফ দিয়ে শারিয়াও ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল। রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, 'লুঁয়ে না হয় আনাড়ি, কিন্তু তুমি? জীপ আর হাফ ট্রাকে আমরা সবাই সুইসাইড করতে যাচ্ছি, কি ভেবে ওকে তুমি সঙ্গে নিতে চাইছ? পরমুহূর্তে জাদিবের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? দৌড়াও! বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে...'

রানা ভাবল, সুইসাইড করতে যাচ্ছি? আমিও?

কনভয়ের শেষ ট্রাকটাও নাগালের বাইরে চলে যাবে, এই ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটল জাদিব।

রানা পাশের সিটে উঠে বসতেই জীপ ছেড়ে দিল শারিয়া। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ওকে মির্জার ট্রাকে তুলে দিয়েছ, নির্দেশ দিয়েছ ওর ওপর যেন বিশেষ নজর রাখা হয়। একে তো নিরস্ত্র, তার ওপর আনাড়ি, বডিগার্ড ছাড়া...'

জীপ ঢাল বেয়ে গিরিখাদের ভেতর নেমে আসতেই রোদ ঝলমলে মরু পিছিয়ে পড়ল, চারদিকে অকস্মাৎ নেমে এল গাঢ় ছায়া, প্রায়-অন্ধকারই বলা যায়। মিনিট পাঁচেক পর একটা বাঁক ঘুরল ওরা।

'থামো!' নির্দেশ দিল রানা।

সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষল শারিয়া। 'কি ব্যাপার, রানা?' ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদের পিছনের হাফ ট্রাকটাও দাঁড়িয়ে পড়ছে।

ডান দিকে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা প্রকাণ্ড বোল্ডার দেখাল রানা। 'ওদিকে চলো। কাভার নিয়ে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করি। ইজরাইলি সৈন্যরা সবাই কনভয়ের পিছু নিয়েছে কিনা জানতে হবে।'

রানার নির্দেশ বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিল শারিয়া। বোল্ডারের আড়ালে জীপ নিয়ে এল সে। দেখাদেখি নয়জন গেরিলা সহ হাফ

ট্রাকটাও পৌঁছাল ওদের কাছাকাছি আরেক বোল্ডারের আড়ালে।

'সবাই গ্রেনেড হাতে তৈরি থাকো,' গেরিলাদের নির্দেশ দিল রানা। 'আমি কাউকে সুইসাইড করতে বলব না।'

শারিয়ার ঠোঁটে অদ্ভুত এক গর্বিত হাসি দেখা গেল। 'ওই নির্দেশ তুমি দিলেও কোন কাজ হবে না। ওরা শুধু আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে।'

সবাই ওরা কান পেতে অপেক্ষায় থাকল। যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন ভেসে এল বহুদূর থেকে। শব্দটা পরিষ্কার চেনা গেল না। একবার মনে হলো জেট ফাইটার। এক সময় আওয়াজটা আরও দূরে সরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর ভেসে এল ইজরাইলি আর্মির হেলিকপ্টার গানশিপের কর্কশ শব্দ।

'বুঝতে পারছ তো, রানা?' ফিসফিস করল শারিয়া। 'সব খবর আগে থেকে পেয়ে গেছে ওরা। ওদের টার্গেট শুধু কনভয় নয়–আমি, তুমি, জাদিবও।'

'আমি অবাক হচ্ছি না,' বলল রানা, গম্ভীর। 'ভয়ও পাচ্ছি না।'

'এটা তোমার যুদ্ধ নয়, তারপরও তুমি যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে রামাল্লায় ঢুকেছ, দ্বিতীয়বার সীমান্ত পেরিয়ে ইজরাইলে চলে এসেছ–একা আমি নই, গোটা প্যালেস্টাইন জাতি তোমার প্রতি...'

'থামো, প্লীজ!' দ্রুত বলল রানা। 'ছ'মিনিট পার হতে চলেছে, জীপ ছাড়ো এবার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরুতে চাই আমি, সম্ভব হলে কনভয়ের সামনে কোথাও।'

জীপ গিরিপথে বেরিয়ে এসে আবার ছুটল। পিছনে হাফ ট্রাক সমান তালে ছুটছে। আঁকাবাঁকা পথ, বাঁকগুলোর ওদিকে কি আছে দেখার কোন উপায় নেই। তবে ফেলে আসা পথের কিছু অংশ মাঝে মধ্যে অনেক নিচে দেখতে পাচ্ছে ওরা। চড়াই বেয়ে উঠছে জীপ। তারপর এক সময় নামতে শুরু করল।

পাহাড়ী পথ হঠাৎ কারনিস থেকে নেমে এসেছে বিস্তৃত উপত্যকায়। কিছু কিছু গাছপালা আর ঘাসও চোখে পড়ল। তবে দু'তিনতলা বাড়ি আকৃতির বোল্ডারও ছড়িয়ে আছে গোটা উপত্যকা জুড়ে। এই রকম একজোড়া বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল ইজরাইলির আর্মির একটা ট্যাংক, একজোড়া আর্মারড্ পারসোনেল ক্যারিয়ার আর দুটো আর্মি ট্রাক। দূরত্ব পঞ্চাশ কি ষাট গজ। কোন ব্যস্ততা নেই, আড়াল থেকে সামনের পথে এসে দাঁড়াল ধীরেসুস্থে, হেলেদুলে। ওদের এই আয়েশী ভঙ্গি ভাল লাগল না রানার। জীপে মেশিনগান আছে, তবে গুলি করতে নিষেধ করল গেরিলাদের। ট্যাংকের বিরুদ্ধে ওতে কোন লাভ হবে না।

শারিয়া আগেই জীপ থামিয়ে ফেলেছে, ব্যাক গিয়ার দিয়ে দ্রুত পিছু হটতে শুরু করল। পাথরের একটা স্তূপকে পাশ কাটাচ্ছে হাফ ট্রাক, জীপের দেখাদেখি সেটাও পিছু হটছে, ঝপ ঝপ করে সাতজন হিযবুল্লাহ্ নিচে নেমে গড়িয়ে দিল নিজেদের শরীর। নুড়ি পাথরের উঁচু ও দীর্ঘ স্তূপ পেয়ে যাওয়ায় মাথা নিচু করে সামনের দিকে ছুটছে, প্রত্যেকের হাতে সাব মেশিনগান।

পিছু হটে এসে ওদের জীপ আর হাফ ট্রাকও বড় আকৃতির দুটো বোল্ডারের নিচে আড়াল পেয়ে গেল।

'ওরা আমাদের নিয়ে খেলছে,' বিড়বিড় করল রানা। 'এখন পর্যন্ত একটা গুলিও করেনি, অথচ সুযোগ ছিল।'

'জানি কি বলতে চাইছ,' ফিসফিস করল শারিয়াও। 'সম্ভবত আমাদের পিছনেও ওদের একটা দল আছে।' হঠাৎ শারিয়ার চোখের দৃষ্টি খোলা তলোয়ারের মত ধারাল হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস ফেলছে ফোঁস-ফোঁস করে। 'তবে ওরা নয়, রানা, খেলাটা আমরা খেলছি।'

রানা জানে কি বলতে চাইছে শারিয়া।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। সামনে ও পিছনে, দু'দিকেই

নজর রাখছে ওরা। ট্যাংক, আর্মারড্ ভেহিকেল আর ট্রাক ভর্তি সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছে ইজরাইলিরাও। ব্যাপারটা অনিশ্চিত। এক পক্ষ জানে না আরেক পক্ষ কি করতে যাচ্ছে।

তারপর সাঁজোয়া যানবাহনের যান্ত্রিক ও গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে এল পিছন থেকে। ইজরাইলি সৈন্যদের দ্বিতীয় দলটা আসছে। রানা ও শারিয়া স্যান্ডউইচে পরিণত হয়েছে।

দশ

সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেঙে প্রথমে একজোড়া ইজরাইলি এয়ার ফোর্সের জেট ফাইটার উড়ে গেল কনভয়ের মাথার ওপর দিয়ে। তীর বেগে ছুটছে আঠারোটা ট্রাক, তা সত্ত্বেও বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে ঝাঁকি খেলো গোটা কনভয়। নেহাত ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে ফাইটার থেকে গুলি বা রকেট ছোঁড়া হয়নি। ওগুলো দূরে মিলিয়ে যাবার পরই আকাশের দূর প্রান্তে কালো ভোমরের মত দুটো উড়ন্ত বস্তু উদয় হলো দেখে হামাস গেরিলারা হাসল। ওদের কাছে মোবাইল রকেট লঞ্চার আছে, খুব একটা ভারী নয়, কাঁধে ঠেকিয়ে অপারেট করা যায়। কালো ওই ভোমরগুলো চিনতে পেরেছে তারা। ইজরাইলি এয়ার ফোর্সের হেলিকপ্টার গানশিপ। রেঞ্জের মধ্যে এলে ওগুলোকে ফেলে দেয়া পানির মত সোজা।

তবে পিছনেও নজর রাখতে হচ্ছে মির্জাকে। ট্রাক ও জীপ নিয়ে ইজরাইলি সৈন্যরা দু'মাইলের মধ্যে চলে এসেছে। রানার দেয়া ম্যাপটা হাঁটুর ওপর ফেলে খুলল ও। পাহাড় প্রাচীর ধনুকের

মত বেঁকে যাবে, তারপর বাঁ পাশে দেখা যাবে বালি আর পাথরের রাজ্য। এই পাথর কোথাও স্তূপ হয়ে নেই, বা কোথাও পাঁচিলের মত বাধা তৈরি করেনি। তাসত্ত্বেও ওদিকে কেউ যায় না—না হেঁটে, না গাড়ি নিয়ে।

গোটা জায়গাটার আয়তন দশ বর্গমাইল। নাম বাতীল-এ-বাহানা। আরবী-ফারসী শব্দ দিয়ে তৈরি এই নামের মানে সম্ভবত 'আবদার প্রত্যাখ্যান'। এখানে চোরাবালির সংখ্যা অগুনতি, কিন্তু কোথায় আছে আর কোথায় নেই সেটা পরীক্ষা না করে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। তবে এই জায়গায় বাঘের থাবা আকৃতির একজোড়া পাহাড় আছে, পাহাড় দুটোর মাঝখানে আছে এক ঢাল। ওই ঢাল থেকে একটা পথ চলে গেছে উত্তর দিকে। নিরাপদ পথ, কোথাও কোন চোরাবালি নেই।

কনভয় বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় রেঞ্জের মধ্যে চলে এল কালো ভোমর। ইজরাইলি পাইলটরা ভারি চালাক, প্রথমে কনভয়ের দিকে একটা গানশিপ নিয়ে এগোল তারা।

কিন্তু হামাস গেরিলারা তাদের চেয়েও চালাক। একটা গানশিপে তাদের মন ভরবে না, তারা দুটোকেই রেঞ্জের মধ্যে পাবার অপেক্ষায় থাকল।

কনভয়ের যথেষ্ট ওপর দিয়ে উড়ে গেল কালো ভোমরটা। গেরিলারা সাব মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল। দু'পক্ষই জানে, এতে কোন কাজ হবে না।

গেরিলারা তাদের মোবাইল রকেট লঞ্চার লুকিয়ে রেখেছে।

ইজরাইলি পাইলটরা সামনের সেনা চৌকির সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশ চাইল। সেনা চৌকি থেকে বলা হলো, কনভয়ের ওপর গুলি করা যাবে না, কারণ ট্রাকগুলোয় কোটি কোটি ডলারের আধুনিক আর্মস আছে। নির্দেশ দেয়া হলো, পাইলটরা ফাঁকা গুলি করে কনভয়কে যেন সেনা চৌকির দিকে আসতে বাধ্য করে। আর যদি কনভয় ছেড়ে হামাস গেরিলারা পালাতে চেষ্টা করে,

গুলি করতে হবে বুঝেশুনে, কারণ ওদের সঙ্গে সম্ভবত ইনফরমেশনের তিনটে খনি আছে, নাম শাতিল শারিয়া, মাসুদ রানা ও লুঁয়ে জাদিব। রক্ত-মাংসের এই তিন খনিকে ধরে তেল আবিবে পাঠাতে হবে।

বাঁকটা ঘোরা শেষ করল কনভয়। ক্যাব থেকে মাথা ও হাত বের করে পিছনের ট্রাকগুলোকে সংকেত দিল মির্জা।

ট্রাক বহর একযোগে স্পীড কমাচ্ছে। জোড়া কালো ভোমরকে লক্ষ্য করে দশটা রকেট ছুটল। দুশো গজ দূরে, আকাশের গায়ে একযোগে বিস্ফোরিত হলো ওগুলো। ওদিকের আকাশ কমলা ও রক্তবর্ণ আগুন, কালো ধোঁয়া আর ধুলোবালির মেঘে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর কি করতে হবে গেরিলাদের বলা আছে মির্জার। পালাবার জন্যে এক নম্বর, অর্থাৎ ওর ট্রাকটা খালি রাখা হয়েছে। কিছু রসদ, পানি, স্লীপিং ব্যাগ, কুণ্ডলী পাকানো রশি ছাড়া আর কিছু নেই। চারজন গেরিলা ট্রাকটার পিছনে কাজ করছিল। কনভয় থামতেই অন্যান্য ট্রাকের ড্রাইভার, হেডম্যান, তাদের বডিগার্ড, তিন স্কাউট, সবাই ছুটে এসে এক প্রস্থ করে রশি সংগ্রহ করল প্রথম ট্রাকের পিছন থেকে। জাদিবকে দেখতে পেয়ে মির্জা বলল, 'মঁশিয়ে। আপনি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকুন।' তার হাতে এক প্রস্থ রশি ধরিয়ে দিল সে।

জাদিবের চোখ দুটো ভেজা ভেজা। 'আমার শারিয়া বেঁচে আছে তো, ভাই মির্জা?'

'ওঁর সঙ্গে জান-কোরবান হিযবুল্লাহ্‌রা আছে না?' হেসে উঠে জাদিবকে আশ্বস্ত করল মির্জা।

ট্রাইবাল হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডরা এখনও নিশ্চিত নয়, মির্জার নেতৃত্বে হামাস গেরিলারা ঠিক কি করতে যাচ্ছে। তারা সবাই এক হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলল, তারপর এগিয়ে এল মির্জার দিকে।

এ-ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্যে যেন তৈরি হয়েই ছিল গেরিলারা। তারা একটা সময় পর্যন্ত অন্যমনস্কতার ভান করে অপেক্ষায় থাকল। তারপর যখন দেখল যে মির্জা ও জাদিব ঘেরাও হয়ে গেছে, হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডদের পিছনে পৌঁছে গেল চোখের পলকে, কয়েকজন গেরিলা বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ। প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল জাদিব। 'তোমরা কেউ এমন কিছু বোলো না বা কোরো না যাতে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনি।'

'আমরা তোমাদের সঙ্গে বাতীল-এ-বাহানায় যেতে রাজি নই,' একজন হেডম্যান, কাসুরিয়া বায়ুউলিকে বলতে শোনা গেল। মির্জার বক্তব্য শুনে রেগে গেছে সে। তাকে সমর্থন করে মারকান কাসুরি বলল, 'আমরা কাপুরুষ নাকি যে কনভয় ছেড়ে পালাব!'

উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় জাদিব আবার বলল, 'সবারই মতামত দেয়ার স্বাধীনতা আছে। সবাই মিলে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নাও।'

'তারচেয়ে কনভয় আমাদের হাতে ছেড়ে দাও,' প্রস্তাব দিল হেডম্যান আবরুদি আলফাজ। 'আমরা চেষ্টা করে দেখি...'

মির্জার মনে পড়ল, জনাব মাসুদ রানা বলে গেছেন ওদের ঠিক কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে। সে শান্ত ও ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কি দেরি করিয়ে দেয়া, আমরা যাতে ধরা পড়ি? শোনো, এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। যারা আমাদের সঙ্গে যাবে তারা হাত তোলো।'

না, কেউ তারা হাত তুলল না।

তিন সেকেন্ড পর মির্জার সংকেতে গুলি হলো। বিদ্রোহীদের হাতে লুকানো পিস্তল ও ছুরি বেরিয়ে এলেও, কেউ তারা সে-সব ব্যবহার করার সুযোগ পেল না। তিন হেডম্যানকে গুলি করা হলো বাম বুকে পিস্তল প্রায় ঠেকিয়ে। খুলি ওড়ানো হলো তাদের

বডিগার্ডদের। গেরিলারা পিস্তলের ট্রিগার টেনে আর দেরি করছে না, লাফ দিয়ে পিছু হটছে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত লাগার ভয়ে। স্কাউটরা ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটে পালাচ্ছে দেখে পিছন থেকেই ব্রাশ করল মির্জা। তিন সওয়ার ঝাঁঝরা হলেও, ঘোড়াগুলো অক্ষত থাকল।

'দৌড়! দৌড়! দৌড়!' মির্জার গলার রগ ফুলে উঠল। পিঠ থেকে লাশ পড়ে গেছে, ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে ছুটল গেরিলারা।

জাদিব এক পুকুর রক্ত আর দশ-বারোটা লাশের মাঝখানে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি জনাব আমার সঙ্গে আসুন।' জাদিবের হাত ধরে টান দিল মির্জা। কনভয়ের প্রথম ট্রাকে আগেই উঠে বসেছে একজন গেরিলা, জাদিবকে নিয়ে মির্জা উঠে বসতেই স্টার্ট দেয়া গাড়ি ছেড়ে দিল সে। বড় বড় বোল্ডারগুলোকে পাশ কাটিয়ে জোড়া পাহাড়ের দিকে ছুটছে ট্রাক। গেরিলারা পিছিয়ে পড়ল, তবে একই দিকে ছুটছে তারা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আপাতত পাথর আর বালির রাজ্যে হারিয়ে যাব,' বলল মির্জা। 'পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে এই একটা ট্রাকে সবাই উঠে ফিলিস্তিনিদের কোন গ্রামের দিকে চলে যাব।'

'কনভয়? এত টাকার আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন?'

'জান বাঁচানো ফরজ, মশিয়ে। এরপর অ্যাপাচী হেলিকপ্টার পাঠাবে ওরা। কনভয় রক্ষা করতে গিয়ে সবাই মিলে আত্মহত্যা করার তো কোন মানে হয় না।'

'তুমি কি প্রলাপ বকছ? নাকি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কোন হামাস গেরিলা কমান্ডারকে আমি এভাবে কখনও কথা বলতে শুনিনি। তোমাকে আমার কাপুরুষ মনে হচ্ছে।'

মির্জার হাসি পেয়ে গেল। 'একটু আগে দু'হাতে মুখ ঢেকে

আপনাকেই না থরথর করে কাঁপতে দেখলাম, জনাব?'

রেগে উঠল জাদিব। 'হ্যাঁ, আমি রক্তপাত দেখে ভয়ে কাঁপছিলাম। কারণ এ-সবে আমি অভ্যস্ত নই। আমি একজন জার্নালিস্ট। যখন কিছু লেখার প্রয়োজন হয়, তখন কেউ আমাকে ভয়ে কাঁপতে দেখবে না। তুমি একজন যোদ্ধা, তোমার মুখ থেকে জান বাঁচানো ফরজ শুনতে আমার ভাল লাগল না।'

মির্জা এখনও হাসছে। 'শুনুন তাহলে,' বলল সে, 'আমার মুখ থেকে বেরুলেও কথাটা আসলে জনাব মাসুদ রানার।'

কথাটা শুনে একদম চুপ হয়ে গেল জাদিব।

জোড়া পাহাড়ের আড়ালে পৌঁছানোর সময় পাওয়া যাবে না, তার আগেই ধনুক আকৃতির বাঁক ঘুরে কনভয়ের সামনে পৌঁছে যাবে ইজরাইলি সৈন্যরা। এটা বুঝতে পেরে একজোড়া প্রকাণ্ড বোল্ডারের পিছনে ট্রাক দাঁড় করাবার নির্দেশ দিল মির্জা। ট্রাক থামা মাত্র পিছিয়ে পড়া হামাস গেরিলারা যে-যেখানে পারল আড়াল নিল। প্রত্যেকের সঙ্গে রশি থাকায় চোরাবালিতে গলা পর্যন্ত ডুবে যাবার পরও তিনজন সঙ্গীকে ওরা টেনে তুলে আনতে পেরেছে। প্রথম ঘোড়াকে জোর করে নামানো হয়েছে ওই তিন মরণ ফাঁদের একটায়। ওটার লাগাম ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছেঁড়া লাগামের একটা অংশ আটকানো হয়েছে তিন মণী এক পাথরের নিচে, অপরপ্রান্তটা কামড়াবার সুযোগ দেয়া হয়েছে ঘোড়াকে। ঘোড়া এখন যদি লাগামটা মুখ থেকে ছেড়ে দেয়, বালির নিচে ডুবতে আধ মিনিটও লাগবে না। কিন্তু অবলা প্রাণীও বোঝে নিজের কিসে ভাল। ঘোড়াটা যথেষ্ট আতঙ্কিত, অথচ চিৎকার করছে না, কারণ জানে মুখ খুললেই লাগামটা বেরিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। স্বাধীনভাবে ছুটছে সে। অসংখ্য চোরাবালির কোনটাতেই এখনও তার পা পড়েনি। তৃতীয় ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে দীর্ঘ এক প্রস্থ রশি জোড়া দেয়া হয়েছে, অপরপ্রান্তটা চোরাবালি থেকে নিরাপদ দূরে একটা

বোল্ডারের গায়ে জড়িয়ে বাঁধা। বালির নিচে ওই ঘোড়ার পেটের অর্ধেকটাই ডোবা। তবে লাগাম বা রশি ধরে টানলে প্রথমটার মত এটাকেও বাঁচানো সম্ভব। ঘোড়া দুটোর এই হাল ইচ্ছে করেই করা হয়েছে, ইজরাইলি সৈন্যরা এদিকে যদি এসেই পড়ে, ওগুলোর অবস্থা দেখে আর এগোবার সাহস পাবে না।

ট্রাক থেকে নেমে বোল্ডারের বাইরে উঁকি দিল মির্জা। চোরাবালির ফাঁদে আটকানো ঘোড়া দুটোর কাছ থেকে অন্তত পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে ওদের ট্রাক। হামাস গেরিলাদের বেশ কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছে সে, ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে কম করেও দুশো গজ দূরে তারা। মির্জা আন্দাজ করল কনভয় থেকে অন্তত পৌনে এক মাইল দূরে রয়েছে তাদের ট্রাক।

ইজরাইলি সৈন্যরা এখনও কনভয়ের কাছে এসে পৌঁছায়নি। সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে মির্জা। হঠাৎ মনে পড়তে পকেটে হাত দিয়ে একটা শক্তিশালী রেডিওর অস্তিত্ব অনুভব করল সে। জিনিসটা তাকে জনাব মাসুদ রানা দিয়ে গেছেন—সময় মত ব্যবহার করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল মির্জা। হাতঘড়িতে চোখ বুলাল সে। দিনের আলো খুব বেশি হলে আর দেড় ঘণ্টা পাওয়া যাবে।

অপেক্ষার সময়টা কাটতে চাইছে না, এই সময় ট্রাকের ক্যাব থেকে নিচে নেমে মির্জার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল জাদিব। ড্রাইভারও নেমে এসে বসে শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তার কাঁধে স্ট্র্যাপের সঙ্গে আটকানো একটা সাব মেশিনগান তো আছেই, বেল্টের সঙ্গে কোমরে একটা পিস্তলও গোঁজা রয়েছে।

'কার কপালে কি আছে জানি না,' বলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করল মির্জা। 'আসুন, আপনাকে গুলি চালানো শেখাই।'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল জাদিব। 'দূর? ও-সব আমার কাজ

নয়, আমি শিখতেও চাই না।'

'ধরুন, এমন অবস্থা হলো যে কারও গুলি খেয়ে আপনি মারা যাবেনই,' বলল মির্জা, 'তখন আপনার ইচ্ছে হবে না লোকটাকেও আপনি মারেন? কিংবা তাকে মেরে নিজেকে বাঁচান?'

'তা হবে, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর আমি তাকে মারতে পারছি না...'

'পারছেন; যদি একটু মন দিয়ে শেখেন পিস্তল কিভাবে ধরতে হয়, শত্রুকে কত কাছে পেতে হয়, কিভাবে ট্রিগার টানতে হয়।'

'ঠিক আছে, শেখাও আমাকে,' উৎসাহ দেখাল জাদিব।

জাদিব শিখছে, এক মিনিট পরই ওদের কনভয়ের কাছে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেল ইউনিফর্ম পরা ইজরাইলি সৈন্যদের। এতক্ষণে পৌঁছেছে তারা। নিজেদের ট্রাক ও জীপ নিশ্চয়ই কনভয়ের লেজের দিকে থামিয়েছে, পাহাড়ের আড়ালে, তাই এখান থেকে সেগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। তবে সৈন্যদের সংখ্যা দেখে রীতিমত শঙ্কিত বোধ করল মির্জা। কিছু গেরিলা কনভয়ের কাছাকাছি বোল্ডারের আড়ালে পজিশন নিয়ে আছে, তার সংকেত পেলেই সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। তাকে সেই নির্দেশই দিয়ে গেছেন জনাব মাসুদ রানা। কিন্তু সংখ্যায় ইজরাইলিরা এত বেশি, যদি ধাওয়া করে?

যা আছে কপালে, মির্জা চিৎকার করে বলল, 'ফায়ার!' হামাস গেরিলা যার কানে শব্দটা ঢুকল সে-ই পুনরাবৃত্তি করল মির্জার নির্দেশঃ 'ফায়ার!' এভাবে ক্রমশ কনভয়ের কাছাকাছি পাঁচ গেরিলার কাছে পৌঁছে গেল আওয়াজটা। পাঁচটা পজিশন থেকে একযোগে গর্জে উঠল পাঁচটা সাব মেশিনগান।

ইজরাইলি সৈন্যরা এ-ধরনের একটা হামলার জন্যে তৈরিই ছিল। তাদের একটা দল বোল্ডারের আড়াল থেকে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল। আরেকদল অবিশ্বাস্য তৎপরতা দেখিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকগুলোর খালি ক্যাবে। প্রতি ট্রাকে দু'জন করে সৈন্য,

একজন জানালা দিয়ে কারবাইনের ব্যারেল বের করে শত্রুর সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আরেকজন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ইজরাইলিদের উপস্থিত বুদ্ধি ও শৃংখলার প্রশংসা করতে হয়। প্রায় একযোগে কনভয়ের সবগুলো ট্রাক চলতে শুরু করল। সামনে রয়েছে মেশিনগান বসানো দুটো ট্রাক।

দেখতে দেখতে কনভয়ের স্পীড উঠল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। গেরিলারা বিরতিহীন গুলি করলেও, আড়াল থেকে কেউ বেরুল না, আত্মঘাতী হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না তাদের কারও মধ্যে। যে-সব সৈন্য পাল্টা জবাব দিচ্ছিল, শত্রুপক্ষের শক্তি ও সাহস সম্পর্কে এরই মধ্যে একটা ধারণা পেয়ে গেছে তারা। তাছাড়া দূর থেকে ঘোড়াগুলোর অবস্থা দেখে গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছেও নেই তাদের। ক্রল করে পিছু হটল সবাই, চোখের আড়ালে সরে গিয়ে উঠে পড়ল নিজেদের আর্মারড্ ভেহিকেলে। আর্মারড্ ভেহিকেল ফুলস্পীডে পিছু নিল সদ্য দখল করা কনভয়ের।

জাদিবকে পিস্তল চালানো শেখাচ্ছে ড্রাইভার, পকেট থেকে রেডিওটা বের করে অন করল মির্জা।

'কি ওটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল জাদিব।

'একটা রেডিও। তবে গান বা খবর শোনার জন্যে নয় এটা—বোধহয় এ-সব কাজে লাগেই না।'

'তবে কি কাজে লাগে?' জাদিব আরও বিস্মিত। 'তুমি বোতামে চাপ দিচ্ছ কেন?'

'জনাব মাসুদ রানা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কিভাবে এটা অপারেট করতে হয়,' বলল মির্জা। 'কি কাজে লাগে? মঁশিয়ে, মাফ করবেন, আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। শুধু জানি এটা দিয়ে রেডিও ওয়েভ পাঠানো যায়। সেই বেতার তরঙ্গ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নড়িয়ে দিতে পারে। ওগুলো নড়লে

বিস্ফোরক বা বোমায় ফিট করা টাইমিং ও ডিটোনেটিং মেকানিজম সচল হয়ে উঠবে।'

'বলছ জানো না, অথচ শুনে মনে হলো একজন এক্সপার্ট কথা বলছে।' জাদিবের যেন একটু অভিমান হলো। 'কনভয়ে আর্মস্ অ্যান্ড অ্যামিউনিশন আছে। হয়তো কিছু বিস্ফোরকও আছে। ওগুলো ফাটাচ্ছ? ইজরাইলি সৈন্যরা যাতে ওগুলো ব্যবহার করতে না পারে?'

'জনাব মাসুদ রানা আমাকে বোতাম টিপে রেডিওর ডিসপ্লেতে সতেরোটা নম্বর আনতে বলেছেন। একটা করে নম্বর আনব, তারপর এভাবে লাল বোতামটায় চাপ দেব। একই সঙ্গে চাপ দেব টাইমিং সুইচে—এভাবে।' বোতাম ও সুইচে চাপ দিয়ে দেখাল সে, তারপর বলল, 'এগারোটা হলো। আর বাকি ছ'টা। কি ফাটাচ্ছি বা কেন ফাটবে, তা আমাকে উনি বলেননি।'

লাফ দিয়ে দাঁড়াল জাদিব। 'কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটলে এখান থেকে দেখা যাবে!' বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে দূরে তাকাল সে।

তির্যক একটা পথ ধরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওদের বেদখল হয়ে যাওয়া কনভয়। কনভয়ের সামনে ও পিছনে ইজরাইলি সৈন্যদের আর্মারড্ ভেহিকেল আর ট্রাক দেখা যাচ্ছে। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল কনভয়। কোন বিস্ফোরণ ঘটল না।

দু'আড়াইশো গজ দূরে ঘোড়া দুটোকে উদ্ধার করছে কয়েকজন গেরিলা। মির্জা একটা বোল্ডারের ওপর উঠে দাঁড়াল, গেরিলারা তাকে দেখতে পেয়ে দিক বদলে এদিকে ছুটে আসছে।

ট্রাকের কাছে সবাই পৌঁছেছে মাত্র, এই সময় এক সঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটতে শুরু করল। প্রথমে আকাশে ফিরে এল আগের সেই জেট ফাইটার দুটো। এবার ভাগ্য বিরূপ, রকেট থেকে হরদম শেল ছুঁড়ছে গানাররা। তারপর মির্জার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যি প্রমাণিত করে উড়ে এল এক ঝাঁক অ্যাপাচী হেলিকপ্টার।

কম করেও দুশো সৈন্য নামল ঠিক যেখানটায় কনভয় দাঁড় করিয়েছিল ওরা। হাতে লাইট মেশিনগান, ফায়ার করতে করতে বালি আর পাথরের রাজ্যে ঢুকে পড়ল তারা। এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, হামাস গেরিলাদের প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করবে।

মির্জা তার গেরিলাদের নির্দেশ দিল, 'লড়ে মরো! খবরদার, কেউ পালাবে না!'

'আমি না! আমি না!' দু'হাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল জাদিব। 'আমি একজন নিরীহ জার্নালিস্ট! আমাকে লড়তে বোলো না।'

'লড়তে হবে না, মঁশিয়ে, আত্মরক্ষা করুন।' বলে মুখ থেকে জাদিবের হাত নামিয়ে তাতে একটা পিস্তল গুঁজে দিল মির্জা। 'এর মধ্যে ছ'টা গুলি আছে, অন্তত ছয়জনকে মেরে তারপর মরবেন।'

পিস্তলটা ফেলে দিতে গেল জাদিব, কিন্তু কি মনে করে ফেলল না। অকস্মাৎ সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে ছুটল্ সে সৈন্যরা যেদিক থেকে আসছে ঠিক তার উল্টোদিকে।

সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু, মুহূর্তেই জাদিবের কথা ভুলে গেল ওরা। মির্জার নির্দেশে পজিশন নিল গেরিলারা। দুশো ইজরাইলি সৈন্য হেলিকপ্টার গানশিপ আর জেট ফাইটারের ছত্রছায়ায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সবাই জানে কি ঘটতে যাচ্ছে। সেজন্যে কেউ দুঃখিত নয়। মাতৃভূমির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্যেই জঙ্গি সংগঠন হামাসে নাম লিখিয়েছে তারা।

কিন্তু এই সময় আরেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। বাঘের মাথা আকৃতির জোড়া পাহাড়ের মাঝখান থেকে, ঢাল বেয়ে উঠে এল সেই জীপটা—রানা ও শারিয়াকে নিয়ে।

জীপটা দেখতে পেয়ে আর ওদেরকে চিনতে পেরে মির্জা ও তার সঙ্গীরা হঠাৎ বেঁচে থাকার প্রেরণা অনুভব করল। কিন্তু তাদের সেই প্রেরণা বিশ সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না। আশার

আলো দপ্ করে নিভে গেল জীপটার পিছু নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসা ইজরাইলি সৈন্যদের আর্মারড্ ভেহিকেলগুলোকে দেখে। প্রথমে একটা জীপ, তারপর দুটো আর্মারড্ পারসোনেল ক্যারিয়ার, ওগুলোর পিছনে একটা ভ্যান, সবশেষে একটা ট্যাংক।

ইজরাইলি সৈন্যদের কাছে অস্ত্রের কোন অভাব নেই, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে রানা ও শারিয়াকে লক্ষ্য করে তারা একটা গুলিও ছুঁড়ছে না। সম্ভবত জীবিত ধরাটাই উদ্দেশ্য।

হামাস কমান্ডার মির্জা আর তার সঙ্গীরা হঠাৎ খেয়াল করল, যে সৈন্যগুলো ওদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছিল তারা ঘুরে গেছে, ছুটে ফিরে যাচ্ছে যে-যার কপ্টারের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাপাচীর ঝাঁকটা আকাশে উঠল। তির্যক একটা পথ তৈরি করে ছুটছে ওগুলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শারিয়া ও রানার সামনে পৌঁছে ল্যান্ড করাই পাইলটদের উদ্দেশ্য। ওদের জীপটাকে ঘিরেই যেন আকাশে চক্কর দিচ্ছে জেট ফাইটার দুটো।

না, রানা ও শারিয়ার সামনে পালাবার কোন পথ খোলা নেই। গিরিখাদের ভেতর সামনের ইজরাইলি সৈন্য আর সাঁজোয়া যানবাহন ধ্বংস করার জন্যে একে একে সাতজন হিযবুল্লাহ্ গেরিলাকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। বাকি যারা ছিল তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পিছনের দলটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। সেই দলটাই গিরিখাদের ভেতর থেকে ধাওয়া করে মরুভূমির খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এসেছে।

ঘটনাটা অনেক দূরে ঘটল, সঙ্গে বিনকিউলার থাকায় পুরো দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল মির্জা। সামনে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার নামছে দেখে জীপের গতি কমাতে বাধ্য হলো শারিয়া।

দেখতে দেখতে দৌড় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটল।

ইজরাইলি সৈন্যদের ট্রাক ও আর্মারড্ ভেহিকেল ঘিরে ফেলল শারিয়ার জীপটাকে। ওদের দু'জনকে মাথার ওপর হাত তুলে জীপ থেকে নামতে দেখল মির্জা।

কপ্টারগুলো আবার আকাশে উঠল, চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই। দেখাদেখি জেটগুলোও। আল্লাহ পাক কি ওগুলোর পাইলট আর গানারদেরকে আমাদের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন?—সকৃতজ্ঞচিত্তে ভাবল মির্জা। তারপর সে দেখল, ইজরাইলি সৈন্যরা রানা আর শারিয়াকে একটা আর্মারড্ পারসোনেল ক্যারিয়ারে তুলে নিল। ওদের সাঁজোয়া যানগুলো রওনা হলো অ্যাপাচী কপ্টারগুলো যেদিকে গেছে তার ঠিক উল্টোদিকে। শারিয়ার জীপটা ওখানেই পড়ে থাকল, সম্ভবত বোমাটোমা থাকতে পারে ভেবে ইজরাইলি সৈন্যরা ফেলে যাচ্ছে ওটাকে।

'ওঁদেরকে সেনা চৌকিতে নিয়ে যাচ্ছে,' সবার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল মির্জা। 'রাতে হামলা করলে ছিনিয়ে আনা সম্ভব।'

'মাত্র আমরা এই ক'জনে?' একজন গেরিলা জিজ্ঞেস করল। 'হিযবুল্লাহ্‌র ঘাঁটি তো কাছেই, একটা খবর দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসবে ওরা...'

'গুড আইডিয়া!' সমর্থন করল মির্জা। একটু পরই তীর বেগে ছুটল ওদের ট্রাক, জর্দান সীমান্তের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এগারো

আর্মারড্ পারসোনেল ক্যারিয়ার রানা ও শারিয়াকে নিয়ে কাছাকাছি সেনা চৌকিতে পৌঁছাল রাত সাড়ে সাতটায়। মোসাদ

হেডকোয়ার্টার তেল আবির থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে, প্রথমে বন্দিদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। শাতিল শারিয়ার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বিশেষ সমস্যা হলো না। শারিয়া নিজেই জানাল সে কে। জেরুজালেম থেকে পাঠানো ফ্যাক্স-ফটো দেখে তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। তার সঙ্গীটি নিজেকে একজন ল্যাটিন আমেরিকান বলে দাবি করছে, নাম মিগুয়েল রডরিকো, পেশায় জার্নালিস্ট, আর্জেন্টিনার 'ওলে ওলেগা' পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি–বলছে, আসন্ন ইরাক যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করার জন্যে জর্দানে পৌঁছেছিল সে, ওখানে তার সঙ্গে শারিয়ার পরিচয় হয়। তারপর ওর সঙ্গে ইজরাইলে ঢুকে পড়ে, উদ্দেশ্য ছিল হামাস ও হিযবুল্লাহ্‌দের অপারেশন তথা নৃশংসতার ওপর রিপোর্ট তৈরি করা।

তারপর খবর এল, জেরুজালেম থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তারা 'নেইকাফ' গ্যারিসনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে, ওখানেই শারিয়াকে ইন্টারোগেট করবে তারা। ইতোমধ্যে সেনা চৌকির অফিসাররা জেনেছে, ফিলিস্তিনিদের আর্মস ও অ্যামিউনিশনের দ্বিতীয় কনভয়টা আটক করে নেইকাফ গ্যারিসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর প্রথম কনভয়টা যে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরের 'বারাকাত' গ্যারিসনে পৌঁছেছে, এটা তো বাসী একটা খবর।

ইজরাইলিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল রাত ঠিক আটটায়। পঁয়তাল্লিশ মাইল ব্যবধান, অথচ একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে নেইকাফ আর বারাকাত গ্যারিসন একযোগে বিস্ফোরিত হলো। কত লোক মারা গেল তার হিসেব পেতে কয়েক হপ্তা সময় লেগে যাবে, কারণ দুটো গ্যারিসনই নতুন, গড়ে তোলা হয়েছিল ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের সদ্য তৈরি বিশাল দুই মহল্লার ভেতর। তবে সেনা চৌকির অফিসাররা ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শুনে সামরিক যানবাহনের একটা আনুমানিক

হিসেব বের করল–কমপক্ষে বারোশো সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়েছে।

মোসাদ ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে নতুন মেসেজ এল, অন্য কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্দিদের সেনা চৌকিতে রেখেই ইন্টারোগেট করা হোক। নেইকাফ ও বারাকাত গ্যারিসন বিধ্বস্ত হয়েছে কনভয় বিস্ফোরিত হওয়ায়। ধারণা করা হচ্ছে, দুটো কনভয়ের চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটা ট্রাকে শুধু বিস্ফোরকই ছিল, রেডিও ওয়েভ পাঠিয়ে ক্লক মেকানিজম অ্যাকটিভেটের মাধ্যমে ওই বিস্ফোরক ডিটোনেট করা হয়। মেসেজে আরও বলা হলো, এই বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী সম্ভবত শাতিল শারিয়াই। তাকে ভালমত ইন্টারোগেট করলে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসবে।

ইজরাইল সরকার দেশজুড়ে গোপন রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করল। আমেরিকার নির্দেশ আছে, ইরাক আক্রমণের পূর্ব-মুহূর্তে ইজরাইলকে যতটা সম্ভব সংযত আচরণ করতে হবে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তার উপস্থিতি অবশ্যই সীমিত রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট অ্যারিয়েল শ্যারন-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজ রাত থেকে নিউজ সেনসরশিপ চালু করা হলো। আরেক সিদ্ধান্তে বলা হলো, জর্দান-ইজরাইল সীমান্ত সীল করে দেয়া হোক।

এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ফলে হামাস কমান্ডার আসিফ মির্জার নেতৃত্বে গেরিলারা সীমান্ত পেরিয়ে জর্দানে পৌঁছাতে পারল ঠিকই, কিন্তু হিযবুল্লাহ্ আত্মঘাতী গেরিলাদের নিয়ে তারা আর ইজরাইলে ফিরতে পারল না।

রানা ও শারিয়াকে উদ্ধার করার ক্ষীণ যে আশাটা ওদের মনে জেগেছিল, অঙ্কুরেই তা বিলীন হয়ে গেল। এখন আর ওদের জন্যে কারও কিছু করার নেই।

অন্ধকার তাঁবুর ভেতর দুটো টর্চ জ্বলছে। টর্চ দুটো কটে শায়িত

সম্পূর্ণ নগ্ন ও স্থির একটা নারীমূর্তির দিকে তাক করা। তাঁবুর বাকি অংশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে সেনা চৌকির অফিসাররা। তাদের কমান্ডার একজন মেজর, ইন্টারোগেট করছে বিবস্ত্র নারী, অর্থাৎ শাতিল শারিয়াকে।

শারিয়ার পায়ের কটে শুয়ে রয়েছে রানা। হাত-পা স্ট্র্যাপ দিয়ে কটের সঙ্গে বাঁধা।

রাত ন'টা থেকে শুরু করে তিনঘণ্টা চলল বিরতিহীন ইন্টারোগেশন। মেজরের একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি শারিয়া। দুটো গ্যারিসন উড়ে যাওয়ায় সারা দেশে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে, তাই মোসাদ ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তারা তেল আবিব বা জেরুজালেম ছেড়ে এখুনি বেরুতে পারছে না; তবে রেডিওর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত নির্দেশ দিচ্ছে তারা। তাদের পরামর্শ শোনার পর মেজর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিল ফরাসী ফটো-জার্নালিস্ট লুঁয়ে জাদিবকে। শারিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, মিগুয়েল রডরিকোই আসলে ইহুদিদের পরম শত্রু লুঁয়ে জাদিব কিনা। এই প্রথম ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল শারিয়ার ঠোঁটে। মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'কিন্তু মোসাদ ও আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাছে তথ্য আছে, যবর-এ-জালিম থেকে দ্বিতীয় কনভয়ের সঙ্গে রওনা হয় বজ্জাত ফরাসীটা। তাহলে সে গেল কোথায়?'

শারিয়া চুপ।

'কুত্তার বাচ্চাটা কি মারা গেছে?'

শারিয়ার চোখে আগুন। কিন্তু মুখ বন্ধ।

যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, প্রকাণ্ড জেনারেটর চালু হলো রাত একটায়। এরপর ইন্টারোগেশনের ধরন বদলে গেল।

'মিগুয়েল রডরিকো আসলে কে?' প্রশ্ন করল মেজর। 'সে কি মাসুদ রানা?'

শারিয়ার চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। ঠোঁটও নড়ল না।

তাঁবুর ভেতর এখন আলো জ্বলছে। মেজর উচ্চারণ করল, 'এক মণ।'

চ্যাপ্টা আকৃতির পাথরটা দু'জন ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল। ধীরে ধীরে নামাল রানার বুক ও পেটের ওপর।

'সত্যি বলছি, ওর সমস্ত নাড়িভুঁড়ি পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে আসবে,' বলল মেজর। 'কারণ তুমি মুখ না খুললে ওই পাথরটার ওপর একের পর এক আরও অনেক পাথর চাপানো হবে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। পেটের পেশী শক্ত করে এই বিপদ এড়ানো অসম্ভব। শারিয়া কথা বলছে না। রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না সে।

'এক মণ!' দাঁতে দাঁত ঘষল মেজর।

তাঁবুর বাইরে থেকে ওই একই আকৃতির আরেকটা পাথর বয়ে এনে চাপানো হলো রানার বুক ও পেটে, প্রথমটার ওপর।

দরদর করে ঘামছে রানা। পেশী শক্ত করে রেখেছে ও, তারপরও ওর পেট পিঠের সঙ্গে সেঁটে যেতে চাইছে। তারপর এমন হাঁপাতে শুরু করল, ওর কাঠামোটাই যেন একটা হাপর।

শারিয়া একবারও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। 'ও একজন রিপোর্টার। তোমাদের হাতে যখন পড়েছে, মরতে ওকে হবেই। আমি শুধু ওর জন্যে প্রার্থনা করতে পারি।'

'ও বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা নয়?'

'ও রডরিকো। তোমরা খোঁজ নিচ্ছ না কেন?'

'আরও এক মণ!' হুংকার ছাড়ল মেজর।

'ওরে কাপুরুষ!' পাশ ফিরে থুথু ছিটাল শারিয়া মেজরকে লক্ষ্য করে, তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। মনে মনে জানে, আরও একটা পাথর চাপালে রানা বাঁচবে না। বলছে এক মণ, কিন্তু বয়ে নিয়ে আসার কষ্ট দেখে মনে হচ্ছে একেকটার ওজন কমপক্ষে আড়াই মণ।

আরও একটা রেডিও মেসেজ রানাকে আপাতত বাঁচিয়ে দিল। রিপোর্টের সারমর্ম: মিগুয়েল রডরিকো লুঁয়ে জাদিব নয়, সে সম্ভবত এসপিওনাজ এজেন্ট মাসুদ রানাই। পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত টর্চার করার দরকার নেই। তবে শারিয়াকে যেন ইন্টারোগেট করা বন্ধ না হয়। বেজন্মা লুঁয়ে জাদিবের সন্ধান অবশ্যই জানে সে। ভোরের আলো ফুটলে ওদের দু'জনকেই পরবর্তী সেনা চৌকি আমহায়রা-য় স্থানান্তর করতে হবে। ওখান থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর হেলিকপ্টার তুলে নেবে ওদেরকে, পৌঁছে দেবে জেরুজালেমে।

রাত দুটো থেকে শারিয়ার বিবস্ত্র শরীরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশগুলোয় ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু হলো। তবে বলা মুশকিল তার চিৎকার শোনার বা কষ্ট দেখার দুর্ভাগ্য থেকে রানা বেঁচে গেছে কিনা। বুক আর পেটে কয়েক মণ পাথুরে বোঝার চাপ সহ্য করতে না পেরে সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও। অন্তত বেশ কয়েক মিনিট হয়ে গেল, ওকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না।

শারিয়া বুঝতে পারছে, দু'জনের কেউই বাঁচবে না। শক দেয়া বন্ধ করে জেরা করার সময় সে ভাবল, ওর ধরা পড়ার খবর বাবার কানে পৌঁছালে অবশ্যই তিনি ইজরাইলকে বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাব দেবেন। জাদিবের কথা মনে পড়ল তার। সে কি হামাস গেরিলাদের সঙ্গে পালাতে পেরেছে?

এতক্ষণে মেজরের খেয়াল হলো, পুরুষ বন্দি নড়াচড়া করছে না। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল সে।

'পাথর নামাও,' ডাক্তার এসেই সৈনিকদের নির্দেশ দিল।

ওদিকে মেজর আবার ইলেকট্রিক সুইচ অন করল। উপস্থিত সৈনিকদের কাজে মন নেই, লোলুপ দৃষ্টিতে নির্যাতিতা নগ্ন নারীর মোচড় খাওয়া দেখছে। ইস্পাতের ক্লিপ জ্যান্ত হয়ে ওঠায় ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল শারিয়ার শিরদাঁড়া। বিরতিহীন তীক্ষ্ণ

আর্তচিৎকার রানার কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে দিতে চাইছে। তবু এক চুল নড়ল না ও। প্রৌঢ় ডাক্তার ওর হাতের স্ট্র্যাপ খুলে দিতে বলল। পালস্, ব্লাড প্রেশার, হার্টবিট ইত্যাদি পরীক্ষা করে সে জানাল, 'অবস্থা ভাল নয়।'

এক ঘণ্টা পর, রাত তিনটার দিকে, শক দেয়ার সরঞ্জাম শারিয়ার শরীর থেকে খুলে নিল ওরা। শারিয়ার এটা অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। কটের বিছানাও ভিজিয়ে ফেলেছে, তার নগ্ন শরীর কালো একটা সুতি চাদর দিয়ে ঢেকে দিল মেজর। সৈনিকদের নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে। রানা শুনতে পেল, সৈনিকদের সে বলছে, 'কেউ যেন মেয়েটার শরীরে হাত না লাগায়। তাঁবুর বাইরে দু'জন পাহারায় থাকো। দেরি করে শুতে যাচ্ছি, বন্দিদের নিয়ে সকাল আটটায় রওনা হব আমরা।'

কুমারী ও পূর্ণযুবতী, তার ওপর সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, একজন সৈনিকের কাছে এরচেয়ে লোভনীয় আর কিছু হতে পারে না। রানা জানে, মেজর শারিয়ার উদ্দাম শরীরে ইলেকট্রিক শক দিচ্ছিল বলেই ডাক্তারের কথায় ওর হাতের স্ট্র্যাপ খোলার পর সৈনিকরা পরে সেটা বাঁধতে ভুলে গেছে। রানা এ-ও জানে, মেজরের নিষেধ সত্ত্বেও চাদর ঢাকা শারিয়ার নগ্ন শরীরে হাত বুলাতে অন্ধকার তাঁবুতে অবশ্যই ফিরে আসবে সেন্ট্রি দু'জন—হয়তো পালা করে, কিংবা দু'জনের মধ্যে যে ঘুমাবে না।

বাইরে বেদনাবিধুর বাতাসের হাহাকার শুরু হলো। তাঁবুর ক্যানভাসে ঢেউ উঠছে থেকে থেকে। সৈনিকদের নিয়ে মেজর বেরিয়ে গেছে দশ মিনিটও হয়নি, দ্বিতীয় হাত ও দুই পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছে রানা। প্রথমে কট থেকে নামতে সাহস হয়নি, ভেবেছে হঠাৎ কেউ ভেতরে ঢুকলে ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু নিচু গলায় বার কয়েক ডেকেও যখন শারিয়ার সাড়া পেল না,

তখন বাধ্য হয়ে নামতে হলো। অন্ধকার হাতড়ে শারিয়ার কটটা খুঁজে নিল ও। কাছ থেকে ডেকেও কোন সাড়া পাচ্ছে না। তারপর সংকোচ ঝেড়ে ফেলে নগ্ন কাঁধ ধরে নাড়া দিল। শারিয়া জাগল না বা তার জ্ঞান ফিরল না।

ওখানে দাঁড়িয়ে দু'সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। প্ল্যান একটা মাথায় তৈরি হয়েছে, তবে সেটা পাগলামিরও বাড়া, বলা যায় আত্মহত্যার সামিল। সেন্ট্রিদের কেউ তাঁবুতে ঢুকলে তাকে অজ্ঞান করে অস্ত্র কেড়ে নেবে, তারপর শারিয়াকে কাঁধে ফেলে বাইরে বেরিয়ে চেষ্টা করবে একটা গাড়ি পেতে। এইটুকুই ভেবেছে, বাকিটা গাড়ি ছাড়ার পর ভাববে।

কাজ সেরে রাখাই ভাল, সিদ্ধান্ত নিল রানা। শারিয়ার হাত, পা ও নাভির কাছে স্ট্র্যাপ আটকানো হয়েছে। একে একে সবগুলো খুলে মেঝে থেকে ওর কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে অপটু হাতে পরাল ওকে। নিজের কটে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল আবার। এখন অপেক্ষা।

জার্নালিস্ট মিগুয়েল রডরিক্কোর পাসপোর্ট আর পরিচয়-পত্র বের করে নিয়ে ব্রিফকেসটা গিরিপথে থাকতেই জীপ থেকে একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিয়েছে রানা। ওটার গোপন কম্পার্টমেন্টে লাইসেন্সবিহীন একটা পিস্তল, অতিরিক্ত পাসপোর্ট ও পরিচয়-পত্র ছিল। ধরা পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র, এটা বুঝতে পেরেই ব্রিফকেসটা হাত ছাড়া করেছে রানা। শুধু ব্রিফকেস নয়, একই পথ অনুসরণ করেছে ওয়ালথার ও স্যাটেলাইট ফোনটা। ও-ই ফোনে এমন সব কল রিসিভ করেছে ও, স্যাটেলাইট-এর কমপিউটর চেক করলে কলার-এর অবস্থান এবং আলাপের বিষয়বস্তু, সব ইজরাইলি ইন্টেলিজেন্স জেনে ফেলবে; তখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে রানা আসলে দুটো নয়, তিনটে কনভয়ের আয়োজন করেছিল।

তৃতীয়টার নেতৃত্বে ছিল বিসিআই-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর

সোহেল আহমেদ, কনভয় পাহারা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের গ্রাম পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে রানা এজেন্সির অপারেটররা। ওটাকে তৃতীয় না বলে প্রথম কনভয় বলা উচিত। আর শুধু ওটাতেই ছিল ইয়াসির আরাফাতের চাহিদা অনুসারে প্রচুর আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন। ইতিমধ্যে ইজরাইলিরা চরম মূল্য দিয়ে জানতে পেরেছে, বাকি দুটো কনভয়ে ছিল শুধুই অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক।

মূল কনভয় জায়গামত পৌঁছে দিয়েই যে সোহেল তার দায়িত্ব শেষ করেছে, তা নয়। রানার নির্দেশে তদন্ত করে সে জেনেছে ফিলিস্তিনিদের অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিম তীরে পাঠাবার কাজে সব সময় আবাবিল ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে, এবং গত তিন মাসে যতগুলো কনভয় রওনা হয়েছে তার প্রতিটিতে কয়েকটা করে ব্লীপার ছিল। এই তদন্ত শুরুর আগেই স্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনে আবাবিল-এর বদলে রানা ওর দ্বিতীয় চালানের জন্যে পাপাডুলাকে দিয়ে খাদেমুল আব্বাসিয়া ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক ভাড়া করায়। ওগুলোতেও ব্লীপার ছিল বলে জানতে পেরেছে সোহেল। দুটো কোম্পানিই টাকা খেয়ে এই কাজ করছিল, কোন সন্দেহ নেই। সোহেলকে এখন দেখতে হবে, কে তাদেরকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছিল।

আর, এদিকে, রানার আয়োজিত চালান দুটোর কথা বললে বলতে হয়, এরচেয়ে ভাল টোপ আর হয় না। বড় দাঁও মেরেছি ভেবে বিস্ফোরক ভর্তি কনভয় সরাসরি দুই গ্যারিসনে নিয়ে গিয়ে তোলে ইজরাইলিরা। তবে ভাগ্য নিঃসন্দেহে রানাকে সহায়তা করেছে—গ্যারিসনের অফিসাররা রাত আটটা পর্যন্ত ট্রাকগুলো পরীক্ষা করে দেখার গরজ অনুভব করেনি। অবশ্য শুধু সামনের বাক্সগুলো পরীক্ষা করলে কোন লাভ হত না। ওগুলোয় বিস্ফোরক নয়, স্মল আর্মস ছিল।

রানার অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফলই বলতে হবে; এখন

জান বাঁচে কিনা সেটা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ। একটা কনভয় নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তুয়া আরও দুটো কনভয় দরকার ছিল ওর, যে-দুটো কনভয় ডাইভারশন ক্রিয়েট করবে। বোনাস-এর লোভ কার না আছে, স্মরণাতীত কালের সবচেয়ে বড় অন্যায় ঘটতে যাচ্ছে দেখলে কার না ইচ্ছে হবে প্রতিশোধ নেয়ার। জোর যার মুল্লুক তার? ইরাক দখল করে ইজরাইলকে নিরাপত্তা দিতে চাও? ঠিক আছে, আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু কুলায় করব।

রানাকে ওরা ভাল করে সার্চও করেনি। করলে বগলের নিচে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাহুতে আটকানো ছুরিটা পেয়ে যেত।

নগ্ন ও অরক্ষিত নারীদেহের লোভে একজন সেন্ট্রি তাঁবুর ভেতর ঢুকবে, ছুরি হাতে ওই আশায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছে রানা। হাতঘড়ির ফ্লোরেসেন্ট ডায়ালে চারটে বাজতে চলেছে, অথচ ভেতরে কেউ ঢুকছে না। আর চল্লিশ মিনিট পরই কাছাকাছি ফিলিস্তিনি গ্রামের মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজান শোনা যাবে। আজানের খানিক পরই ভোরের আলো ফুটবে। তখন পালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

দেরি না করে ওকেই কিছু একটা করতে হয়।

কট থেকে নামতে যাবে রানা, আশপাশে কোথাও কর্কশ ঘ্যারঘ্যার করে উঠল একট রেডিও—সম্ভবত পাশের তাঁবুতেই। এমন অসময়ও মেসেজ আসছে। অপারেটরের গলা শোনা যাচ্ছে, রিপিট করতে বলছে সে।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই-ই চলল—মেসেজ আসে, ভাল করে শুনতে না পেয়ে রিপিট করতে বলে অপারেটর, তারপর ঠিকমত শুনেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে নিজেও রিপিট করে। রানার তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলো। তবে সেই সঙ্গে নতুন একটা বিপদের খবর আতঙ্কিত করে তুলল ওকে।

হিব্রু ও ইংরেজিতে বলা হলো: বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে

দেশের ভেতরকার হিযবুল্লাহ্-র একটা দুর্ধর্ষ গ্রুপ জেনে ফেলেছে শারিয়াকে এই সেনা চৌকিতে আটকে রাখা হয়েছে। শারিয়া ইয়াসির আরাফাতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপনজনদের একজন, সেই সূত্রে হিযবুল্লাহ্ ও হামাস-এর অনেক গোপন তথ্য ও পরিকল্পনার কথা তার জানা আছে। গ্রুপটার লীডার কুখ্যাত আবু আব্বাসের ধারণা, শারিয়াকে অমানুষিক টরচার করা হবে, এবং সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে সে। গ্রুপের সবাই তার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেঃ এই পরিস্থিতিতে শারিয়ার মৃত্যুই তাদের কাম্য। সর্বসম্মত রায়ে স্থির হয়েছে, খুন করতে হবে তাকে। সে সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্যে গ্রুপটা রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে বেদুইন, অথবা অন্য কোন ধরনের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকবে তারা, বিশ্বস্ত সূত্রে এ-খবর পাবার পর ইজরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জর্দান-ইজরাইল সীমান্ত থেকে নিজেদের বেশ কিছু সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সীমান্ত থেকে সেনা চৌকির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে তারা। নির্দেশে বলা হয়েছে, শারিয়া বা তার সঙ্গী বন্দিকে পরবর্তী সেনা চৌকিতে স্থানান্তর করা এখন ঝুঁকিপূর্ণ, তাই আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো। বলা হলো, সেনা চৌকির নিরাপত্তা যেন আরও জোরদার করা হয়। অপারেটর জানতে চাইল, ফরাসী বাঁদর লুঁয়ে জাদিবের কোন সন্ধান পাওয়া গেছে কিনা। জবাব শুনে রানা বুঝে নিল মঁশিয়ে জাদিবকে এখনও ওরা খুঁজে পায়নি। আপনমনে মাথা নাড়ল ও।

'পানি! একটু পানি!' নিস্তেজ গলা, শোনা যায় কি যায় না।

শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে নিজের কট থেকে নেমে শারিয়ার পাশে চলে এল রানা।

মাত্র কয়েক মিনিট হলো জ্ঞান ফিরেছে শারিয়ার। একটু পানির জন্যে ছটফট করছে বেচারি।

অন্ধকার, তাই প্রথমে শারিয়াকে ছুঁতে চাইছে না রানা—ভয়

পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। 'আমি রানা,' শারিয়ার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল। 'কোনও ভয় নেই, এখান থেকে এখুনি বেরিয়ে যাব...'

রানা শেষ করতে পারল না; অসহায় এক কুমারী তার ব্যক্তিত্ব, সতীত্ব ও নারীত্বের অমর্যাদা স্মরণ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, হাত দুটো অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে নিল রানার হাত। 'রানা! রানা! ওরা আমাকে মেরে ফেলল না কেন!'

'কি হচ্ছে?' রানার ঘাড়ের কাছ থেকে প্রশ্ন করল কেউ। অন্ধকার তাঁবুতে একজন সৈনিক ঢুকেছে। তার ধারণা, শারিয়া ব্যথায় কাতরাচ্ছে। মতলব ভাল নয়, আলো না জ্বালার সেটাই কারণ।

'দেখো কি হচ্ছে,' আধ পাক ঘুরে জবাব দিল রানা, আন্দাজ ঠিক থাকায় সেন্ট্রির কাঁধে একটা হাত রাখতে পারল, অপর হাতের ছুরির ফলা সবটুকু সেঁধিয়ে গেছে থুতনির নিচে দিয়ে সরাসরি মগজে। আস্তে করে লাশটা মেঝেতে শুইয়ে দিল। ইউনিফর্মে ঘষে ছুরিটা মুছল ও, বাম হাত দিয়ে লাশের হিপ-হোলস্টার থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে কোমরে গুঁজল। নিহত সেন্ট্রির কাঁধে উজি কারবাইনের স্ট্র্যাপ আটকে যাওয়ায় খুলতে একটু সময় লাগল, ফলে দ্বিতীয় সেন্ট্রির প্রশ্নের জবাবে হিব্রু ভাষায় রানাকে বলতে হলো, 'বিশ্বাস না হলে দেখে যাও, আমি কিচ্ছু করছি না।'

বাইরে থেকে সেন্ট্রি বলল, 'গলার আওয়াজ বদলে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, না? অনেকক্ষণ তো হাতালে, এবার তুমি বাইরে এসো, আমি ভেতরে ঢুকি।'

'প্লিজ, আর দশটা মিনিট।'

কি ঘটছে আন্দাজ করতে পেরে ব্যথায় কাতর, মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত শারিয়া সিদ্ধান্ত নিল রানাকে সাহায্য করবে। কাতর গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

'আমাকে দেখতে হবে কি করছ তুমি,' বলতে বলতে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল দ্বিতীয় সেন্ট্রি, এবং শক্তিশালী টর্চটা জ্বালল। তার সঙ্গীর লাশ আগেই রানা লুকিয়ে ফেলেছে, ফলে তাকে সে দেখতেই পেল না। দ্বিতীয় কটটা দেখল খালি। একা শুধু শারিয়া নিজের কটে চাদরের ভেতর মোচড় খাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে।

বিপদ টের পাবার সময় হয়তো সে পেল, হয়তো পেল না; ফ্ল্যাপ-এর পাশ থেকে তার পিছনে চলে এল রানা। বাম শোলডার ব্লেডের নিচে হাতল পর্যন্ত ওরকম লম্বা একটা ছুরি ঢুকলে হৃৎপিণ্ড আর কাজ করে কিভাবে? মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে এই লাশের হোলস্টার থেকে শুধু একটা পিস্তল আর বেল্টে আটকানো পাউচ থেকে একজোড়া গ্রেনেড নিল রানা।

এরপর উঁকি। তাঁবুর বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাতাসের হা-হুতাশ আরও বেড়েছে। পাঁচ সেকেন্ড পর রানার কাঁধে কালো চাদর মোড়া শারিয়া। দশ সেকেন্ড পর তাঁবুর বাইরে। কাছাকাছি একটা খেজুর গাঁছ অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেল—ওটার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। অন্ধকারে চোখ জ্বেলে দেখার চেষ্টা করছে অন্যান্য সেন্ট্রিরা কোনদিকে টহল দিচ্ছে, গাড়িগুলোই বা কোথায় রাখা হয়েছে।

রানার কাঁধে শারিয়ার পেট, তার মুখ ওর নিতম্বের কাছে ঝুলে আছে। সেখান থেকেই সে বলল, 'একবার নামাবে, চেষ্টা করে দেখব হাঁটতে পারি কিনা?'

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'তুমি বিশ্বাস করতে পারছ ইজরাইলিদের একটা সেনা চৌকি থেকে আমরা পালাচ্ছি? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তার কারণ এখনও আমরা পালাতে পারিনি,' বলল শারিয়া। 'যখন পারব তখন বিশ্বাস হবে।'

'গন্ধটা পাচ্ছ?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। পেট্রল।' হাত তুলে ওদের তাঁবুর ডান দিকটা দেখাল

শারিয়া। 'ওদিক থেকে আসছে।'

শারিয়াকে নামাল রানা, তবে ছাড়ল না। দু'তিন পা হাঁটল শারিয়া। 'পারব মনে হচ্ছে,' বলল বটে, তবে গলার স্বর ব্যথায় কাতর।

তার হাতে একটা পিস্তল গুঁজে দিল রানা। 'একেবারে বাধ্য না হলে গুলি কোরো না। এসো।' শারিয়ার খালি হাতটা ধরে টান দিল ও।

পেট্রলের গন্ধ আরও জোরালো লাগছে নাকে। বিরাট একটা তাঁবুকে পাশ কাটাবার সময় বুঝতে পারল, এটার ভেতর ফুয়েল মউজুদ করা হয়েছে। এই সেনা চৌকিতে ট্যাংক মাত্র দুটো। তবে আর্মারড্ ভেহিকেল বেশ কয়েকটা। চারটে জীপ। সবগুলোই বৃত্তাকারে ফেলা তাঁবুগুলোর মাঝখানে রাখা হয়েছে, তাসত্ত্বেও ওগুলোর ঘন কালো কাঠামো প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত লাগছে।

বুট জুতোর শব্দ, সিগারেটের আগুন, বাতাসে ভেসে আসা ফিসফিস কথাবার্তা ইত্যাদি নানা লক্ষণ দেখে টহলরত সেন্ট্রিদের অবস্থান আন্দাজ করা গেল। তাঁবুগুলো যে বৃত্ত তৈরি করেছে, সবাই তারা সেই বৃত্তের বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে।

সাহস করে, ধীরে ধীরে শারিয়ার হাত ধরে সাঁজোয়া যানবাহনের ভিড় লক্ষ্য করে এগোল রানা। একটা জীপ পড়ল সামনে। আলো নেই যে ফুয়েল আছে কিনা পরীক্ষা করবে। ইগনিশনে চাবি থাকার কথা নয়, নেইও, কাজেই স্টার্ট দিতে হলে সামনের বনেট খুলে তার কেটে পরস্পরের সঙ্গে ঘষতে হবে। এই কাজও আলো ছাড়া সম্ভব নয়।

শারিয়াকে দু'হাত দিয়ে তুলে জীপটার ফ্রন্ট সিটের তলায় বসিয়ে দিল রানা। 'আলোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি,' বলে রওনা হলো যেদিক থেকে পেট্রলের গন্ধ আসছে।

রানার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই সিটের ওপর উঠে

বসল শারিয়া, তারপর বাতাস শুঁকতে শুঁকতে জীপ থেকে নেমে আরেক দিকে হাঁটা ধরল। পানি চেয়ে পায়নি সে—কুছ পরোয়া নেই, ব্র্যান্ডি খেয়ে তৃষ্ণা মেটাবে। এই গন্ধ তার অতি পরিচিত।

আবার তাঁবুতে ফিরে এল রানা। একটা লাশের পকেট সার্চ করে দেশলাই পেল, তার কোমরে গোঁজা টর্চটাও বের করে নিল ও।

তারপর পেট্রলের খোঁজে চলে এল বিরাট তাঁবুটার সামনে। ফ্ল্যাপ তুলে ভেতরে ঢুকল নিঃশব্দে। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে। এক হাতে পিস্তল রেডি, আরেক হাতে টর্চ।

আলো জ্বেলে ভেতরে কাউকে দেখল না রানা। বিশ-পঁচিশটা ড্রাম আর অসংখ্য জেরিক্যান দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা পেট্রলে ভর্তি। প্রতিবার দুটো করে জেরিক্যান নিয়ে বেরিয়ে এল রানা তাঁবু থেকে। আশপাশের সবগুলো তাঁবুর নিচের দিক ভিজিয়ে দিল ও। ভিজল রেডিওর অ্যান্টেনা, অস্ত্রের গুদাম, জোড়া ট্যাংক, আর্মারড ভেহিকেল, ট্রাক, ভ্যান ও একটা বাদে সবগুলো জীপ।

'ওদিকে এক লোক মদ খাচ্ছিল,' জীপের কাছে রানা ফিরে আসতে বলল শারিয়া। 'ভাবলাম পানির বদলে মদই খাই। কিন্তু লোকটার মাথায় মস্ত টাক দেখে বোতলটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে ওখানেই ওটাকে ভাঙার লোভ সামলাতে পারলাম না। তারপর সার্চ করতে গিয়ে দেখি টয়োটার চাবি রয়েছে পকেটে। এই জীপটাও টয়োটা, দেখো তো স্টার্ট নেয় কিনা...'

'অন্ধকারে এত সব তুমি দেখলে কিভাবে?'

'পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ব্যাটা ইহুদি লাইটার জ্বালল...'

নিজের হাতের টর্চটা জ্বালল রানা, তারপর ইগনিশনে শারিয়ার ঢোকানো চাবিটা ঘোরাল। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল জীপ। তবে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছাড়ল না রানা। দেশলাইয়ের জ্বলন্ত একটা কাঠি ভেজা একটা তাঁবুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

'আগুন! আগুন!' উচ্চারণ করতে যা দেরি, গোটা সেনা চৌকি

প্রকাণ্ড এক মশালের মত জ্বলে উঠল। ধোঁয়া আর শিখার ভেতর থেকে একটাই গাড়ি বেরুতে পারল, রানা ও শারিয়াকে নিয়ে টয়োটা কোম্পানির জীপটা।

ধীরে ধীরে স্পীড বাড়াল রানা। 'কোন দিকে যাচ্ছি বা কোন দিকে যাব, আমার কোন ধারণা নেই,' শারিয়াকে বলল ও। 'তবে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার আগে তোমার জানা দরকার ইজরাইলি রেডিও অপারেটর কি মেসেজ পেয়েছে।'

'কি মেসেজ?'

ভোর হয়ে আসছে। আজান আগেই দিয়েছে, অস্পষ্ট বলে, নিজেদেরকে নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত বলেও, শুনতে পায়নি ওরা।

সব শোনার পর ঝিম মেরে থাকল শারিয়া। একসময় বলল, 'হিযবুল্লাহ্ জঙ্গিরা যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি হিংস্র। যদি বোঝে ভাই, বাপ বা মায়ের দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে, বিন্দুমাত্র দ্বিধায় না ভুগে গুলি করে মেরে ফেলবে তাদের।' একটু থেমে আবার বলল, 'এটা আমার বিপদ, রানা। সম্ভবত এই বিপদ থেকে নিজেকে আমি রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু আমি চাই না আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন হোক।'

মেসেজে আমার প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি,' বলল রানা, 'এক। দুই, কারও প্রতি অন্যায় করা হবে জানার পর তাকে ত্যাগ করে নিজের চামড়া বাঁচানোর অভ্যাস আমার নেই।'

'তুমি বাধা দিলে ওরা তোমাকেও গুলি করবে,' বলল শারিয়া। 'ওরা কারও কথা শোনে না, কারও বিচার মানে না।'

'বিষয়টা নিয়ে এই মুহূর্তে আমি ভাবতে চাইছি না,' বলল রানা। 'তুমি এখন বলো, কোন দিকে যাব।'

'বাতীল-এ-বাহানা হয়ে চলো শের-এ-প্যালেস্টাইনে ঢুকি,' খানিক চিন্তা-ভাবনা করে নিজের সিদ্ধান্ত দিল শারিয়া। 'আমরাহীর কথা মনে আছে? জর্দানের ভেতর যেখানে আমার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয়? আমি ওখানে যেতে চাই।'

'বিশেষ কোন কারণ আছে?'

'লুঁয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েনি,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল শারিয়া। 'হামাস গেরিলারা যদি কেউ প্রাণ নিয়ে ওখানে পৌঁছে থাকে, নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে লুঁয়ের একটা খবর পাব।'

লুঁয়ের খবর পাবার জন্যে অত দেরি করতে হলো না ওদেরকে। বরং বিপদের সময় স্বয়ং একজন ফেরেশতা যেন জাদিবের রূপ ধরে ওদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

সেনা চৌকি থেকে ওদেরকে কেউ ধাওয়া করতে পারেনি, কিন্তু পুব আকাশে সূর্যের সঙ্গে পশ্চিম আকাশে উঠে এল রূপালি একটা জেট ফাইটার।

ফাইটার কাছে আসার আগে খক খক করে কেশে উঠে থেমে গেল ওদের জীপের এঞ্জিন। উত্তেজনার মধ্যে ফুয়েল গজের দিকে ভুলেও একবার তাকায়নি ওরা। রিজার্ভ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে, ফুয়েল ট্যাংক এই মুহূর্তে শুকিয়ে ঠন্‌ঠন্ করছে।

এই সময় শের-এ প্যালেস্টাইন, অর্থাৎ বাঘের অবয়ব আকৃতির জোড়া পাহাড়ের দিক থেকে অন্য একটা জীপকে এগিয়ে আসতে দেখল শারিয়া। নিজের জিনিস, দেখেই চিনতে পারল সে।

তবে দক্ষিণ দিক থেকে আসা জীপের গতি অত্যন্ত মন্থর। ড্রাইভিং সিটে যে-ই বসে থাকুক, তার অবস্থা ভাল নয়। চেহারায় আশ্চর্য বিশৃংখলা, মাথায় আর সারা গায়ে ধুলোবালি।

রানার নজর পশ্চিমে, অর্থাৎ ডানদিক। ওদিক থেকে কাছে চলে আসছে জেটটা। 'শারিয়া,' বলল ও। 'আমরা হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাব। তার আগে তোমার জানা দরকার যে মিস্টার আরাফাত আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি সেটা পালন করেছি—আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশনের একটা চালান জায়গামত ঠিকই আমরা পৌঁছে দিয়েছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মন বলছিল এরকম একটা কিছু

ঘটেছে। তবে বাবা তোমাকে আরও একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা,' সামনের জীপটার দিকে চোখ রেখে বলল শারিয়া। 'সেটার কি হলো?'

'আরও একটা দায়িত্ব?'

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শারিয়া বলল, 'রানা! কেন বলছ আমরা মরব! এইমাত্র মনে পড়ল আমার...'

'কি?'

'ওটা আমার জীপ,' হাত তুলে দেখাল শারিয়া, অচল টয়োটা থেকে নিচে নামছে। 'আমি জানি ওটার কোথায় কি আছে।'

'কি আছে?'

'মোবাইল রকেট লঞ্চার,' বলল শারিয়া। 'সামনের সিট দুটোর মাঝখানের ফাঁকে লুকানো আছে। কিন্তু জীপে কে ও, রানা?'

প্রথম সূর্যের আলো ড্রাইভারের চশমায় প্রতিফলিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল রানা। 'কে মানে? এখনও ওকে তুমি চিনতে পারছ না।'

'জাদিব!' চেঁচিয়ে উঠে ছুটল শারিয়া।

বারো

জীপ দাঁড় করিয়ে ফেলল জাদিব। শারিয়ার পিছু নিয়ে রানাকেও আসতে দেখছে সে। তারপর তার দৃষ্টি ওদেরকে ছাড়িয়ে গেল, প্রায় উত্তর দিগন্তের কাছাকাছি। কয়েক মুহূর্ত পর আবার শারিয়া ও রানার দিকে তাকাল সে। আকস্মিক আবেগ ও উত্তেজনায়

শারিয়ার নাম ধরে চিৎকার করতে গিয়ে এমন বিষম খেলো যে জীপ থেমে নেমে আর এগোতে পারল না, বুক চেপে ধরে কুঁজো হয়ে গেল কাশির দমকে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এরকমই হবার কথা। সে যে বেঁচে আছে, এটাই একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

জেট ফাইটার হরদম শেল ছুঁড়ছে আর অ্যাপাচী হেলিকপ্টার থেকে নেমে ইজরাইলি সৈন্যরা হামাস গেরিলাদের দিকে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে, বাতীল-এ-ব্রাহানায় এই দৃশ্য দেখে জাদিব নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, গুলি খেয়ে মরার ভয়ে দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দেয়। বেশি দূর যেতে পারল না, একটা চোরাবালিতে পড়ে ডুবে যাবার অবস্থা হলো। ভাগ্য নেহাতই ভাল যে আসিফ মির্জা তার কোমরে এক প্রস্থ রশি জড়িয়ে দিয়েছিল। সেই রশির একটা প্রান্তকে লূপ বানিয়ে কয়েকবার ছুঁড়তে একটা ছোট বোল্ডারে আটকানো সম্ভব হলো। কিন্তু বোল্ডারটা এতই ছোট যে রশিতে টান পড়তে চোরাবালির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। তবে জাদিব না নড়লে বোল্ডারও নড়ে না। ইতোমধ্যে বালির নিচে বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে জাদিব। রাতটা এই অবস্থাতেই কাটে। নড়াচড়া না করায় পাথরটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়।

আসলে রাখে খোদা মারে কে। সকাল হতে আল্লাহ মালুম কোত্থেকে একটা ঘোড়া এসে হাজির। জাদিব প্রথমে বুঝতে পারেনি, ঘোড়াটা তার জন্যে অভিশাপ হয়ে এসেছে, নাকি আশীর্বাদ হয়ে।

এক পা এক পা করে ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে দেখে জাদিব এক পর্যায়ে চিৎকার করে ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। একই চোরাবালিতে অত বড় আর ভারী একটা প্রাণী পড়লে তার পরিণতি ভাল হতে পারে না। কিন্তু বোকা ঘোড়াটা ওর বাধা গ্রাহ্য না করে চোরাবালিতে পা দিল। তারপর তার ছটফটানি দেখে কে! কিন্তু একবার পা দেয়ার পর যত ছটফট করবে ততই

তাড়াতাড়ি ডুবে যাবে। ঘোড়ার অবশ্য তা জানার কথা নয়। সে দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। তার অন্তিম মুহূর্তটাই কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করল জাদিব। তখন শুধু ঘোড়ার মাথা আর পিঠের খানিকটা বালির ওপর দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর ওপর হাতের চাপ দিয়ে নিজেকে উঁচু করল সে, তারপর কিছুটা লাফিয়ে আর কিছুটা সাঁতরে বেরিয়ে এল চোরাবালির সীমানা থেকে।

প্রাণ ফিরে পেয়ে চারদিকে চোখ বুলাল জাদিব। কোথাও কোন মানুষজন নেই। শের-এ-প্যালেস্টাইনের মুখ থেকে বেশি দূরে নয়, একটা জীপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। দেখেই চিনতে পারল, ওটা শারিয়ার জীপ। ওটা নিয়ে রওনা হয়েছে, উদ্দেশ্য রানা আর শারিয়াকে খুঁজে বের করা। এই সময় দেখতে পেল রানাকে নিয়ে শারিয়াই ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

কাশির দমকে নুয়ে নুয়ে পড়ছে জাদিব, ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল শারিয়া। 'লুঁয়ে! তুমি বেঁচে আছ!' তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে।

বালি মাখা সাদা ভূতের চেহারা পেয়েছে, কাশির দমকটা সামলে নিয়ে জাদিব জোর করে হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'চোরাবালি যখন ফিরিয়ে দিয়েছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সহজে আর মরছি না।' নিজেকে শারিয়ার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে রানার দিকে তাকাল সে। 'রানা, ডিয়ার ব্রাদার, সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না যে আবার আমাদের দেখা হলো। আমাদের কনভয়ের কি খবর?' হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে।

সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেঙে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল জেট ফাইটারটা।

রানা সহাস্যে শারিয়াকে দেখিয়ে দিল। 'ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

'কনভয় মোট তিনটে ছিল, লুঁয়ে,' দ্রুত বলল শারিয়া, আকাশে তাকিয়ে জেট ফাইটারকে বৃত্ত রচনা করতে দেখছে।

'দুটো কনভয়ে শুধু বিস্ফোরক ছিল, ইজরাইলিরা দখল করে দুটো প্যারিসনে নিয়ে যায়। দুটোই উড়ে গেছে। তৃতীয় কনভয়ে ছিল বাবার তালিকা অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র। সেগুলো এতক্ষণে বোধহয় রামাল্লায় পৌঁছে গেছে।' একটা ঢোক গিলল সে। 'জেট ফাইটার ফিরে আসছে।'

'জীপটা ফুলস্পীডে চালালে হয় না?' ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল জাদিব। 'সচল টার্গেটে শেল লাগানো গানারের পক্ষে সহজ হবে না।'

ঝট করে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা।

'রকেট লঞ্চার সামনে,' বলে রানার পাশের সিটটায় উঠে পড়ল শারিয়াও।

'হোয়াট!' জাদিব যেন আকাশ থেকে পড়ে গেছে।

দুই সিটের মাঝখানের ঢাকনি তুলে মোবাইল রকেট লঞ্চারটা তাকে দেখাল শারিয়া। 'আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখলে দেখো বিপদের সময় কেমন কাজে লাগে!'

'তুমি...তুমি...একটা জেট ফাইটার ফেলে দেবে? ফেলে দিতে পারবে?' জাদিব বিস্ময়ে প্রায় তোতলাচ্ছে। লাফ দিয়ে চলন্ত জীপের পিছনে উঠে পড়ল সে।

'এর আগে তিনটে ফেলেছি,' হাসতে হাসতে বলল শারিয়া।

জীপের স্পীড ক্রমশ বাড়াচ্ছে রানা।

জাদিব বলল, 'একটা জেট ফাইটার ফেললেই কি আমরা বাঁচতে পারব? উত্তর দিকে তাকাওনি, তাই জানো না কারা আসছে।'

হঠাৎ ব্রেক কষে জীপ দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা। তার আগে শারিয়ার সঙ্গে নিরব অথচ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে ওর। জেট ফাইটার ফিরে আসছে, শারিয়াকে রকেট ছোঁড়ার সুযোগ দিতে হলে জীপ থামাতেই হয়।

জীপ থামতে ড্যাশবোর্ডের নিচের দেরাজ খুলে একটা

বিনকিউলার বের করল রানা। উত্তর দিকে তাকিয়ে চোখে সাঁটল ওটা।

'তাই তো! একদল ইজরাইলি সৈন্য!'

রকেট লঞ্চার কাঁধে ঠেকিয়ে জেট ফাইটারকে টার্গেট করছে শারিয়া। তার পিঠে পিস্তলের মাজল্ ঠেকল।

'ওটা নামাও, শারিয়া,' ঠাণ্ডা গলা জাদিবের। নরম সুর, উচ্চারণে আভিজাত্যেরও কোনও অভাব নেই।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। তবে ওর হাসি যেন চড় মেরে থামিয়ে দেয়া হলো—জেট ফাইটার থেকে ছোঁড়া একটা শেল, পড়ল জীপের সামনে, একটু বাঁ দিকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় জীপ ঝাঁকি খেলো, উল্টে পড়তে গিয়েও পড়ল না।

ফাইটার চলে গিয়ে আবার ফেরার জন্যে বৃত্ত রচনা করছে। রানার মুখে সেই হাসিরই সংক্ষিপ্ত ও নীরব সংস্করণ দেখা গেল। 'শারিয়া, এবার তুমি রকেট ছুঁড়বে। আমার কথা বিশ্বাস করো, মঁশিয়ে জাদিবের পিস্তলে গুলি নেই। মির্জাকে আমিই বলেছিলাম, সে যেন ওর হাতে একটা খালি পিস্তল গুঁজে দেয়।'

পিস্তল ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপে দিল জাদিব, সরাসরি রানার মাথার পিছন দিকটা লক্ষ্য করে। ক্লিক করে শব্দ বেরুল শুধু, গুলি নয়। হতভম্ব জাদিব নড়তে ভুলে গেল।

আর ঠিক তখনই রকেট লঞ্চারের ট্রিগার টানল শারিয়া। জেট ফাইটার পালিয়ে যাচ্ছিল, পিছু ধাওয়া করে সেটাকে ধরে ফেলল ওদের রকেট, সেঁধিয়ে গেল কাউলিং ভেদ করে সরাসরি এঞ্জিনে। রূপালি ডানার চিল চোখের পলকে দাউদাউ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো, সম্ভবত শব্দের চেয়েও দ্রুত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর সেই অগ্নিকুণ্ড বিস্ফোরিত হলো। রোদ ঝলমলে দিনের বেলা আকাশে যেন আতসবাজির খেলা শুরু হয়েছে।

'কিন্তু তোমাদের রক্ষা নেই!' জীপের পিছন থেকে বলল জাদিব। 'সৈন্যরা আসছে...'

'আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল যে তোমার দ্বারাই বেঈমানীর ঘটনাটা ঘটছে, কারণ সন্দেহ করার মত আর কাউকে পাচ্ছিলাম না,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল রানা। 'সমস্ত গোপন তথ্য কে জানত? শারিয়া। শারিয়া তোমার কে? বাগদত্তা। কাজেই ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সব তথ্য তুমি মোসাদকে জানিয়ে দিতে পারছিলে। আমার যেটা আশ্চর্য লাগছে, ওরা তোমাকে ট্রেনিং দেয়নি কেন?'

রানা ও শারিয়া দু'জনেই সিটের ওপর ঘুরে বসেছে।

'ওরা সিদ্ধান্ত নেয়, ট্রেনিং না পাওয়াটাই আমার জন্যে বেশি নিরাপদ হবে। শারিয়া ও ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ মানুষ আমি, প্যালেস্টাইন ইন্টেলিজেন্স আমার ওপর কড়া নজর রাখছিল। মোসাদ থেকে বলা হলো, আমি যদি ট্রেনিং নিই, অস্ত্র চালাতে শিখি, ওরা জেনে ফেলবে।'

'কেন, লুঁয়ে?' শারিয়ার গলা প্রায় শোনাই গেল না। 'কেন?'

জাদিব হাসল। 'কেন মানে? এটা আমার পেশা—নতুন যুগের নতুন স্পাই; শত্রুর আপন লোক সেজে তথ্য সংগ্রহ ও পাচার করাই আমার কাজ। আমি একজন জার্মান ইহুদি। ফ্রেঞ্চ মুসলমান সেজেছিলাম—ওটা আমার কাভার।'

'তুমি তাহলে আমাকে ভালও বাসোনি?' শারিয়া কাঁদতে ভুলে গেছে। চোখে কোন বেদনার ছাপও নেই। সেখানে শুধু করুণা।

'ভালবাসব? ওহ্, গড! যে মেয়ে একটা চুমো পর্যন্ত খেতে দেয় না, তাকে কেউ ভালবাসতে পারে?'

'ইজরাইলি সৈন্যরা আসছে দেখে তুমি ভাবছ ওরা তোমাকে বাঁচাবে,' বলল রানা। 'আর আমাদেরকে খুন করবে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না। সেনা চৌকিতে যখন বন্দি ছিলাম তখন সবাই তোমাকে গালাগালি করছিল কেন।'

জাদিব হাসছে। 'সম্ভবত বন্দিদের, অর্থাৎ তোমাদের বোকা বানাবার জন্যে,' বলল সে। 'ওরা চায়নি আমার কাভারটা নষ্ট

হোক।'

'আমাদের কাছে তোমার কাভার নষ্ট হলেই বা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদেরকে তো শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলত।'

'না। মেরে ফেলত না। এখনও মেরে ফেলবে না।' রানা ও শারিয়ার দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে দূরে তাকাল জাদিব। ট্রাক ভর্তি ইজরাইলি সৈন্যরা আগের চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে। 'অন্তত শারিয়াকে যে মারবে না, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের অনেক সৈন্য হামাস আর হিযবুল্লাহ্‌দের হাতে বন্দি হয়ে আছে। শারিয়া বড় একটা মাছ, তাকে মুক্তি দেয়ার বদলে ওদেরকে আমরা ছাড়িয়ে নিতে চাইব। এবার, রানা, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে? তুমি কি ব্লীপারগুলো পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম,' বলল রানা। 'আমি ভাবলাম তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে মির্জা হেডম্যান আর তাদের বডিগার্ডদের খুন করল কেন।'

'কেন?'

'মির্জা ওদেরকে খুন করেছে আমার নির্দেশে। কারণ আমি বুঝে ফেলি তোমার টাকা খেয়ে ওরাই কনভয়গুলোকে ইজরাইলি সেনা চৌকির পাঁচ মাইলের মধ্যে নিয়ে যায়। ব্লীপার রিসিভিং সেট-এর রেঞ্জ ওই পাঁচ মাইলই ছিল, তাই না?' জাদিব কিছু বলছে না দেখে রানা আবার বলল, 'মঁশিয়ে হে, তোমার জন্যে আরও অন্তত দুটো দুঃসংবাদ আছে।'

'মানে?'

'আমার ধারণা, শারিয়া এখন পর্যন্ত স্বীকার না করলেও, ও-ও প্রথম থেকে সন্দেহ করেছিল যে কনভয়গুলো তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। তবে ওর হাতে কোন

প্রমাণ ছিল না। সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্যেই এবারের চালানটার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেয় সে। তুমিও সেটা বুঝতে পারো। তাই পথেই তাঁকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মেরে ফেলার আয়োজন করেছিলে...'

'রানা কিছু ভুল বলছে না,' শুরু করল শারিয়া।

'এ-সব পুরানো ও বাতিল প্রসঙ্গ,' বাধা দিয়ে বলল জাদিব, তাকে এতটুকু উদ্বিগ্ন বা বিচলিত মনে হচ্ছে না। 'আমি যা করেছি, আমার দেশের জন্যে করেছি।'

'তবে মঞ্চটা বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্র বলে অস্কারটা থেকে বঞ্চিত হলে, এই যা,' হেসে উঠে বলল রানা। 'সত্যি, এমন দক্ষ অভিনেতা আর কখনও দেখব কিনা সন্দেহ।'

'তুমি বললে দুটো দুঃসংবাদ।'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটা কি?'

'সহ্য করতে পারবে তো?' রানা হাসছে না, হাতের পিস্তলটা সেই প্রথম থেকে জাদিবের দিকে তাক করে রেখেছে। 'ওদেরকে তুমি যা ভাবছ ওরা তা নয়।'

'মানে?' বিহ্বল হয়ে পড়ল জাদিব।

'ওরা হিযবুল্লাহ্, জাদিব,' বলল রানা। 'ইজরাইলি সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরে আছে। এই তথ্যও আমি তোমাদের রেডিও মেসেজ থেকে পেয়েছি...'

'অসম্ভব!'

'এক কাজ করো না,' প্রস্তাব দিল রানা। 'জীপ থেকে নেমে ওদের ট্রাক লক্ষ্য করে ছোটো। ওরা সত্যি সত্যি ইজরাইলি সৈন্য হলে তোমাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করবে।'

রানার কথা শেষ হলো না, জীপ থেকে নেমে খিঁচে ছুটল জাদিব। আগে থেকে কিছু বুঝতে পারেনি রানা, শারিয়াকে হঠাৎ ঝাঁকি খেতে দেখল ও। পরক্ষণে দেখল শূন্যে ডানা মেলে উড়ছে

জাদিব। শারিয়ার রকেট মাটি থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট ওপরে তুলে ফেলেছে তাকে। হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত, ফলে ডানা মেলা একটা প্রকাণ্ড পাখির মতই লাগছে তাকে।

শারিয়ার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, জানে রানা। তবে ধীর, শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করছে ও।

ট্রাক দুটো জাদিবের ছিন্নভিন্ন লাশটাকে পাশ কাটিয়ে ওদের জীপের দু'পাশে থামল। কালাশনিকভ রাইফেল হাতে লাফ দিয়ে নিচে নামল ইজরাইলি ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা। কিন্তু তাদের মুখে 'প্যালেস্টাইন জিন্দাবাদ! ইয়াসির আরাফাত দীর্ঘজীবী হোন!' ইত্যাদি শ্লোগান শুনে রানা ও শারিয়া দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

আসলে দূর থেকে ওরা তো শারিয়ার সব কাজই দেখেছে, চোখের সামনে শত্রুর ধ্বংস দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে ভুলেই গেছে কেন তারা তাড়া করে আসছিল।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

শয়তানের উপাসক

কাজী আনোয়ার হোসেন

গিল্টি মিয়াকে নিয়ে ব্যাঙ্ককে এসে থাই গ্যাঙস্টারের খপ্পরে পড়ল মাসুদ রানা। কোন রকমে প্রাণ হাতে করে পালাতে পারলেও, প্লেনটা ক্র্যাশ করল ভারতের অরুণাচল প্রদেশের অজ এক পাড়াগাঁ স্বপ্নপুরীতে। ওঝা দেবলিঙ্গম বলছে, রানার এই আবির্ভাব নাকি আগেই স্বপ্নে দেখতে পাওয়া গেছে। একটা মহাবিপদ থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্যে স্বয়ং ঈশ্বর পাঠিয়েছেন রানাকে। এভাবেই শুরু হলো রানার চৌপল প্রাসাদ, তথা শয়তান উপাসকদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক অভিযান।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য বিষয়ক বুদ্ধিদীপ্ত মতামত, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

মোঃ নাহীদ মামুন, মিলন

মাওমডাঙ্গা, জাহানাবাদ ক্যান্ট., থানা–খানজাহান আলী, খুলনা।

মাসুদ রানা সিরিজের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আমি ক্লাস টেন থেকে মাসুদ রানা পড়া শুরু করি। এ-বছর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। এ পর্যন্ত আমি ১৫০টিরও বেশি মাসুদ রানা পড়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত *আবার ষড়যন্ত্র* চমৎকার লেগেছে।

আমাদের এখানে 'বই বিচিত্রা' নামে একটি লাইব্রেরী থেকে আমি রানা-বই সংগ্রহ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে এখানে রানার একটি বইও নেই। রানা কি বন্ধ হয়ে গেল, আপনারা মাসুদ রানার নতুন বই প্রকাশ করছেন না কেন? *আবার ষড়যন্ত্র* বইটি আমার কিনতে হয়েছে একটি পোস্টারের দোকান থেকে। এদের কাছেও যেখানে সবসময় ১০/১২টি মাসুদ রানার বই পাওয়া যেত সেখানে একটি মাত্র বই পেলাম। এই বই-সঙ্কটের কারণ কি?

কারণ তো আমার জানা নেই। তাঁরা কেন রাখছেন না, জিজ্ঞেস করলে হয়তো তাঁরাই বলতে পারবেন। না, ভাই, রানা বন্ধ হয়নি। আরও ছয়টি বই বেরিয়ে গেছে *আবার ষড়যন্ত্রের* পর।

মোঃ শাহীন আক্তার হাবীব,

৬৪/এ স্বামীবাগ, ঢাকা।

আপনি বলেছেন, যে-বই অন্য একজন অনুবাদ করে পুনরায় ওই

বই আর কারও অনুবাদ করা উচিত নয়। অথচ 'গড অভ স্মল থিংস' বিভিন্ন জন অনুবাদ করেছেন।

জেমস বন্ডের ভারতীয় অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়। পড়ে দেখেছি, পাঠের অযোগ্য। অন্যদিকে বাংলাদেশী একটি প্রকাশনী অনূদিত *গোল্ড ফিংগার* পড়েছি, খুবই সুখপাঠ্য।

আপনি যদি বন্ড সিরিজের প্রতিটি বই প্রথম থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তাহলে পাঠকদের বিরাট একটা উপকার হয়। বিষয়টি বিবেচনার জন্য রাখছেন কি?

*# দুঃখিত, না। জেমস বন্ড অনুবাদের অনুমতি পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার, আর অনুমতি ছাড়া অনুবাদ করে প্রকাশ করা বে-আইনী। লেখক ইয়ান ফ্লেমিং-এর মৃত্যুর পর ৬০ বছর পেরোয়নি এখনও, তাই এটা সরাসরি কপিরাইট লঙ্ঘন।

আর, কবে কোথায় আমি বললাম এক বই একজন অনুবাদ করলে আর কারও সেটা অনুবাদ করা উচিত না? এরকম উদ্ভট কথা আমি বলেছি বা লিখেছি বলে তো মনে হয় না। কথাটা কোথায় পেলেন, জানাবেন দয়া করে?

অমিতাভ চক্রবর্তী,
শিবচর বরহামগঞ্জ সরকারী কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর।

সেবার সব বই ভাল লাগে, তবে মাসুদ রানা তার মধ্যে অন্যতম। একটা ধরলে সেটা শেষ না করে উঠতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে আপনি মরুভূমিতে, কিংবা সাগরে, অথবা বরফের মধ্যে রানাকে নিয়ে বইটা একেবারে একঘেয়ে করে ফেলেন।

আমার মতে রানার শ্রেষ্ঠ বইগুলো হলো: ১. অগ্নিপুরুষ ২. আই লাভ ইউ, ম্যান ৩. আবার সেই উ সেন ৪. মরণযাত্রা।

পরিশেষে সেবা'র সকল লেখক, কর্মচারী ও পাঠকদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ। আপনিও আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। অকপটে মতামত জানাবার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু *আই লাভ ইউ, ম্যান* কি সাগরের কাহিনী নয়?

মোঃ বাবুল আখতার রিপন,
সেবা বিজনেস লিঃ, রহিমউদ্দীন প্লাজা, সাতমাথা, বগুড়া-৫৮০০

সেবা প্রকাশনীর সাথে [illegible] পরিচয় হয়েছে আজ থেকে ২৬ বছর আগে। তখন অবশ্য [illegible] *মাসুদ রানার* বইয়ে হাত

দিতে পারতাম না বড় ভাইদের নিষেধের কারণে। দুই-তিন বৎসর পর সবার অগোচরে মলাটবিহীন বই পড়েছিলাম। বইটির নাম ছিল *ধ্বংসপাহাড়*। জানা ছিল বইটি মাসুদ রানা সিরিজের, তবে জানতাম না, ঘটনাচক্রে রানা সিরিজের প্রথম বইটিই আমি পড়ে ফেলেছি। সেই থেকে শুরু, আজ অবধি চলছে।

এখনও শুরু করলে শেষ না করে উঠতে পারি না। তা যত রাতই হোক। এই বই পড়ার জন্য আম্মার হাতে মারও কম খাইনি। তারপরও ছাড়তে পারিনি–নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ বেশি বলেই হয়তো। এই বয়সেও এই বই পড়ছি, বন্ধুরা দেখলে হাসে। কিন্তু আমি ছাড়তে পারি না।

জীবিকার প্রয়োজনে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে কয়েকটি ইংরেজি ছবি দেখেছিলাম, নাম মনে পড়ছে না, তবে ছবি দেখে খুশি হয়েছিলাম, কারণ মাসুদ রানার কল্যাণে কাহিনী আগেই আমার জানা ছিল। সেখানে অবস্থানকালে একবার দেশ থেকে পাঠানো রানা সিরিজের একটি বইয়ের প্রচ্ছদে সেই দেশের স্বনামধন্য টিভি অভিনেতার ছবি পেয়েছিলাম। সেই দেশীয় বন্ধুদের ছবিটি দেখিয়েছিলাম। তারা খুশি হয়েছিল বিদেশের একটি বইয়ে তাদের প্রিয় অভিনেতার ছবি দেখে।

আমি প্রার্থনা করি আপনার দীর্ঘায়ু হোক। আপনি দীর্ঘজীবী হলে রানাও দীর্ঘজীবী হবে।

দীর্ঘদিনের সাহচর্যে রানার প্রতি আপনার যে মমতা জন্মেছে, তা টের পাওয়া যায় আপনার চিঠির প্রতিটি ছত্রে। অনেক ধন্যবাদ। আমার শুভকামনা রইল।

রানা,
১১ হলিক্রস কলেজ রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।

আমার একটা প্রশ্ন: স্পাই ট্রেনিং-এর সময় কি সুন্দরী মেয়ে ভুলানোর প্রশিক্ষণও দেয়া হয়? তা না হলে আমার মিতা এসব ট্রিকস্ শিখল কিভাবে? শুধু চেহারা সুন্দর হলেই তো চলে না।

অনেকদিন পর অশুভ *প্রহরের* মত একটা বড় বই পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এজন্য ধন্যবাদ। গগলকে অনেকদিন দেখি না। তাকে ফিরিয়ে আনলে কেমন হয়?

ভালই হয়। সুযোগ পেলেই আনা যাবে। ...সবদিকেই চৌকস হতে হয় একজন স্পাইকে। মেয়ে ভুলানোও শিখতে হয়, আবার তাদের এড়িয়ে চলাও শিখতে হয়।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১/৭/০৩ সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা (তিন গোয়েন্দা/ কিশোর থ্রিলার) রকিব হাসান

বিষয়ঃ ছুটি কাটাতে চলল ওরা সাগরতীরের চমৎকার শহর সী ক্লিফে। আশ্চর্য! এ কেমন ব্যবহার মহিলার?–সাহায্য করতে চাওয়ায় মুখ ঝামটা দিল কিশোরকে। তারপর? সাগর থেকে ডুবন্ত মানুষ উদ্ধার করল ওরা। কিশোরের বুদ্ধিতে হলো মধুর মিলন। এক সময় রহস্য উন্মোচন হলো। কিন্তু ততোক্ষণে দেখা দিয়েছে মহাবিপদ। প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তাল সাগরে ভেসে গেল তিন গোয়েন্দা!

১/৭/০৩ মৃত্যুদূত (সেবা রহস্য) হাসান উৎপল

বিষয়ঃ ফিরে এসেছে লীলা। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট সলিল সেনের স্ত্রী–লীলা। তিন বছর আগে পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে গিয়েছিল লীলা সেন ভারতে। ফিরে এসেছে সে। কিন্তু পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনীর দুজন মৃত্যুদূত। পাকিস্তানে মুখ খুলবার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে লীলাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায়।–রুখে দাঁড়াল দেশপ্রেমিক সলিল সেন। বন্ধুর দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

আরও আসছে

৮/৭/০৩ বন্দুকবাজ (ওয়েস্টার্ন) কাজী মায়মুর হোসেন
৮/৭/০৩ ঝামেলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা (তি.গো./সেবা-শোভন) রকিব হাসান
১৫/৭/০৩ শয়তানের উপাসক (রানা ৩২৯) কাজী আনোয়ার হোসেন
১৫/৭/০৩ নকল বিজ্ঞানী ১+২ (রানা/রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

অপারেশন ইজরাইল

কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করবেই। সবার দৃষ্টি যখন ওদিকে থাকবে ঠিক তখন মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটা আঘাত হানা হবে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বপ্ন চিরতরে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য। ষড়যন্ত্র ঠেকাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি কনভয় নিয়ে জর্ডানের যবর-এ জালিম গিরিপথ থেকে রওনা হল মাসুদ রানা, সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের আপনজন শারিয়া ও প্রিয়ভাজন মশিয়ে লুয়ে জাদিব। শুরু হল খুন, হামলা আর বেঈমানী।
কেউ বলতে পারেনা কার ভাগ্যে কি আছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম; ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
শো-রুম; ৩৬/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০